শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

দ্বিতীয় ভাগ—

এই মর-জগতে মানবের শোভা-যাত্রা চলিয়াছে—কথা হইতে সুরে, রূপ হইতে অরূপে। অশান্ত মানব মনের এই যে চির-খোঁজা, সত্যের জন্য এই যে আকুতি ইহাই মানবত্বের ইন্ধন! নানারূপে শ্রীশ্রীমাকে ঘিরিয়া অনাদিকাল হইতে যে নানা স্থান ভ্রমণের অনন্ত শোভাযাত্রা চলিয়াছে, তাহার মধ্যে উত্তরকাশী, কন্যাকুমারিকা ইত্যাদি ভ্রমণ, রমণা ও কিষণপুর আশ্রম প্রতিষ্ঠা, নানা-স্থানে মার জন্মোৎসব, ভাইজী ও ভোলানাথের সহিত রায়পুরে মার জীবন, ঢাকায় কালীমূর্ত্তির গহনা চুরি, মায়ের সাধনা, পূর্ব্বকথা, আত্ম-পরিচয়ের কথা, অখণ্ডানন্দ ও কুঞ্জামার সন্ন্যাস, মরণী ও গুরু-প্রিয়ার পৈতা ইত্যাদির যে ইতিহাস তাহাই এই ভাগের দৃষ্টি পথের মধ্যে দেখা যায়।

[পৌষ, ১৩৩৬—আষাঢ়, ১৩৪৩]

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

দ্বিতীয় ভাগ

[পৌষ ১৩৩৬ — আষাঢ় ১৩৪৩]

ব্রহ্মচারিণী গুরুপ্রিয়া

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘ
ভাদাইনী, বারাণসী।

প্রকাশকের কথা

শ্রীশ্রীমার কৃপায় ব্রহ্মচারিণী গুরুপ্রিয়া লিখিত "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী" দ্বিতীয় ভাগের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বইটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। ভক্তবৃন্দ যদি শ্রীশ্রীমার পবিত্র জীবন-কথা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করেন ও শান্তি পান তবেই এই প্রকাশনের সার্থকতা।

বিনীত—

ফাল্গুন, ১৩৭০ প্রকাশক

বিষয়-সূচী

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

দ্বিতীয় ভাগ

সপ্তম অধ্যায়

মার সিদ্ধেশ্বরীতে অবস্থানকালীন যেদিন আমায় আদেশ দিলেন, "তুমি কিছু দিন পর্য্যন্ত দিনের মধ্যে একবার আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিয়াই চলিয়া যাইও। এখানে থাকিও না", তার পরদিন আসিয়া দেখি, কলিকাতা হইতে ভোলানাথ কি চিঠি মার কাছে লিখিয়াছেন, সেই চিঠি নিয়া সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়াছেন। ভোলানাথ ৺তারাপীঠে গিয়াছেন। আমি মার আদেশ অনুসারে দেখা করিয়াই চলিয়া গেলাম। সকলেই মার কাছে বসিয়া রহিলেন। মা বিকালেই ঘর হইতে বাহির হইয়াছেন। রাত্রিতে বাবা বাসায় গেলে শুনিলাম, ভোলানাথ শুধু মাকেই ৺তারাপীঠ নিয়া যাইবার জন্য সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পাঠাইয়াছেন; এবং মার কাছেও যাইবার জন্য চিঠি দিয়াছেন। আগামী কল্যই মা তথায় রওনা হইবেন। মার নিষেধ, গিয়াও দেখা পাইব না। তাই রাত্রিটা কোন প্রকারে কাটাইয়া অতি প্রত্যুষেই বাবা ও আমি সিদ্ধেশ্বরী

গেলাম। গিয়া দেখি, জ্যোতিষ দাদাও তথায় গিয়াছেন। মা মন্দির হইতে বাহির হইয়াছেন। কিছুক্ষণ পর মা আবার ঘরের ভিতর গেলেন। আমি ঐ কুঠুরীর ভিতরই গিয়া ভয়ানক কাঁদিতে লাগিলাম। মা সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু মা চলিয়া যাইতেছেন, কাজেই সান্ত্বনার কথায় কি হইবে? এদিকে বাবা ও জ্যোতিষ দাদা মার যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছেন। জিনিষ-পত্র কিছুই নয়, ভোলানাথ যাওয়ার পর হইতেই মা ২।১টী ছেঁড়া গরম চাদর দিয়া সামান্য ছোট্ট একটি বিছানা করিয়াছেন। বালিশ ইত্যাদি কিছুই নাই। পূর্ব্বেও বালিশ বড় ব্যবহার করিতেন না, তবে বিছানায় থাকিত। দেখিতে দেখিতে যাওয়ার সময় হইয়া আসিল। আমি অতি কষ্টে আসিয়া মাকে খাওয়াইয়া দিয়া আবার গিয়া ঐ ছোট কুঠুরীতে পড়িয়া কাঁদিতেছি। মা সেই ঘরে গিয়া বসিলেন ও আমাকে বলিলেন, "যদি আমি তোমাদের যাইবার জন্য চিঠি লিখি, তবে যাইও।" মা রওনা হইতেছেন, আমিও উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিলাম। ৺কালীর মন্দিরে গিয়া ৺কালীর গায়ে মা হাত বুলাইয়া যেন বিদায় নিলেন। আর কেহ ঘরে ছিল না, শুধু আমিই সঙ্গে থাকিয়া ইহা দেখিলাম। পরে সকলে মার সহিত ষ্টেশনে চলিলাম। ষ্টেশনে অনেকেই গিয়াছেন। খুবই ভিড় হইয়াছে। মা গিয়া গাড়ীতে বসিয়াছেন। গাড়ী ছাড়িবার একটু দেরি আছে, মা সকলের দিকে চাহিতেছেন, সকলেই মুখ বাড়াইয়া মাকে আগ্রহের সহিত দেখিতেছে। গাড়ী ছাড়িবার একটু পূর্ব্বে মা হঠাৎ ভয়ানক ভাবে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই ভাবে যাওয়া আসার সময় কান্না আর কখনও দেখি নাই। মার কান্না দেখিয়া উপস্থিত সকলেরই চোখে জল আসিল। একেই ত সকলের প্রাণ কাঁদিতেছিল। তার উপর মার

মার ঢাকা ত্যাগ ও ৺তারাপীঠে যাত্রা।

কান্না দেখিয়া কেহই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখনই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমরা কয়েকজন নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত সঙ্গে গিয়া মাকে ষ্টীমারে তুলিয়া দিলাম।

মা ষ্টীমারে উঠিয়া নিজের হাতের তুই গাছা চুড়ি খুলিয়া বলিলেন, "এই চুড়ি দিয়া ৫টী আংটি করিয়া সীতানাথ, জটু, অমূল্য, মাখন (চিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে) ও সুবোধকে দিতে হইবে।" বোধ হয়, জ্যোতিষ দাদার কাছেই দিয়াছিলেন। ইহারা তখন খুব কীর্ত্তন করিত। মাকে তখন অনেকেই অনেক গহনা দিয়াছিলেন। মা কিছু দিন পরিয়া খুলিয়া রাখিতেন। বাবা এক বার মাকে মুণ্ডমালা গড়াইয়া গলায় দিয়া দিয়াছিলেন। মাকে ঢাকায় অনেকেই "কালী মা" বলিত। কলিকাতাতেও প্রথম প্রথম সাধারণ অনেকেই মাকে "মানুষ কালী" বলিত। মাকে "কালী মা" বলিত, তাই মুণ্ডমালা দেওয়া হইল। সকলেই ইহাতে খুব খুসী হইল। মাকে দেখিতে আসিলেই মুণ্ডমালা দেখিয়া বলিত, "ঠিকই হইয়াছে, মার গলায় মুণ্ডমালাই শোভা পায়"। অনেকদিন তাহা গলায় ছিল। এখন বিশেষ কিছুই গায় ছিল না। জ্যোতিষ দাদা হীরার একটি নাক ফুল দিয়াছিলেন, তাহা নাকে ছিল।

মার গহনা ত্যাগ

নিরঞ্জন বাবুর স্ত্রী এক গাছি লোহা বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন ও এক ছড়া হার দিয়াছিলেন। হার ছড়া খুলিয়া ফেলিয়াছেন। লোহা গাছটি হাতেই ছিল, পরে মা সব গহনাই খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন। শুধু শাঁখা ও নিরঞ্জন বাবুর স্ত্রীর দেওয়া লোহা হাতে রাখিয়াছেন। মায়ের হাতে কয়েক গাছা চুড়ি ও গলায় সরু এক ছড়া হার ছিল। এই হার বহু পূর্ব্বে ভোলানাথই দিয়াছিলেন। ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। আমরা ঢাকায় ফিরিয়া আসিলাম। সকলেরই মন খারাপ।

কিছুদিন পর ভোলানাথের চিঠি আসিল, তাঁহারা দক্ষিণের দিকে যাইবেন, সঙ্গে যে যে যাইতে চান, ৺তারাপীঠে গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিবেন। মটরী পিসিমা ও মরণীকেও নিয়া যাইতে লিখিয়াছেন। ঢাকা হইতে আর কেহই গেল না। আমি ও বাবা, মটরী পিসিমা ও মরণীকে নিয়া ৺তারাপীঠ রওনা হইলাম। সন্ধ্যাবেলায় তথায় পৌঁছিয়া দেখি, সেখানে কলিকাতা হইতে বহু ভক্তেরা গিয়াছেন। কয়েকদিন যাবৎ সেখানে খুব আনন্দ চলিতেছে। সেদিন কুমারী, সধবা প্রভৃতি ভোজন করান হইল। মা স্বয়ং পাক করিয়াছেন। তখনও মার খাওয়া হয় নাই। এতদিন পর মাকে দেখিয়া খুবই আনন্দ হইল। দেখিলাম, ভোলানাথের কপালেও খুব বড় সিন্দুরের ফোঁটা। মাকে খাওয়াইয়া দিলাম; ভোলানাথও খাইলেন। পরে আমরা প্রসাদ পাইলাম। ৺তারাপীঠ একটি মহাশ্মশান। তার মধ্যেই ৺তারা মায়ের প্রকাণ্ড মন্দির। একটি ৺শিব মন্দিরও আছে। মা, ভোলানাথ ও যোগেশ দাদা সেই মন্দিরেই থাকেন। আমিও সেই রাত্রিতে ৺শিব মন্দিরেই মার পায়ের তলায় স্থান নিলাম। কথা হইয়াছে, আগামী কল্যই এখান হইতে কলিকাতা রওয়ানা হওয়া হইবে; দক্ষিণের দিকে এখন যাওয়া হইবে না।

ভোলানাথের ভক্তগণ সহ দক্ষিণ যাত্রার প্রস্তাব।

রাত্রিতে বসিয়া বসিয়া বাবা ও আমি, মার ও ভোলানাথের মুখে অনেক কথা শুনিলাম। শুনিলাম, সিদ্ধেশ্বরীতে যখন ভোলানাথ ৺কালী মন্দিরে বসিতে লাগিলেন, তখন একদিন দেখিতেছেন, যেন একটি ৺কালী মূর্ত্তি; কিন্তু মূর্ত্তিটির মাথা নাই। মাকে উহা বলিলেন। মা বলিলেন, "তুমি ৺তারাপীঠে যাও"। ৺তারাপীঠে ইতিপূর্ব্বে মা আর কখনও আসেন নাই, বা কি মূর্ত্তি আছে, না আছে, মা কিছুই জানিতেন

না। এই কথাতেই ভোলানাথ ৺তারাপীঠে আসিয়া ৺তারা মায়ের মন্দিরের বারান্দায় নিজ আসন পাতেন। ৺তারাপীঠে আসিয়া মায়ের স্নানের সময় দেখিলেন, ৺তারা মায়ের রূপার আল্‌গা মাথা। প্রত্যহ রাত্রিতে এই মাথাটি খুলিয়া রাখা হয়। পরদিন আবার স্নানের পর মাথাটি পরাইয়া কাপড় দিয়া সাজাইয়া দেওয়া হয়। আল্‌গা মাথা দেখিয়া সিদ্ধেশ্বরীতে ভোলানাথ যে মাথাশূন্য ৺কালীমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, এই সেই মূর্ত্তি বুঝিলেন। এই জন্যই মনে হয়, ভোলানাথের সেই পূর্ব্বের কথা শুনিয়া মা ভোলানাথকে ৺তারাপীঠে পাঠাইয়াছিলেন।

৺তারাপীঠে আসার পূর্ব্ব ইতিহাস।

কলিকাতা হইতে সঙ্গে দুই এক জন আসিয়াছিলেন। কয়েকদিন পর তাঁহারা সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে মাকে আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ভোলানাথের সঙ্গে ৺তারাপীঠে গিয়াছিলেন। পরে শুধু ভোলানাথ ও যোগেশ দাদাই ছিলেন। নির্জ্জন স্থান; লোকজন বড় নাই। কয়েক ঘর পাণ্ডা মাত্র এই গ্রামে বাস করেন। ৺তারা মায়ের মন্দিরে রাত্রিতে কেহই থাকে না। ভোলানাথ ঢাকা হইতে আসিবার নয় দিন পরই মা ঢাকা হইতে রওনা হইয়া দশ দিনের দিনই ৺তারা পীঠে পৌঁছিলেন।

ভোলানাথের এখানে খুব সুন্দর অবস্থা হইয়াছিল। সারা দিন রাতই প্রায় এই শীতের মধ্যে (পৌষ মাস হইবে) খোলা বারান্দায় বসিয়া থাকিতেন। দিনে মাছিতে মুখে চোখে ধরিত, তবুও খেয়াল নাই। তখন ভোলানাথ খুব তামাক খাইতেন; কিন্তু তামাক হাতের কাছে দিলেও দুই একবার টান দিলেই হাত হইতে হুঁকা পড়িয়া যাইত। একদিন মুখ দিয়া বমির মত থুথু অনবরত বাহির

৺তারাপীঠে ভোলানাথের অপূর্ব্ব অবস্থা।

হইতে লাগিল; তার মধ্যে শুধু তামাকের গন্ধ। সেইদিন হইতেই তামাকের গন্ধ সহ্য করিতে পারিতেন না। কত সময় কত কি দর্শন করিতেন, বলিতেন। মা গিয়াছেন পর, তিনি শিব মন্দিরেই দিনরাত্রি থাকিতেন। মা সারাদিনই বাহিরে বাহিরে ঘুরিতেন; রাত্রিতে গিয়া মন্দিরে শুইয়া থাকিতেন। ভোলানাথের খাওয়া দাওয়াও খুবই কমিয়া গিয়াছিল। একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ডাকিয়া তিনি নিজে ৺তারা-সিদ্ধি ও ৺শিব-সিদ্ধি লাভ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিলেন। তারপর ধীরে ধীরে ঐ রকম আবিষ্ট ভাবটা কমিয়া গিয়াছে।

মাও দিনে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেন। পাণ্ডাদের বউরা কেহ মুড়ি খাওয়াইয়া দিত, কেহ রুটী খাওয়াইয়া দিত। মা তখনও ভাত বড় খাইতেন না। এই সব কথা শুনিলাম। পরে মা ও ভোলানাথ বিশ্রাম করিতে শুইয়া পড়িলেন। যোগেশ দাদাও ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমি সারা রাত মায়ের পায়ের তলায় বসিয়া রহিলাম, ভোরে উঠিয়া গেলাম। সকাল বেলা মা আমাকে নিয়া পাণ্ডাদের বাড়ী বাড়ী গেলেন। মা আজ চলিয়া যাইবেন, সকলেই শুনিয়াছেন। অনেকেই সেই জন্য দুঃখ করিতে লাগিলেন। প্রায় সব বাড়ীতেই মাকে ও আমাকে চিড়া মুড়ি ঘি দিয়া মাথিয়া খাইতে দিলেন। মাকে বলিতেছেন, "মা, আমরা ত গরীব লোক, আমাদের ঘরে মিষ্টি মিঠাই কিছুই নাই। এই সামান্য জিনিষ দিয়াই আমরা তোমাকে খাওয়াইতে বসাইয়াছি।" একটি পাণ্ডার স্ত্রী বলিতেছেন, "মা, তুমি যাইবে, মোটর আসিয়াছে। আমি স্নান করিতে গিয়াছিলাম, মোটরের শব্দ পাইয়াই বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। যেন আমাদের ৺শ্রীকৃষ্ণকে নিতে অক্রূর আসিয়াছে।" এই বলিয়াই তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। মা হাসিতেছেন,

৺তারাপীঠে মার দৈনিক জীবন।

আর বলিতেছেন, "আমার জন্য তোমরা এমন করিতেছ কেন? আমি ত তোমাদের মতই সাধারণ মানুষ। কয়দিন মাত্র আসিয়াছি, আপন মনে ঘুরি ফিরি। তোমরা কত যত্ন করিয়া খাওয়াইয়াছ।" সেই বউটি বলিতেছেন, "মা, আমরা ৺তারাপীঠের লোক। এ স্থান সিদ্ধ স্থান; কত সাধু সন্ন্যাসী আসেন দেখি; আমরা, মা, লোক চিনিতে পারি। তোমার মত এমন ভগবতী মা আমরা আর কখনও দেখি নাই।" মা বলিতেছেন, "আমি ত সাধু সন্ন্যাসী না, তাঁদের সঙ্গে আমার কি কথা?" তিনি বলিতেছেন, "মা, কেন ছলনা কর? তুমি যে আমাদের ভগবতী মা।" এখনও ৺তারাপীঠে মাকে কেহ কেহ 'ভগবতী মা' বলেন। মাকে কত যত্নে সেই বউটি খাওয়াইয়া দিলেন। দেখিলাম, এই অল্প দিনেই মাকে ইহারা কত যত্ন করিতেছেন। অথচ মা ত এখানে একা একাই প্রায় কখন ঘুরিয়াছেন, কখন পড়িয়া থাকিতেন; মার কথা বিশেষ ইহারা কিছু শোনেও নাই, তবুও এই অবস্থা।

খাওয়া দাওয়ার পর সকলেই রওনা হইলেন। মোটরে রামপুরহাট আসিয়া ট্রেণ ধরা হইল। কলিকাতার সন্নিকট সালকিয়াতে পিসিমার বাসায় (কালীপ্রসন্ন কুশারী মহাশয়ের বাসায়) মা উঠিলেন। শুনিলাম, ভোলানাথের উপর আদেশ হইয়াছে, বৎসরের মধ্যে একদিন গিয়া ৺তারাপীঠে থাকিতে হইবে; কলিকাতায় ও কোথায় কোথায় কতদিন করিয়া থাকিবার আদেশ হইয়াছিল। সেই অনুসারে তিনি চলিয়া গেলেন। যজ্ঞের আগুন নিয়া যোগেশ দাদা কলিকাতার একটা খালি ভাঙ্গা বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। এই যজ্ঞাগ্নি গৃহস্থের ঘরে আনিতে মা নিষেধ করিলেন।

৺তারাপীঠ ত্যাগ ও বক্রেশ্বর দর্শন। দক্ষিণ যাত্রার সংকল্প ত্যাগ ও সালকিয়া আগমন।

৺তারাপীঠ হইতে আসিবার সময় ভোলানাথ "জীবিত পুষ্করিণী"র ("জিওল

পুকুর” নামে পরিচিত) জল এক কলসী নিয়া আসিলেন। আদেশ পাইয়াছিলেন, এই জলে রোগী আরোগ্য লাভ করিবে। ৺তারাপীঠ হইতে আসিবার সময় বক্রেশ্বর হইয়া আসা হইল ; এবং রেলওয়ে ষ্টেশনের কাছেই একটি পীঠস্থান দেখিয়া আসা হইল। ভোলানাথের পীঠস্থান দেখিবার খুব ঝোঁক ; পরে তিনি বহু পীঠস্থান ঘুরিয়াছেন। মার সঙ্গে আমরা সালকিয়াতে পিসিমার বাসাতেই রহিলাম। ভোলানাথ কলিকাতা গিয়া, যেমন যেমন আদেশ পাইয়াছিলেন, সেই রকমই থাকিতেন। দিনে আসিয়া সালকিয়াতেই থাকিতেন। সন্ধ্যাবেলা চলিয়া যাইতেন।

আমি কুশারী মহাশয়ের বাসায় মাকে সাবান দিয়া স্নান করাইতে করাইতে গলার হারটিও খুলিয়া সাবান দিয়া পরিষ্কার করিয়া, এক লহর করিয়া মায়ের গলায় দিয়া দিতেই তাহা পৈতার মত হইয়া গেল ; এবং মা তাহা হাত লম্বা করিয়া মাপ দিয়া পৈতার মত দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, “খুকুনি এই দেখ, এটা একেবারে পৈতার মাপে ঠিক ঠিক হইয়াছে।” এই বলিয়াই মায়ের খেয়ালে ঐটা পৈতা বলিয়াই রহিল, এবং কাঁধের উপর পৈতার মতন করিয়া রাখিলেন ; কিন্তু আমাকে আর কিছু বলিলেন না। সেইদিনই বৈকালে মা ছাদে দাঁড়াইয়া আছেন। কুশারী মহাশয় খালি গায়ে কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই মা দেখিলেন, তাঁহার গলায় পৈতা নাই। দেখিয়াই মা বলিয়া উঠিলেন— “একি আপনার গলায় পৈতা নাই ?” তিনি বলিলেন, “কয়দিন যাবৎ ছিঁড়িয়া গিয়াছে ; আর, কতবার বলিতেছি, একটা ঠিক করিয়া দাও, কেহ দেয় না।” মা বলিলেন—“একি কথা ? আপনাকে দেখিয়া ছেলেরা কি শিক্ষা পাইবে ? তাহাদের খরচ করিয়া পৈতা দিলেন কেন ?” এর পর সন্ধ্যা-কালে আবার সকলে একত্র বসিয়াছি।

শ্রীশ্রীমার পৈতা গ্রহণ।

মার সেই সকালের পৈতার ভাবের জেরটা চলিতেছিল। মা কুশারী মহাশয়ের স্ত্রীকে বলিলেন, "দেখুন আপনি আমাকে পৈতা দিয়া দিন।" এই বলিয়া হারটি তাঁহার হাতে দিলেন। তিনিও সরল ভাবে হাসিতে হাসিতে মার কথায় তাহাই করিলেন। তখন মা বলিলেন, "আমি এখন ব্রহ্মচারী, আমাকে ব্রত ভিক্ষা দিবেন না?" তখন তিনি মার আঁচলে কয়েকটি হরিতকী ও দশটি টাকা বাঁধিয়া দিলেন। মা বলিলেন:—"এখন ৫ জনে আমাকে গায়ত্রী শুনাও।" এই বলিয়া একে একে ঐ বাড়ীর যে যে ছেলেকে ডাকিলেন, দেখা গেল, তাহাদের কাহারও গলায় পৈতা নাই। তখন সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, "মা এই জন্যই জানিয়া শুনিয়া এই খেলা আরম্ভ করিয়াছেন"। শেষে বাবা, ভোলানাথ ও তিনজনে মিলিয়া মাকে গায়ত্রী শুনাইলেন।

সেইদিন দুপুর বেলা রেবতী সেন মহাশয় ও আরও কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। মা মুখ কাপড় দিয়া ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন। কারণ, ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কাহারও মুখ ব্রহ্মচারীর দেখিতে নাই। মা বলিলেন, "আমি একদিন এইসব নিয়ম পালন করিব, তবেই হইবে।" সন্ধ্যা বেলায় ভোলানাথের সহিত যোগেশ দাদা আসিয়াছেন তাঁহাকে সঙ্গে নিয়া মা ৺গঙ্গার তীরে গিয়া গায়ত্রী শুনিতে চাহিলেন। আমরাও সকলে সঙ্গে আছি। মা মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন, "আমি এখন ব্রহ্মচারী, ভিখারী; কোথায় যাই ঠিক কি?" এই কথায়, ভোলানাথ, বাবা, প্রভৃতি সকলেরই চিন্তা হইল। কি জানি আবার কি করেন? এই ভাবটা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য ভোলানাথ মাকে একটু জোরেই উপেক্ষার ভাবে বলিলেন, "এই সব কি আরম্ভ হইয়াছে? ভারী ত ব্রহ্মচারী; রাখ এ সব।" ৺গঙ্গার ধারেই এই কথা হইল, মা একেবারে

চুপ। ভাবই অন্য রকম হইয়া গেল। ভোলানাথ বাসায় আসিয়াই ভবানীপুর চলিয়া গেলেন। মা বাসায় আসিয়াই মুখে কাপড় দিয়া শুইয়া পড়িলেন। পিসিমা কত ডাকিলেন, আমরা ডাকিতেছি, সাড়া শব্দ নাই; মুখের কাপড় তুলিয়া দেখি, মার চোখের জলে কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে। পিসিমা অনেক চেষ্টা করাতে ও কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, "আমাকে কত কথা বলে, তাহাতে আমার কিছুই লাগে না; কিন্তু যাহা সত্য, তাহাতে উপেক্ষার বা অগ্রাহ্যের ভাব দেখিতে পাইলে, আমার শরীর কেমন হইয়া যায়।" মার সমস্ত শরীরই অবসন্ন হইয়া গিয়াছে। পরদিন ভোলানাথ আসিয়া দেখিলেন, মা পড়িয়াই আছেন। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তিনি গিয়া ঐ কথার জন্য ক্ষমা চাহিলেন। অনেক পরে মা উঠিয়া বসিলেন।

কলিকাতায় গমন

সেইদিনই মার ভবানীপুর যাওয়ার কথা। বোধহয়, প্রাণকুমার বাবুর বাসায় যাইতেছেন। প্রাণকুমার বাবু ঢাকাতে সবজজ ছিলেন; সেইখানেই তিনি সপরিবারে মার চরণ দর্শন পান। এদিকে দেখা গেল, সালকিয়ার বাসায় পিসা মহাশয় ও ছেলেদের প্রায় কাহারও গলাতেই পৈতা নাই। মা ভবানীপুর যাওয়ার সময় বলিয়া গেলেন, "আমি আগামী সোমবার আবার এ বাসায় আসিব। কয়েকটি পৈতা গ্রন্থি দিয়া রাখিবেন ও কয়েকটি ফল আনিয়া রাখিবেন।" ভিক্ষার ১০৲ টাকাও পিসিমাকে দিয়া বলিয়া আসিলেন, "এই ১০৲ টাকা দিয়া সেইদিন পৈতার নিমন্ত্রণ হইবে।" মা প্রাণকুমার বাবুর বাড়ী হইয়া, ভাঙ্গা বাড়ীতে যেখানে যোগেশ দাদা আগুন নিয়া আছেন, সেইখানে গেলেন। ভোলানাথের এখানে কয়দিন থাকিবার আদেশ হইয়াছিল; আমরা সকলেই কয়েকদিন এই বাড়ীতেই থাকিলাম। কলিকাতাতে যোগেন্দ্র রায় মহাশয়ের খুব

অসুখ; একবার মাকে দেখিতে চাহিলেন। তাঁর স্ত্রী সালকিয়াতে আসিয়া মাকে অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও এবার মা কিছুতেই তথায় যাইতে রাজি হইলেন না। ভোলানাথকে দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। পরে কলিকাতা ছাড়িবার সময় তাঁহারা আবার লোক পাঠাইয়া অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া অল্প সময়ের জন্য মাকে নিয়াছিলেন।

এদিকে নির্দ্দিষ্ট দিনে মা সালকিয়ায় গেলেন। যোগেশ দাদাকেও পরদিন ভোরে যজ্ঞাগ্নি নিয়া সালকিয়াতে ৺গঙ্গার ধারে যাইতে বলিয়া গেলেন। পিসিমা পৈতা ফল সব যোগাড় রাখিয়াছেন। ছেলেরা মার ভয়ে ভয়ে এখান ওখান হইতে পুরাণা ছেঁড়া পৈতা যাহা পাইয়াছে, যোগাড় করিয়া গলায় দিয়াছিল। পরদিন দুপুর বেলা মা সকলকে নিয়া ৺গঙ্গার ধারে গেলেন। পিসা মহাশয়কে এবং আরও চারিটি ছেলেকে স্নান করাইলেন। পরে মা যজ্ঞের অগ্নির পাত্র ৺গঙ্গার পাড়েই রাখিলেন। মা যজ্ঞাগ্নি ও ৺গঙ্গার মধ্য স্থানে এমন ভাবে দাঁড়াইলেন, যে পায়ের গোড়ালির অংশ ৺গঙ্গা স্পর্শ করিয়াছে ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্র ভাগ যজ্ঞাগ্নির পাত্র স্পর্শ করিয়াছে। এই ভাবে চরণ দ্বারা গঙ্গা ও অগ্নি একত্র মিলাইয়া দাঁড়াইলেন; এবং এক একটি পৈতা ও ফল এক এক জনের হাতে দিলেন। ভোলানাথকে পৈতা গলায় পরাইয়া দিতে বলিলেন। এই ভাবে পাঁচ জনের পৈতা হইয়া গেলে গায়ত্রী পড়িতে বলিলেন। তাহাদের গলার পুরাণা ময়লা ছেঁড়া পৈতাগুলি একত্র করিয়া মা নিজের গলায় (পৈতার মত করিয়াই) দিলেন। সোনার হার ত পৈতার ভাবেই আছে পরে সকলকে বলিয়া দিলেন, "আজ হইতে সন্ধ্যা না করিলেও অন্ততঃ গায়ত্রী পড়া যেন বাধা না হয়।" পরে সকলকে নিয়া বাসায় গেলেন। পিসিমা সেই দিন খুব

সালকিয়াতে প্রত্যাবর্ত্তন

ভাল করিয়া পৈতার নিমন্ত্রণ দিলেন। শ্রীশ্রীমা নূতন পৈতাধারীদের পাঁচজনকে নিয়া বসিয়া সেই দিন আহার করিলেন।

এই ভাবে পৈতার লীলা শেষ করিয়া কয়েকদিন পরেই বীরেন দাদার অনুরোধে, মা ও ভোলানাথ আমাদের নিয়া আগ্রায় গেলেন; ১৩৩৪ সনে বীরেন দাদা আগ্রায় প্রফেসার হইয়া গিয়াছেন। ২।৩ দিন তথায় থাকিয়াই মা পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

আগ্রা গমন ও কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন।

এ দিকে ঢাকার মেডিকেল স্কুলে কোনও কাজের জন্য ছেলেরা ও মাষ্টারেরা একত্র হইয়া মার কাছে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইল, যে বাবাকে যেন একবার ঢাকা আসিতে অনুমতি দেন। বাবা বিনা অনুমতিতে যদি না আসেন, এই জন্য মাকে টেলিগ্রাম করিলেন, যে মা বলিলে বাবা ঢাকা যাইতে বাধ্য হইবেন। তাহাই হইল; মা বাবাকে ঢাকা যাইতে আদেশ করিলেন। আমি ও বাবা ঢাকায় চলিয়া আসিলাম। কয়েক দিনের মধ্যেই ঢাকায় কাজ শেষ করিয়া আমরা কলিকাতায় যাই। সালকিয়াতে গিয়া শুনি, মা ৺পুরী ধামে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া সালকিয়ায় আসিয়াছিলেন। এই মাত্র ভবানীপুর গিয়াছেন। সে দিনই 'বিন্ধ্যাকুট' পিত্রালয়ে রওনা হইয়া যাইতেছেন।

তখনই ৺কালীঘাটের সুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসা ও চণ্ডী বাবুর বাসায় খোঁজ করিয়া জানিলাম, মা আসিয়াছিলেন; কিছু সময় হইল, ষ্টেশনে চলিয়া গিয়াছেন। ষ্টেশনে গিয়া দেখি, গাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে। সেই দিন ঢাকা ফিরিয়া গেলাম। পরে "বিদ্যাকুট" রওনা হইলাম। সঙ্গে সুবোধ, অমূল্য প্রভৃতি ২।৩ জনও মাকে

বিদ্যাকুট হইয়া ঢাকায় গমন।

আনিবার জন্য চলিল। "বিদ্যাকুট" গিয়া দেখি, মা ও ভোলানাথ তথায়ই আছেন। ২।৪ দিন তথায় থাকিয়া তাঁহাদের নিয়া ঢাকায় আসিলাম। মা ও ভোলানাথ ঢাকাতে সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমেই গেলেন। ১৩৩৬ সনের জন্মোৎসবও আসিয়া পড়িয়াছে। মা কয়েকদিন হইতেই বলিতেছেন, "আমার শরীরটা জালা করিতেছে।" অনেক জিজ্ঞাসা করায় আভাসে জানাইলেন, আমাদের মধ্যে কাহারও বিপদ আসিতেছে। কয়েকদিন পরই খবর আসিল, যোগেন্দ্র রায় মহাশয় মারা গিয়াছেন। ১৩৩৬ সনে মার জন্মোৎসব আরম্ভ হইল।

———

অষ্টম অধ্যায়

১৩৩৬।

রমণার আশ্রমেও মার থাকিবার জন্য ছোট একটি কুটীর উঠিয়াছে।

রমণার আশ্রমের সূত্রপাত। স্থান সংগ্রহের ইতিহাস

রমণার জায়গাটা নেওয়া সম্বন্ধে একটুকু ঘটনা আছে। তাহা এই :—একবার মা ঢাকা হইতে বাহির হইবার সময় নিরঞ্জন বাবু (এ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনর অব্ ইন্‌কাম্ ট্যাক্স, ঢাকা) মাকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই, তাঁর মাথায় হাত দিয়া বলিয়াছিলেন, "আশ্রমের চেষ্টা করিতেছ; প্রথম কিন্তু ঐ রমণার মাঠের জায়গাটুকু নিতে চেষ্টা করিও।" নিরঞ্জন বাবুর চেষ্টাতেই রমণা আশ্রমের জন্য কিছু টাকা উঠিয়াছিল। তাহা দিয়াই আশ্রম প্রথম আরম্ভ হয়। নিরঞ্জন বাবুর ও জ্যোতিষ দাদার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও আশ্রম হইতেছে না দেখিয়া, একবার মা যখন সালকিয়া ছিলেন, তখন সরকারী কার্য্যোপলক্ষে বিনয় বাবু (সরকারী কৃষি-বিভাগে ইনি চাকুরী করেন) কলিকাতায় যাইতেছেন দেখিয়া, জ্যোতিষ দাদা বিনয় বাবুকে দিয়া মার কাছে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমাদের চেষ্টায় কিছুই হইতেছে না, আপনার ইচ্ছা না হইলে কিছুই হইবে না, অনর্থক চেষ্টা করিতেছি।" মা উত্তরে বিনয় বাবুকে বলিলেন, "এবার ভাল করিয়া চেষ্টা করিতে বল গিয়া।" বিনয় বাবু আসিয়া এ কথা ঢাকাতে জ্যোতিষ দাদাকে বলিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তার কয়েকদিন পরেই কথা পাকা হইয়া গেল, জায়গাটা পাওয়া গেল। আর শেষ দিন, যেদিন কথা পাকা হয়, সেইদিন জ্যোতিষ দাদা মার যে কৃপা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই লেখা

হইয়াছে। মা কোঠায় থাকিবেন না বলায়, নূতন আশ্রমে ছোট একটি চালা কুটীর মার থাকিবার জন্য তৈয়ার করা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, উৎসবের শেষ দিন নূতন আশ্রমে মা প্রবেশ করিবেন।

খুবই আনন্দের সহিত এবারও সিদ্ধেশ্বরীতে উৎসব হইল। ১৩৩৬ সনের উৎসবের মধ্যে একদিন ঘরে অনেকে প্রসাদ পাইতেছেন। মা ও ভোলানাথের ভোগ হইয়া গিয়াছে। বাবাও ঘরে প্রসাদ নিতে বসিয়াছেন। মা হঠাৎ আসিয়া বাবার সঙ্গে খাইতে বসিলেন। বলিলেন "দেও, আমাকে খাওয়াইয়া দাও।" বাবা কি করেন, মার আদেশে নিজের উচ্ছিষ্ট খাদ্য হইতেই মাকে খাওয়াইয়া দিলেন।

সিদ্ধেশ্বরীতে জন্মোৎসব। বৈশাখ, ১৩৩৬।

উৎসবের শেষ দিন সন্ধ্যার পরে বহু ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়া, মা রমণার নূতন আশ্রমে গেলেন। এই উৎসব উপলক্ষেও নানা স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া মার কাছে সমবেত হইয়াছেন। মা আশ্রমে প্রবেশ মাত্রই খুব উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন হইতে লাগিল। কীর্ত্তন সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছে। উৎসবের কীর্ত্তন এখনও বন্ধ হয় নাই, আজ রাত্রিতেও কীর্ত্তন রক্ষা করা হইবে; আগামী কল্য প্রাতে কীর্ত্তন বন্ধ হইবার কথা; মা কিছুক্ষণ মাটিতে পড়িয়া রহিলেন। পরে উঠিয়া বসিলেন।

রমণা আশমে মায়ের প্রথম পদার্পণ।

উৎসব উপলক্ষে বাউল বাবুর এক দোকান বসিয়াছিল। মা সেই দোকান হইতে সব মিষ্টি কিনিয়া আনিতে বলিলেন। পরে সকলের মধ্যে মিষ্টি বিলাইয়া দিলেন। বাউল বাবুর দোকানের মিষ্টি নিঃশেষ হইয়া গেল। এবারও বাউল বাবু ফুলের মুকুট ও অন্যান্য গহনা দিয়া মাকে সাজাইলেন। মা ছোট কুটীরখানির সিঁড়ির উপর বসিয়া হাসিতেছেন।

বাউল বাবুর কথা।

সিন্দুরে ও চওড়া লাল পাড়ের শাড়ীতে এবং ঐ ফুলের সাজে মায়ের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। ভাবাবস্থা কয়েকদিন যাবৎই চলিতেছে। মুখে অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ। তার উপর ফুলের সাজে সাজিয়াছেন। মনে হইতেছিল, যেন একটি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী দেবী-প্রতিমা! সমাগত ভক্তবৃন্দ সকলেই মার চরণে পড়িয়া পায়ের ধূলা নিতেছেন। মা ভোলানাথের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিতেছেন, "তুমি প্রণাম করিলে না?" ভোলানাথ মাথা নাড়িয়া ইসারায় 'না' বলিলেন। মা হাসিয়া সকলের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "উনি ত একা ঘরে অনেক সময় নমস্কার করেন। এখন তোমাদের কাছে বোধ হয় লজ্জা করে, তাই করিবে না।" মার এই কথায় সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। ভোলানাথও হাসিলেন। মরণী তখন ছোট; সে বলিয়া উঠিল, "হাঁ, আমি দেখিয়াছি, দাদু দিদিমাকে প্রণাম করেন।" এই কথায় মা, ভোলানাথ এবং সকলেই আবার হাসিয়া উঠিলেন। রাত্রি প্রায় এই ভাবেই নানা লীলায় কাটিয়া গেল।

ফুলের সাজে শ্রীশ্রীমায়ের অপূর্ব্ব শোভাময়ী দেবীমূর্ত্তি।

ভোরে মা উঠানের মধ্যে যেখানে সামিয়ানা টাঙ্গান ছিল, সেখানে মাটির মধ্যেই পড়িয়া রহিলেন। সেই দিনও অনেক লোক প্রসাদ পাইবে। কীর্ত্তন শেষ হইয়াছে; রান্না হইতেছে। সারাদিন মা ঐভাবেই পড়িয়া রহিলেন। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে মা উঠিয়া বসিলেন। সারা রাতই মা বাহিরে বাহিরে কাটাইয়াছেন; ঘরে যান নাই। দিনেও বাহিরেই পড়িয়াছিলেন। এখন উঠিয়া বসিলেন। মুখ ধোয়াইয়া, কাপড় ছাড়াইয়া দিলাম। ভোগ তৈয়ার। ভোলানাথকে খাইতে বলিলেন। মা তখন খাইলেন না।

নানা মধুর লীলা।

শেষে দাদামহাশয় খাইতে বসিয়াছেন, মা তাঁহার সহিত গিয়া খাইতে বসিলেন। দাদামহাশয় মাকে খাওয়াইয়া দিলেন। পরে সন্ধ্যার পর দিদিমা খাইতে বসিলে, আবার তাঁহার সহিত বসিয়া কিছু খাইয়া আসিলেন। এখন ভাবটা খুব চট্‌পটে। সুরেন বাবু (পোষ্টমাষ্টার) প্রভৃতি সন্ধ্যার পর বিদায় নিতে মার কাছে গেলেন। মা তখন দিদিমার সহিত খাইয়া আসিয়া মুখ ধুইতেছিলেন। মা বলিলেন, "তোমরা এখনই কেন যাইবে? আরও একটু কীর্ত্তন কর; বাবাকে একটু কীর্ত্তন করিতে বল"। তাই শুনিয়া দাদামহাশয়কে নিয়া সকলে কীর্ত্তনে বসিলেন। এদিকে খাওয়া দাওয়ার পর ভোলানাথ মাকে বলিয়া নিরঞ্জন বাবুর বাসায় তাঁর অসুস্থ ছেলেটিকে দেখিতে চলিয়া গিয়াছেন। সেখান হইতে তিনি জ্যোতিষ দাদার বাসায় গিয়া তাঁহাকে নিয়া, আমাদের টিকাটুলীর বাসায়ও গিয়াছিলেন।

এদিকে সকলে কীর্ত্তনে বসিয়াছেন। মাকে কে পান খাওয়াইয়া দিল। মা পান মুখে নিয়াই আশ্রমের ভিতরে চারিদিকে প্রাচীরের ধার দিয়া দিয়া ঘুরিয়া আসিতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে প্রাচীর স্পর্শ করিতেছেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি। ইহা দেখিয়া কেমন সন্দেহ হইল। মনে পড়িল, শাহাবাগ হইতে মা যখন শেষ বাহির হন, তখন এইভাবে প্রাচীর স্পর্শ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছু বলিতে সাহস হইল না। কারণ, মার মুখের ভাবের কেমন পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছিল। মার একটা ভাবের অবস্থায়, সকলে কাছে বসিয়া আদর করিতে পারে, কত কথাই বলিতে পারে, যাহার যাহা মনে আসে, তাহাই বলিতে সাহস পায়। কিন্তু আবার এক এক সময় এমন ভাব দেখা যায়, যে কেহ কথা বলিতেও সাহস পায় না। আমরা যে সর্ব্বদা কাছে থাকিতাম,

ঢাকা ত্যাগের আয়োজন।

আমরাও কিছু বলিতে সাহস পাইতাম না। অথচ উগ্রভাব কিছুই নয়; কেমন একটা অন্য প্রকার ভাব দেখা যাইত। যাঁহারা দেখিয়াছেন বুঝিবেন; ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

আজও সেই ভাব দেখিয়া সকলে চুপ। মা কীর্ত্তনের মধ্য স্থানে গিয়া বসিলেন। দাদামহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণ নাম করিলেন। একটু পরেই মার শ্রীমুখ হইতে পরিষ্কারভাবে স্তোত্রাদি স্বতঃই বাহির হইতে লাগিল। অনেকদিন পূর্ব্ব হইতে বাবা, এইরূপ ভাবাবস্থায় স্বতঃ উচ্চারিত স্তোত্রাদি লিখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, "চেষ্টা করিলেও লিখিতে পারিবে না"। আজ বাবা নিকটেই বসিয়াছিলেন। কিন্তু মা একটু পরেই বলিলেন, "পারিলে লিখিয়া নেও"। তখনই বাবা ও কেদার মাষ্টার প্রভৃতি ৩।৪ জন লিখিতে বসিলেন। কিন্তু অসম্পূর্ণ, ছাড়া ছাড়া ভাবেই খানিকটা লিখিলেন।*

শ্রীশ্রীমায়ের মুখ হইতে স্বতঃনির্গত স্তোত্রাদি।

---

* "এহি ভাবনায়ং ভায়ং
এহি যং সং তানি তায়ং
বাং ক্রীং আং হে
ভাং হাং হ্রীং হৌং হুং
হিং বং লং যং সং ত্বম্
তাদরৌ ভাগ সং বং লং হে
দেব ভক্তময়ং মম হে
স ত্বং হি হুং যং বং বায়ং কং
ভাবভক্তি......ভাবময়ং হে।
মহাত্মায়ং ভবভয়ং হর হে।
ভাবময়ং ভবভয়হরণং হে
যস্মিংস্বহং ভাগ পৌং হুং
যস্তারণং তত্র দ্বয়রূপং
ময়াহি সর্ব্বাণি স্বরূপময়ানি
ময়াহি সর্ব্বঃ
ময়াহি সর্ব্বশরণং হে।
দাস নিত্য......প্রণবশ্রুতকারণং
মহামায়া মহাভাবময়ময় হে।
মম ভো ভক্তৌ তরণং মা
মম সর্ব্বময়ং হে

এবারকার উৎসবেই সকলের অনুরোধে কীর্ত্তন করিবার জন্য আমি একটি হারমোনিয়াম কিনিয়া দিয়াছিলাম। মা সেই হারমোনিয়ামে যোগেশ দাদাকে স্তোত্রের সুর ধরিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পর স্তোত্র বন্ধ হইল। মা বলিলেন:—"প্রতিদিন কীর্ত্তনের পূর্ব্বে, যাহা লেখা হইল, এই স্তোত্রটিই এই হারমোনিয়াম দিয়া সুর সহযোগে গান করিয়া পরে কীর্ত্তন করিও!" আরও বলিলেন, "এই হারমোনিয়াম দিয়া কীর্ত্তন ছাড়া অন্য কোন বাজে গান হইতে পারিবে না"। এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিতে লাগিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা সকলে আমাকে ছাড়িয়া দেও, আমি আজই ঢাকা ছাড়িয়া যাইব"। এই মর্ম্মান্তিক কথা শুনিয়া, সকলেই অতি দুঃখে, "মা, মা, তা কি করিয়া হইবে", এই বলিয়া উঠিতেই, মা ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া বলিলেন, "তোমরা আমাকে বাধা দিও না, তোমরা আমাকে ছাড়িয়া না দিলে আমি

দৈবতং ময়ং মে সং তং হ্রীং
মত্তত্বম্ ভবোহয়ং
য স্তানি ত্বং তারণময়ং
ভবভয়নাশং ভাবয় হে।
স্বভাব শরণগতং প্রণবজাসনম্।
ভবানীভবং ভবভয়নাশনং হে
হর শরণাগতং……তায়ং
বিভাবতঃ মমায়নং হে।

যস্যা রুদ্ররুদ্রত্বং
প্রণবে রাং ঋং কৃতকারণং
রুদ্রং নৌমি।
প্রাং বাং হাং সাং
আং হ্রীং অং
ভাবময়ং হে……
সংস্পৃষ্টঃ কেশবঃ"

পরমহংস শ্রীশ্রীমৎ রামঠাকুর মহাশয় ইহার অর্থ করিয়া দিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাহা এখানে প্রদত্ত হইল না।

এখানে শরীর ত্যাগ করিয়াই চলিয়া যাইব, আমার যে যাইতেই হইবে"। আর কাহারও মুখে কথা নাই, সকলেরই চোখে জল। মা আবার বলিতেছেন, "ভোলানাথ আসিলে তোমরা বুঝাইয়া বলিও, আমাকে যেন বাধা না দেন"। সকলেই রাজি হইলেন। মা আরও বলিতে লাগিলেন, "পূর্ব্বেও এইস্থানের যোগাসনে যাহারা ছিল তাহারাই আসিয়াছে আসিবে"। আবার বলিতেছেন, "কাল এই সময়েতেই এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছি, ২৪ ঘণ্টা হইল, এখনই আমার বাহির হইতে হইবে"। ভোলানাথকে বাবা সংবাদ দিতে চাহিলেন। বলিলেন, "দরকার নাই"। পরে জিজ্ঞাসা করা হইল, "সঙ্গে কে যাইবে"? মা বলিলেন, "আমার সঙ্গে কাহারও যাইবার দরকার নাই, তবে তোমাদের জন্য বাবাকে সঙ্গে নিতে পারি"। এই বলিয়া দাদামহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তখনই প্রস্তুত হইলেন।

ঢাকা ত্যাগের আকস্মিক সঙ্কল্প।

মা এক বস্ত্রে বাহির হইয়া মাঠে গিয়া বসিলেন। সকলে মাকে ঘিরিয়া বসিল। মা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কোন সময় গাড়ী পাওয়া যাইবে"? এক জন বলিলেন, '১২টায় গাড়ী আছে'। মা বলিলেন, "তাহাতেই তোমরা আমাকে উঠাইয়া দিও; দেখিও, গাড়ী যেন ফেল না করা হয়"। এদিকে বাবা জ্যোতিষ দাদাকে খবর দিলেন। ভোলানাথও সেখানেই ছিলেন; তাঁহারা দুইজনে তখনই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভোলানাথ আশ্রমের ভিতরে গেলেন। মা বলিলেন, "ঠিক সময় ত বাহির হওয়াই হইয়াছে; এখন ভিতর হইতে আসি"। এই বলিয়া ভিতরে ভোলানাথের কাছে গিয়া যাইবার অনুমতি চাহিলেন। ভোলানাথ একটু অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করায়, মা বলিতেছেন, "তুমি

দাদামহাশয়ের সঙ্গে ঢাকা ত্যাগ।

যদি বাধা দেও, এখনই তোমার পায়ে এ দেহ ত্যাগ হইয়া যাইবে"। এ কথায় ভোলানাথ বাধা দিতে পারিলেন না। উদাস ভাবেই বলিলেন, "যাও, আমি নিষেধ করিতেছি না"। মা অমনিই বলিলেন, "এই আমার আদেশ হইল", বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। ভোলানাথ বলিলেন, "আমি সঙ্গে না থাকিলে লোকে তোমাকে নিন্দা করিবে"। মা অমনি বলিলেন, "লোকে নিন্দা করে, এমন কোন কাজই আমি করিব না। বাবা সঙ্গে যাইতেছেন, তবুও কেহ নিন্দা করিবে কি"? বলিয়া জিজ্ঞাসু ভাবে সকলের মুখের দিকে চাহিলেন। অনেকেই বলিলেন, "না, মা, কেন নিন্দা করিবে"? মা আর কিছু বলিলেন না।

যাওয়ার সময় হইয়া আসিল। একখানা মোটর উপস্থিত ছিল, কিন্তু মা মোটরে যাইতে রাজি হইলেন না, সকলকে নিয়া হাঁটিয়াই ষ্টেশনে চলিলেন। বহু লোক আলো নিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সীতানাথও যাইতে চাহিল, মা তাহাকেও সঙ্গে নিলেন। জ্যোতিষ দাদা আসিয়া এক ধারেই দাঁড়াইয়াছিলেন। মার কাছে যান নাই। আমরা মাকে নিয়া ষ্টেশনে চলিয়া গেলাম। একটু পরেই জ্যোতিষ দাদাকে নিয়া এবং আরও ২।১ জনকে সঙ্গে নিয়া ভোলানাথ ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মা একটি গাছের নীচে বসিয়া পড়িলেন; ভক্তেরা ঘিরিয়া বসিল। সকলেই ম্রিয়মাণ। অনেকে আমার কষ্ট হইবে ভাবিয়া বলিতেছেন "মা, দিদিকে নিয়া যাও"। মা রাজি হইলেন না। সেখানেই সকলের পকেট খুঁজিয়া যাহা পাওয়া গেল, সেই টাকা দিয়াই টিকিট কিনিয়া দেওয়া হইল। মা ময়মনসিংহে কালীপদ বাবুর (ভোলানাথের ভ্রাতুষ্পুত্র) বাসায় প্রথম যাইবেন বলিলেন। আশু কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আশু তখন ঢাকায় ছিল না।

ষ্টেশনে শ্রীশ্রীমা সীতানাথের মা'র সহিত গমন।

মাঠে বসিয়া মা বলিতেছিলেন, "অনেকদিন যাবৎই এই ভাবে বাহির হইবার একটা খেয়াল হইতেছে। কিন্তু ভোলানাথ রাজি না হওয়ায় হইতেছিল না। কিন্তু যে ভাবটা হয়, তাহাতে বাধা দিলে (আমি হয়ত আদেশ পালন করিয়া যাই) শরীরটা যেন কেমন হইয়া যায়। তাই এই ভাবের বাধা পাইয়া শরীরটা প্রায়ই কেমন শক্ত হইয়া যাইত; অনেক চেষ্টায়ও শীঘ্র ঠিক হইত না। তোমরা যা বল করিয়া যাই, শরীর যা হয় হউক"।

ষ্টেশনে কিছুক্ষণ বসিবার পর গাড়ী আসিল। ভোলানাথ ও জ্যোতিষ দাদা মার দিকে ছিলেন না। গাড়ী আসিলে, মা উঠিয়া বসিলেন।

জ্যোতিষ দাদার মায়ের সহিত গমন।

তখন দেখি, জ্যোতিষ দাদাও গাড়ীতে গিয়া উঠিয়াছেন। মা কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "বাবা আমাকে সঙ্গে যাইতে বলিয়াছেন, আমি সঙ্গে যাইব"। এ কথা আর কেহই শুনিল না। মা আর কিছু বলিলেন না। গাড়ী ছাড়িয়া দেওয়ার পর ভোলানাথ রাগে, দুঃখে খুবই বিমর্ষ হইলেন; অথচ গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চুপ করিয়া দূরে ছিলেন। যেই মার কাজটি ঠিক হইয়া গেল, তখন তিনি চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। আমরা ভোলানাথকে নিয়া কয়েকজন আশ্রমে চলিয়া গেলাম। অপরাপর সকলে বাড়ী চলিয়া গেলেন।

পরদিন অতি প্রত্যুষে বাবা শ্রীশ্রীমার জন্য ২১ খানা কম্বল ও কাপড় নিয়া ময়মনসিংহ চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া দেখেন, মাও

৺আদিনাথ যাত্রা

রওনা হইতেছেন। বাবা কম্বল দিয়া সেই দিন সন্ধ্যায় ঢাকায় ফিরিয়া আসিলেন। কারণ, মা নিষেধ করিয়াছেন; তিনি সঙ্গে যাইবেন না। মা ৺আদিনাথ (চট্টগ্রাম) যাইতেছেন। ময়মনসিংহেও আশুকে, তাহার ভ্রাতা কালীপদ

বাবুর বাসায় পাওয়া গেল না। আশু নারায়ণগঞ্জে ছিল। মা চলিয়া যাওয়ার পর ঢাকায় আসে। বাবা ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় মার খোঁজে একাই বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি উৎসব উপলক্ষে ৺কাশী হইতে ঢাকায় আসিয়াছিলেন। জ্যোতিষ দাদা, সীতানাথ ও দাদামহাশয় মাকে নিয়া কক্সবাজার হইয়া ৺আদিনাথ পাহাড়ে যান। ৫।৭ দিনের মধ্যেই জ্যোতিষ দাদা মাকে ৺আদিনাথে রাখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। কারণ, তাঁহার চাকুরি আছে।

ভোলানাথ, জ্যোতিষ দাদার কাছে মা ৺আদিনাথে আছেন খবর পাইয়াই, আশুকে নিয়া তথায় রওনা হইয়া গেলেন। এদিকে কুঞ্জ বাবু খুঁজিতে খুঁজিতে মাকে ধরিলেন। ভোলানাথ কয়েকদিন ৺আদিনাথে থাকিয়া মাকে এবং সঙ্গীয় সকলকে নিয়া, চট্টগ্রাম হইয়া ৺চন্দ্রনাথ আসিলেন। এখানে মার পুরাতন ভক্ত শশীবাবু, চট্টগ্রাম হইতে সঙ্গে আসিয়া, ৺চন্দ্রনাথ দর্শন করাইলেন। ৺চন্দ্রনাথ দেখিয়া, মা ও ভোলানাথ সকলকে নিয়াই কলিকাতা চলিয়া যান।

ভোলানাথের ৺আদিনাথ গমন ও মাকে নিয়া ৺চন্দ্রনাথ হইয়া কলি-কাতা প্রত্যাগমন।

কলিকাতায় আসিয়া সালকিয়ার পিসিমার ওখানে গিয়া আবার ভোলানাথকে কি কথায় বুঝাইয়া, তাঁহাকে সেই বাসায় রাখিয়া, মা আশুকে ও দাদামহাশয়কে নিয়া ৺হরিদ্বার চলিয়া গেলেন। সীতানাথকে ভোলানাথের কাছে রাখিয়া গেলেন। কুঞ্জ বাবুকেও মা থাকিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ৺কাশী পর্য্যন্ত যাইতেছেন, এইরূপ বলিয়া সঙ্গেই গেলেন; কিন্তু তিনি ৺কাশীতে নামিলেন না; মার সঙ্গে ৺হরিদ্বারই চলিয়া গেলেন। তথা হইতে মা দেরাদুনে গিয়া সহস্রধারা দেখিয়া পুনরায় ৺হরিদ্বারে ফিরিয়া আসেন।

শ্রীশ্রীমার ৺হরিদ্বার যাত্রা ও দেরাদুনে সহস্রধারা দর্শন।

দাদামহাশয়কে বলিয়াই যান কুঞ্জ বাবু জানিতেন না। কোথায় গেলেন দাদামহাশয় জানিতেন না। কুঞ্জ বাবুকে না জানাইবার কারণ; তিনি প্রায়ই বলিতেন চলিয়া যাইব, কিন্তু যাইতেছেন না। এইরূপে ফাঁকি দিবার জন্য মা তাঁহাকে জানাইলেন না, মা আশুকে নিয়া গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গিয়াছেন। হঠাৎ খেয়াল হওয়ায়, বাসা হইতে কম্বল দুইখানা আশুকে দিয়া আনাইয়া, মা গঙ্গার ধার হইতেই ষ্টেশনে চলিয়া গেলেন। দাদামহাশয়েরা খবরও পাইলেন না। মা আশুকে নিয়া ৺অযোধ্যায় আসিলেন। সেখানকার টিকিট মাষ্টারের সহিত পরিচয় হইল। তিনিই মাকে নিজ বাড়ীতে নিয়া গেলেন। ২।১ দিন তথায় থাকিয়া মা আবার ৺হরিদ্বার আসিয়া এবারে ভোলাগিরির আশ্রমে উঠিলেন। আশু কখনও রাস্তায় বিশেষ চলাফেরা করে নাই। মা বোধ হয় দেখিলেন, তাহাকে নিয়া একা বাহির হওয়া সুবিধা নয়। ভোলাগিরির ধর্ম্মশালায় তখন শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় ও ৺কাশীর অন্যান্য অনেকে ছিলেন। তাঁহারা মাকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। গোপী বাবু গিয়া দাদামহাশয়দের খবর দিলেন। তখন তাঁহারা মার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা হাসিতে লাগিলেন; এ কয়দিন দাদামহাশয়েরা খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইত্যবসরে কুঞ্জ বাবুর খুব পেটের অসুখ হইয়া পড়িয়াছিল।

৺অযোধ্যা গমন ও ৺হরিদ্বার প্রত্যাবর্ত্তন

মা কুঞ্জ বাবুকে ৺হরিদ্বার রাখিয়াই আশুকে ও দাদামহাশয়কে নিয়া ৺কাশীতে বাচ্চুদের (নির্ম্মল বাবুর পুত্র) বাসায় আসিয়া উপস্থিত। এদিকে ৺হরিদ্বার হইতে কুঞ্জ বাবু অসুস্থ বলিয়া ৺কাশীতে তাঁর ছেলেদের কাছে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। সেই টেলিগ্রাম পাইয়া,

৺হরিদ্বার ত্যাগ ৺কাশীধাম ও ৺বিন্ধ্যাচল গমন।

জিতেন দাদা (জ্যেষ্ঠ পুত্র) এবং বাচ্চুর মা (কুঞ্জ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রী) তাঁহাকে ৺কাশী আনিবার জন্য, মা ৺কাশীতে পৌছিবার পূর্ব্বেই, রওনা হইয়া গিয়াছেন। ৺কাশীতে গিয়া দাদামহাশয়ের জ্বর হইল। মা তাঁহাকে সেই বাসায়ই রাখিয়া আশুকে নিয়া রওনা হইলেন। সঙ্গে কুঞ্জ বাবুর চতুর্থ পুত্র ননী এবং ৺কাশীর আর একটি বালক ভক্ত মাণিক*, এই দুইজন সঙ্গে চলিল। মার সঙ্গে মাত্র তিনজন; সকলেই ছেলে মানুষ। কোথায় যাইবেন, ঠিক নাই। মোগলসরাই ষ্টেশনে গিয়া ননী বলিল, "মা চল, ৺বিন্ধ্যাচল"। মা ও তাই চলিলেন। তখন অনেক সময় দেখা যাইত, কেহ কিছু বলিলে, মা তখনই তাহা করিয়া ফেলিতেছেন। এক এক সময় যেমন কেহই মাকে টলাইতে পারিতেছে না, আবার এক এক সময় যেন মা শিশুর মত সকলের মতে চলিতেছেন; এই ভাব দেখা যাইত। আজ ননীর কথাতেই রাজি হইয়া মা ৺বিন্ধ্যাচলে গেলেন। ৺বিন্ধ্যাচল আশ্রমে গিয়া উঠিলেন।†

---

* ইহার মাতাও শ্রীশ্রীমার খুবই ভক্ত ছিলেন। যখন মার কাছে খুব ভিড় হইত, তখন উঠিয়া গেলে আর যদি জায়গা না পাওয়া যায়, এই ভয়ে তিনি অনেকদিন উপবাসী থাকিয়াও মার কাছে বসিয়া শুধু মাকে দেখিতেন। ১৩৪২ সালে ইহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই মা হঠাৎ গিয়া ৺কাশী উপস্থিত হন। মাকে দর্শন করিয়া পরদিনই মাণিকের মা প্রাতে মারা গেলেন। মাণিক সুযোগ পাইলেই মাকে দর্শন করিতে যাইত।

† বাবা ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই এই আশ্রম তৈয়ার করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে মা ও ভোলানাথকে বিন্ধ্যাচল আনিয়া, তাঁহারা এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন।

এদিকে জিতেন দাদা ও বাচ্চুর মা কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে নিয়া ৺কাশী পৌঁছিয়া খবর পাইলেন, মা ৺কাশী আসিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের খুব দুঃখ হইল। তাঁহারা খবর পাইয়া, অথবা অনুমান করিয়া, সেই দিনই ৺বিন্ধ্যাচল গিয়া, মার দর্শন পাইলেন। মাকে ৺কাশী আসিবার জন্য অনুরোধ করায় মা রাজি হইয়া তাঁহাদের সহিতই পুনরায় ৺কাশী আসিয়া বাচ্চুদের বাসাতেই উঠিলেন।

৺বিন্ধ্যাচল হইতে ৺কাশীতে পুনরাগমন

ওদিকে ভোলানাথ কলিকাতা হইতে কস্‌বা এবং তথা হইতে কয়েকটি পীঠস্থান দর্শন করিয়া চাঁদপুরে ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত গিরিজা কুশারী ডাক্তার মহাশয়ের বাসায় আছেন। নানা স্থানে ঘুরিয়া তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। এই খবর পাইয়া মা আশুকে ৺কাশী হইতেই তথায় পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে দাদামহাশয়েরও জ্বর হইল। একদিন রাত্রিতে নির্ম্মল বাবুর বাসাতেই মার নিকটে কীর্ত্তন হইতেছে। কীর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সকলে বিদায় নিতেছেন। একজন বলিতেছেন, "মা, যখন যাও, আমরা যেন খবর পাই"। মা অমনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি এখনই যাইব"। বাসাস্থ সকলে এবং দাদামহাশয় আপত্তি করা মাত্রই মা কাঁদিয়া আকুল; দাদামহাশয়কে বলিতেছেন, "আপনি আমাকে যাইতে অনুমতি করুন"। অবস্থা দেখিয়া তিনি ভয়ে ভয়ে তখনই অনুমতি দিলেন। মা সুস্থ হইয়া বসিলেন। কে সঙ্গে যাইবে কথা উঠিল। জিতেন দাদা সঙ্গে যাইবেন স্থির হইল। তখনই যে গাড়ী পাওয়া যায়, মা সেই গাড়ীতেই কলিকাতা রওনা হইলেন; সেখানে গিয়া শ্রীযুক্ত গিরীন ডাক্তার মহাশয়ের বাসায় উঠিলেন। গিরীন বাবু, জিতেন দাদার বিশেষ বন্ধু। ইনি জিতেন দাদার সহিত

চাঁদপুরে ভোলানাথের অসুখ—মার কলিকাতা গমন।

বহুপূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত প্যারী বানু বেগমের থিয়েটার রোডের বাসায় গিয়া কীর্ত্তনে মাকে দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। ইনিও মাকে খুবই শ্রদ্ধা ভক্তি করেন।

নবম অধ্যায়

মা পূর্ব্বে একবার ৺নবদ্বীপ গিয়া এক মৌনী সাধুকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। সাধুর ঘরে ঢুকিতে দেয় না, দূর হইতে দেখিতে হয়। সাধু খুব স্থির ভাবে আসন করিয়া বসা ছিলেন। ভোলানাথ, চারু বাবু প্রভৃতি অনেকের বিশ্বাস হইয়াছিল, উহা মনুষ্য মূর্ত্তিই নয়। একটি কৃষ্ণনগরের পুতুল; টাকা উপায়ের জন্য মানুষ বলিয়া বলা হইতেছে। কথায় কথায় গিরীন বাবুর বাসায় সেই সাধুর কথা উঠিল; মা পুনরায় তাঁহাকে দেখিতে যাইবেন বলায়, গিরীন দাদার এক বিধবা ভ্রাতৃবধূ, গিরীন দাদা ও জিতেন দাদা, মাকে নিয়ে ৺নবদ্বীপে গেলেন। মা তথায় ঐ মৌনী সাধুর আশ্রমেই গিয়া উঠিলেন; এবং কয়েকদিন সেখানে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, গিরীন দাদার ভ্রাতৃবধূকে মার কাছে রাখিয়া, তাঁহারা দুই জনে কলিকাতা চলিয়া আসিলেন। মা তখন সারা দিন পর ২।৩ খানা রুটী ও একটু শাক সিদ্ধ খাইতেন। গিরীন দাদার ভ্রাতৃবধূই তাহা করিয়া মাকে খাওয়াইতেন এবং নিজেও খাইতেন। মার কাছে কোন রহস্যই গোপন থাকে না। সাধুর সকল রহস্যই প্রকাশ করিয়া, মা ৺নবদ্বীপ হইতে পুনরায় কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। গিরীন দাদা গিয়াই মাকে নিয়া আসিলেন। এই সাধু সম্বন্ধে রহস্য উদ্‌ঘাটন অন্যত্র বিবৃত হইল।

৺নবদ্বীপ গমন ও কলিকাতা প্রত্যাগমন।

মা একান্তে থাকিবেন বলায়, গিরীন দাদা মাকে এবং পরিবারস্থ সকলকে নিয়াই নিজের গ্রামের বাড়ীতে "আখ্‌না" চলিয়া গেলেন।

সেখানে মা আপন মনে থাকিতেন। মা যে ভাবে থাকিতে চাহিলেন, তিনি সেই ভাবেই মাকে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। মা একান্তে পড়িয়া থাকিতেন। কাহাকেও সেখানে যাইতে দেওয়া হইত না। গিরীন দাদা কাহাকেও মার খবর দিলেন না; কারণ, খবর পাইলে লোক জন আসিবে। বিশেষতঃ, মা এই ভাবেই থাকিতে চাহিয়াছিলেন।

"আখ্‌না"তে গিরীন বাবুর বাড়ীতে একান্তে বাস।

কিছুদিন এইভাবে থাকার পর, গিরীন দাদা খবর পাইলেন, ভোলানাথের খুব অসুখ। তিনি মাকে এই খবর দিয়া তাঁহাকে নিয়া কলিকাতায় আসিলেন। জ্যোতিষ দাদাও তখন সরকারী কাজে কলিকাতাতেই ছিলেন। তিনি এবং সুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি ভক্তেরা সকলেই মার খবর পাইলেন। জ্যোতিষ দাদা, তাঁর বন্ধু জ্ঞান সেন মহাশয়ের বাসায় মাকে নিলেন। কমলাকান্তকে ঢাকা হইতে নেওয়াইলেন। এদিকে সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ভোলানাথকে মার কলিকাতা পৌঁছিবার খবর দিয়া টেলিগ্রাম করেন। কয়েকদিন যাবৎ মার খবর পাওয়া যাইতেছিল না। টেলিগ্রাম পাইয়াই ভোলানাথ কলিকাতায় আসিলেন। জ্ঞান সেন মহাশয়ের বাসাতে তাঁহাদের দেখা হওয়ার পর তাঁহারা সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন। ভোলানাথ খুব রাগ করিলেন। মা কলিকাতাতেই রহিলেন।

কলিকাতায় মা ও ভোলানাথ।

ইতিমধ্যে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় তাঁর গুরুদেব শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ স্বামীকে নিয়া ৺পুরী যাইতেছেন। সঙ্গে দাদামহাশয়ও যাইতেছেন। কলিকাতাতে গোপীনাথ বাবু মার সঙ্গে দেখা করিলেন।

তাঁর ইচ্ছা ছিল, তাঁর গুরুদেবের সহিত মার দেখা করাইবেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তখন ইহা হইল না। অনেকদিন পর একবার ৺কাশীতে গোপীনাথ বাবু মাকে বিশুদ্ধানন্দ স্বামীজির কাছে নিয়া গিয়াছিলেন। আমরা অনেকেই তখন সঙ্গে ছিলাম। তিনি মাকে দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দাদামহাশয়ের ৺পুরী যাত্রা।

মা ভোলানাথের সহিত দেখা হওয়ার পর প্রায় মৌনীই আছেন। জ্যোতিষ দাদা কয়েকদিন পর ঢাকা চলিয়া গেলেন। সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৃদ্ধা মাতা মাকে বড়ই ভালবাসিতেন। তিনি মাকে খুব যত্ন করিয়া খাওয়াইতে ভালবাসিতেন। মা প্রায় দুই বৎসর যাবৎ দুধ সম্পর্কীয় সব জিনিষই খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। এমন কি ঘি দিয়া কিছু করিলেও খাইতেন না; ভাত মাছ তরকারী মা কখনও বেশী খাইতেন না। কাজেই বৃদ্ধা মাকে কিছু খাওয়াইতে না পারিয়া বড়ই মনোকষ্টে ছিলেন। এবার মা তাঁহার বাসাতেই গিয়াছেন। "নিস্তারিণী" ব্রতোপলক্ষে বৃদ্ধা নানা জিনিষ দিয়া পূজার যোগাড় করিয়াছেন। তাঁহার মনে কেমন ভাব হইল, তিনি বলিলেন:—"মা-ই যখন উপস্থিত, তখন আবার কি পূজা দিব? মা খাইলেই সব হইবে।" এই বলিয়া পূজার নৈবেদ্য ও অন্যান্য সব জিনিষ আনিয়া মার সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। এবং মাকে খাওয়াইতে বসিলেন। মা সেইদিন ভাল ভাবেই বৃদ্ধার হাতে সব খাইলেন। পরে বলিলেন, "তোমার না দুঃখ আছে, আমি দুধের জিনিষ খাই না? আজ তোমার যাহা ইচ্ছা, খাওয়াইয়া দেও"। বৃদ্ধা মহানন্দে মাকে দধি ইত্যাদিও একটু একটু খাওয়াইয়া দিলেন। প্রায় দুই বৎসর পর মা দুধের জিনিষ খাইলেন। পরে মা

সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মাতার ও স্ত্রীর হস্তে শ্রীশ্রীমায়ের ভোগ গ্রহণ।

উঠিয়া পাকের ঘরে গেলেন। সেখানে সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী মাছ ইত্যাদি কি পাক করিতেছিলেন। মা সেখানে বসিয়াই তাঁহার হাতেও খাইয়া আসিলেন। সকলেই মহা খুসি হইলেন।

সকলকেই আনন্দিত করিয়া মা, ভোলানাথ ও কমলাকান্তের সহিত চাঁদপুর রওনা হইয়া গেলেন। খবর পাইয়া বাবা, নিশিবাবু ও জ্যোতিষ দাদা, মা এবং ভোলানাথকে আনিবার জন্য চাঁদপুরে গেলেন। ২।১ দিন থাকিয়া জ্যোতিষ দাদা এবং পরে বাবা ঢাকায় চলিয়া আসিলেন। নিশিবাবুকে রাখিয়া আসিলেন।

ভোলানাথ সহ শ্রীশ্রীমায়ের চাঁদপুর গমন।

কয়েকদিন পর নিশিবাবু মা ও ভোলানাথকে নিয়া ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহারা ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে গিয়া রহিলেন। ঢাকা ত্যাগের প্রায় আড়াই মাস পরে চাঁদপুর হইতে মা আবার ঢাকায় ফিরিলেন। আমি এই আড়াই মাস কাল মার পূর্ব্বের আদেশ মত মৌনী ছিলাম। আজ মাকে দর্শন করিয়া মার আদেশ মত কথা বলিলাম। দেখিলাম, মা মৌনীই আছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের ঢাকা প্রত্যাগমন। সিদ্ধেশ্বরীতে অবস্থান।

কমলাকান্ত চাঁদপুর হইতেই অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল। ভোলানাথের ইচ্ছায় শুধু মা এবং ভোলানাথই সিদ্ধেশ্বরীতে রহিলেন। ভোলানাথের দিদিমার সাহায্যে মা-ই পাক করিতেন অবশ্য অতি অল্পদিনই তাহা হইয়াছিল, ৪।৫ দিনও হইবে কিনা সন্দেহ। তারপরই ভোলানাথ অসুস্থ হইয়া পড়েন। আমরা গিয়া দর্শন করিয়া চলিয়া আসিতাম। মটরী পিসিমা, দিদিমা প্রভৃতি সিদ্ধেশ্বরীতে ৺অশ্বিনী কুমারবাবুর বাসাতেই আছেন। একদিন মা অতি মৃদুস্বরে ভোলানাথের সহিত কি কথা বলিলেন, গলার শব্দও যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে; মুখের চেহারা খুবই

মলিন। কথাবার্ত্তার পর আমাকে ডাকিলেন। বলিয়া দিলেন, বাবা ও আমি যেন আগামী কল্য উপবাসী থাকি ; সন্ধ্যার পর কাজ আছে। পর দিন উপবাসী রহিলাম, মার কাছে গেলাম। সন্ধ্যার পর মার আদেশে ভোলানাথ, বাবা, আমি, কুলদা দাদা ও যোগেশ দাদা এই পাঁচজনে ৫টী ফল, যজ্ঞ কুণ্ডের মধ্যে আহুতি দিলাম। রাত্রিতে আমরা চলিয়া আসিলাম।

শ্রীশ্রীমাকে মাংসের তরকারি প্রদান, এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহার উক্তি।

এই সময়ে একদিন দিদিমা মাংস পাক করিয়াছেন ; মাকেও কিছু মুখে দিয়াছেন। সেইদিনই, কি পরদিনই, মা ভৈরবীর ঘরের দরজায় বসিয়া আছেন, হঠাৎ ভয়ানক ভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন। ভোলানাথও আশ্রম হইতে গেলেন, আমরাও সেইখানেই ছিলাম মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন :—"কাল আমাকে মাংস খাওয়াইয়াছে। মাংসে রক্ত ছিল, গাছের ফলেও রক্ত আছে, দুধও গরুর রক্ত ; সব রক্ত ; আমাকে এসব কিছু মুখে দিও না।" সেই হইতেই অনেকদিন এসব জিনিষ খান নাই। ধীরে ধীরে মার মৌন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

ঢাকা সিদ্ধেশ্বরীতে ভোলানাথের অসুখ। (১৩৩৬ আষাঢ় বা শ্রাবণ)

কয়েকদিন পরই ভোলানাথের একদিন রাত্রিতে ভয়ানক পেটের বেদনা আরম্ভ হইল। ১৩৩৬ সনের আষাঢ় মাসের শেষ ভাগ হইবে কি শ্রাবণ মাসের প্রথম। সারারাত্রি মাও জাগিয়া যতটুকু পারিলেন সেবা করিলেন। পরদিন সকলে গিয়া এই অবস্থা দেখিলেন। চিকিৎসা আরম্ভ হইল। ২।১ দিন পরই ভোলানাথকে ৺অশ্বিনীবাবুর বাড়ীতেই একটা কোঠায় নিয়ে যাওয়া হইল। কারণ, সিদ্ধেশ্বরীতে মাটিতে থাকা এই অবস্থায় সঙ্গত নয়। মাও তথায় গিয়া

রহিলেন। মা সর্ব্বদাই ভোলানাথের চৌকীর উপর অথবা চৌকীর ধারে মাটিতে বসিয়া থাকিতেন। সেবাও যতটুকু পারিতেন, করিতেন। কথা খুবই কম বলিতেন, প্রায় সব সময়ই চুপ করিয়া থাকিতেন। কিছুদিন পর ভোলানাথ অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিলেন। মা ভোলানাথের অনুমতি নিয়া মধ্যে মধ্যে গিয়া দুপুর বেলা সিদ্ধেশ্বরীর আশ্রমে পড়িয়া থাকিতে লাগিলেন। আবার বৈকালে উঠিয়া আসিতেন।

এই ভাবে একদিন মা সিদ্ধেশ্বরীর আশ্রমে দরজা বন্ধ করিয়া পড়িয়া আছেন। কয়েকজন স্ত্রীলোক মার সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন। মাকে বাহির হইতে ডাকিতেই মা উঠিয়া যেমন দরজা খুলিতে যাইবেন, শরীর ঠিক ছিল না, টলিতেছিল কাজেই দরজার কাছে গিয়াই পড়িয়া গেলেন। তৎপরে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিয়াই আবার গিয়া শুইয়া রহিলেন। যাঁহারা মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা দেখেন, রক্তে মার মাথার কাপড় ভিজিয়া যাইতেছে। তখন মাকে উঠাইলেন। মার খেয়ালই নাই যে, পড়িয়া যাওয়াতে মার মাথা কাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতেছে। জল দিতে দিতে অনেক পরে রক্ত বন্ধ হইল। চুলও কিছুটা কাটিয়া দেওয়া হইল। মা চুপ করিয়া বসিয়াই আছেন। অনেকদিন পরে এই ঘা শুকাইয়াছিল।

সিদ্ধেশ্বরীতে ভাবাবস্থায় উঠিয়া দরজা খুলিতে যাওয়ায় পতন হেতু, শ্রীশ্রীমায়ের মস্তক কাটিয়া রক্তপাত।

ক্রমে ক্রমে ভোলানাথ অন্নপথ্য করিলেন। ঐ বাড়ীতেই আছেন। তখন একদিন কলিকাতা হইতেই খবর আসিল, সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতা ও স্ত্রী, উভয়েই হঠাৎ মারা গিয়াছেন। তখন বুঝিলাম, এইজন্যই মা এবার কলিকাতা হইতে আসিবার সময় তাঁহাদের হাতে দুধ ইত্যাদি সব খাইয়া তাঁহাদের আনন্দ বিধান

ভোলানাথের আরোগ্য-লাভ এবং সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বৃদ্ধা মায়ের কথা।

করিয়া আসিয়াছিলেন। এই বৃদ্ধাকে মা ৺হরিদ্বারে কুম্ভমেলার সময় সঙ্গে নিয়া গিয়াছিলেন। বহু তীর্থ ঘুরাইয়া আনিয়াছিলেন। বৃদ্ধা আর কখনও বড় তীর্থাদিতে যান নাই। মার কৃপায় তাঁর অনেক তীর্থস্থান দর্শন হইয়াছিল।

কয়েকদিনের মধ্যেই মার একটু একটু জ্বর আরম্ভ হইল। (সম্ভবতঃ ইহা ১৩৩৬ সনের শ্রাবণ মাসে হইয়াছিল।) মার ত কখনও কোনও খেয়াল নাই। অসুখের মধ্যে ভাত খাওয়াইয়া দিতেছে, তাই খাইতেছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের অসুখ (১৩৩৬ শ্রাবণ) এবং তদবস্থাতেই সিদ্ধেশ্বরীতে যাতায়াত।

কোনও কারণে আমরা তখন ওখানে বেশী থাকিতাম না। দিনের মধ্যে একবার যাইয়া কিছু সময় থাকিয়া চলিয়া আসিতাম। ভোলানাথের অসুখ, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার দুই শিশি ঔষধ দিয়াছেন। মার হঠাৎ খেয়াল হইল ডাক্তারকে বলিতেছেন, "আমার মনে হয়, বাবা এই একটার মধ্যে জল"। ডাক্তার হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ মা আমাদের রোগীর সান্ত্বনার জন্য অনেক সময় ইহা করিতে হয়"। সেইদিন মা আপন খেয়ালে বলিতেছেন, "আমি ঔষধ খাইব, আমার জ্বর হইয়াছে, জ্বর হইয়াছে, আমায় ঔষধ দাও"। এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন। দিদিমা জল আনিয়া খাওয়াইতেই বলিলেন, "আমি ঔষধ খাইলাম, আমার জ্বর হইয়াছে"। এই বলিতে বলিতেই সত্যি সত্যিই জ্বর আসিল। আর অবশ ভাব যে হইল তাহাও একটা যোগ ক্রিয়া, জ্বরটা যেন এই অবস্থাটা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য। মা-ত সর্ব্বদাই নিজের অবস্থাটা লুকাইয়া রাখিতেই চান।

একদিন জ্বর বেশী বোধ হওয়ায় ৺অশ্বিনীবাবুর ছোট মেয়ে (নাম "ছানা") জোর করিয়া মাকে থার্ম্মোমিটার লাগাইয়া দেখে, জ্বর খুব উঠিয়াছে। সেদিনও মা ভাত খাইলেন। এরূপ অবস্থাতেও রোজ

প্রায় দুপুরে গিয়া সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে পড়িয়া থাকেন। সেদিনও মা গেলেন, আবার বিকালে ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন খাওয়া দাওয়া একটু তাড়াতাড়ি করিয়া সিদ্ধেশ্বরী-আশ্রমে চলিয়া গেলেন। ভোলানাথকে বলিয়া গেলেন, "এখনই যাই, এরপর যদি যাইতে না পারি"। এ কথার অর্থ কেহই বুঝিল না। দুপুরে গিয়া আশ্রমে শুইয়া আছেন। তখন আমি ও বাবা গিয়াছি। গিয়া দেখি সাধারণ কি একটু বিছাইয়া মা মাটিতে পড়িয়া আছেন। গায়ে হাত দিয়া দেখি গা জ্বরের তাপে যেন আগুন! মা আমাদের সাথে স্বাভাবিক ভাবেই কয়েকটি কথা বলিলেন।

অসুখ অবস্থায় শ্রীশ্রী-মায়ের সিদ্ধেশ্বরীতে অবস্থান।

আরও ২।৪ জন আসিলেন। মাকে দর্শন করিয়া চলিয়া গেলেন। মার জ্বরের খবর পাইয়া দিদিমা, পিসিমা প্রভৃতি সকলেই আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে মা বমি করিলেন। ঘরে তখন আমি ছাড়া আর কেহই ছিল না। কেননা, মা সকলকে একটু সরিয়া যাইতে বলিয়া বমি করিলেন। প্রকাণ্ড একটি কৃমি পড়িল। মা আমাকে বলিলেন, "ফেলিয়া দিয়া আস। কাহাকেও কিছু বলিও না"। পরে সকলেই ঘরে আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে সন্ধ্যার পূর্ব্বে মা প্রস্রাব করিতে যাইতে চাহিলেন। আমি ধরিয়া বাহিরে নিয়া গেলাম। কিন্তু উঠিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় মা আর পারিলেন না; হঠাৎ সমস্ত শরীর ছাড়িয়া দিলেন। একেবারে সব শরীর অবশ হইয়া গিয়াছে। তখন আরও ২।৪ জন আসিলেন। তাঁহাদের সাহায্যে মাকে ঘরে নিয়া শোওয়াইয়া দিলাম। জ্বরও খুব বেশী; তার মধ্যে এইভাবে সমস্ত শরীর অবশ হইয়া যাওয়ায়, বাবা প্রভৃতি সকলেই ভয়ানক চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। খবর পাইয়া ভোলানাথও আসিয়াছেন। তিনিও এই আশ্রমেই থাকিবেন বলিলেন। মা আশ্রম

ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে চাহিলেন না। আর নিয়া যাওয়াও এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু মার যেন আনন্দ বাড়িয়া উঠিল। ভোলানাথ আমাকে মার কাছে থাকিতে অনুমতি করায়, আমি সেইদিন হইতেই মার কাছে রহিয়া গেলাম। বাবা ও যোগেশ দাদা উভয়ে রাত্রিতে সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমেই থাকিলেন। কোনও কারণে জ্যোতিষ দাদার তখন আশ্রমে যাওয়া নিষেধ ছিল। তাই তিনি যাইতে পারিলেন না। তাঁর বাসা আমাদের টিকাটুলীর বাসার অতি নিকটেই। কাজেই, বাবা যখন সকালে বাসায় যাইতেন, তখনই তাঁহার মুখে জ্যোতিষ দাদা খবর পাইতেন। এবং অন্যান্য সকলের মুখে খবরও লইতেন।

এদিকে সেইদিন সকলে চলিয়া গেলেন। মার অবস্থা ভয়ানক হইল। মার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সব একেবারে অবশ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পরে বৃষ্টি পড়িতেছে। আর এই সব ক্রিয়ার পরে মার মাথাটা নরম হইয়া গিয়াছিল ও মাথার মধ্যস্থানে একটা জায়গায় ডাবিয়া গিয়াছিল। মোটের উপর কোন ক্রিয়ায় যে শরীরে সব কিছুই হইতে পারে তারই একটা প্রকাশ। গোপীবাবুর সহিত এই কথা হইয়াছে। এর মধ্যে মা বলিলেন, "আমাকে বাহিরে নিয়া চল"। আমি, বাবা, যোগেশদাদা ও ভূপতিদাদা মাকে ধরাধরি করিয়া বারান্দায় নিয়া গেলাম। বৃষ্টি লাগিতেছে দেখিয়া বাবা ঘরে নিয়া যাইতে চাহিলেন। মা হাসিয়া বলিলেন, "ডাক্তার কিনা, সংস্কার যাইতে চায় না"। মা ঘরে আসিলেন না। একবার বলিলেন, "আমাকে উঠাইয়া বসাও"। আবার বলিলেন, "হাত পা শরীর গুটাইয়া বলের মত করিয়া দাও"। পুনশ্চ বলিলেন, "হাত পা টান করিয়া শোওয়াইয়া দেও"। এইভাবে যখন যাহা বলিতেছেন, আমরা তাহাই করিয়া দিতে

উক্ত অসুখের ও তাহার অদ্ভুত উপসর্গের কথা।

লাগিলাম। ইহা "আসন" করিতেছেন কি না, কে জানে? বহুক্ষণ এইভাবে কাটিল। পরে বলিলেন, "ঘরে নিয়া চল"। ঘরে নিয়া আসিলাম। তখন শরীর এমন হইয়াছে যে উঠাইয়া বসাইয়া যদি দুই-জনে ভাল করিয়া মাথা ও ঘাড় ধরিয়া না রাখি, তবে অতি ছোট শিশুর যেমন মাথা সোজাভাবে রাখা যায় না, ঘাড় ভাঙ্গিয়া মাথা পড়িয়া যায়, ঠিক সেই অবস্থা। সব শরীর যেন আল্‌গা হইয়া গিয়াছে; ঠক্ ঠক্ করিতেছে। অথচ এই অবস্থায় অনবরতই দিন রাত্রি উঠাইতে, বসাইতে, শোওয়াইতে বলিতেছেন; অনবরতই শরীরের একটা না একটা কিছু পরিবর্ত্তন করিতে বলিতেছেন। ঔষধ কিছুই খাইতেছেন না। মাকে কেহ ঔষধের কথা বলায় মা বলিয়াছিলেন "আমার ত কিছু আপত্তি নাই, তবে একবার কিছু আরম্ভ করিলে, আর অল্পেতে তাহা শেষ হয় না, ইহা বুঝিয়া তোমরা যাহা হয় কর"। কিন্তু আমাদেরও ঔষধ মাকে দেওয়ার কোন আবশ্যকই মনে হয় নাই। দিনে বাবা ও যোগেশ দাদার কার্য্যোপলক্ষে চলিয়া যাইতে হইত। আমি ও ভোলানাথ মাকে নিয়া থাকিতাম। দিদিমা, পিসিমাও রান্নাবান্না শেষ করিয়া আসিতেন। মার অবস্থা একই ভাবে চলিতেছে। পায়খানায় নিয়া যাওয়া মহা বিপদ। মা হাসিয়া বলিতেন, "ময়দার বস্তার মত শরীরটার অবস্থা হইয়াছে"। বাস্তবিকই ৩।৪ জনে ধরিয়া নিলেও শরীরের যে অংশটুকুই ভাল ভাবে ধরা হইত না, সেই অংশটুকুই পড়িয়া যাইত। শরীর যে ভাবে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহাতে অনেক চেষ্টা করিয়াও সম্পূর্ণভাবে শরীর রক্ষা করা যাইত না। ইহা দেখিয়া আমার ভয়ানক কষ্ট হইত। কখনও হয়ত এক অংশ রক্ষা করিতে অপর অংশ পড়িয়া যায়, এইরূপও হইয়া যাইত। অথচ মা কথাবার্ত্তা বেশ বলিতেছেন; আনন্দের ভাবও খুব ছিল। এই যে শরীর অবশ হইয়া পড়িয়াছে ইহাকে ডাক্তারেরা

সকলেই বলিতেছেন প্যারালিসিস্, কিন্তু এই যে শরীর ছাড়িয়া যাওয়ার মত হইয়াছিল, আসন ইত্যাদি হইল, শরীর রক্ষা হইল বটে কিন্তু আসনেরই জের কিনা কে জানে? মা নাকি বাজিতপুরেই বলিয়াছিলেন এত বছর বয়সে অর্থাৎ এই সময়েতে শরীরের একটা কিছু ঘটিবে। কি হইবে বলিয়াছিলেন তাহা এখন মনে হইতেছে না। আরও বলিয়াছিলেন যোগক্রিয়ার বিশেষ প্রকাশ হইবে। গোপীবাবু প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে "সাধনার পূর্ণতা আপনার কবে হইল? এই সময়েতেও ত যোগক্রিয়ার প্রকাশ হইল"। মা বলিলেন "তার কোন অর্থ নাই, আগেও হইতে পারে পরেও হইতে পারে"। শরীর এইভাবে অবশ হইয়া গেলেও শরীরে স্পর্শজ্ঞান খুব ছিল। এমন কি, পায়ের নীচে কি শরীরের অন্য কোন স্থানে একটি পিঁপড়া গেলেও টের পাইতেছিলেন। মার এই অবস্থা ৪।৫ দিন চলিল।

শাহাবাগে অবস্থান কাল হইতেই প্রতি শনিবারে সারা রাত্রি কীর্ত্তন রক্ষা করা হইত। প্রথমে অস্ত হইতে উদয় পর্য্যন্ত নাম রক্ষা হইত।

আমার কাতর নিবেদনে স্ব ইচ্ছায় শ্রীশ্রীমা আরোগ্য পথে।

পরে অসুবিধা হওয়ায় উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত নাম রক্ষা হইত। একদিন আমি বলিলাম "মা, এখন সুস্থ হও, আমরা ত তোমার শরীর ঠিক ভাবে রক্ষা করিতে পারিতেছি না"। সেইদিন রাত্রিতে মা শুইয়া আছেন দেখিলাম, মা চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছেন। হঠাৎ ধীরে ধীরে বাম হাতখানি উঠাইয়া আবার নামাইয়া নিলেন। ৪।৫ দিনের মধ্যে এই প্রথম মা নিজে নিজে অঙ্গ সঞ্চালন করিলেন। দেখিয়া খুব আনন্দ হইল। পরদিন, ঐ আশ্রমে বসিয়াই শনিবারের উদয় অস্ত কীর্ত্তন হইল। ২।৪ জন বসিয়া বসিয়া নাম করিতেছিলেন। হঠাৎ মা ভাবাবস্থায়

নিজে নিজে উঠিয়া বারান্দায় গিয়া বসিয়া পড়িলেন। আর উঠিতে পারিলেন না। আবার আমরা ধরাধরি করিয়া ঘরে নিয়া আসিলাম। এরপর হইতেই শরীরের অবশ অবস্থা একেবারেই ছিল না। কিন্তু জ্বর খুব বেশী চলিতেছিল। কয়েকদিন ভূপতিদাদা ও আমরা খুব থারমো-মিটার লাগাইলাম। ১০৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত জ্বর উঠিল। জ্বর প্রায় এক-ভাবেই উঠিতেছে দেখিয়া, কিছুদিন পর মার কথাতে কি নিজেদেরই বিরক্ত হওয়ায় এবং থারমোমিটার দিয়া জ্বর দেখিবার সময় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জ্বরের গতি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হওয়ায় থারমোমিটার দেওয়া বন্ধ হইয়া গেল। যেমন জ্বর হয়ত ১০১ দেখিয়া থারমোমিটার নামাইয়া আবার দিতেই দেখা গেল ১০৬ কি ১০৭। তারপর আর থারমোমিটার দেওয়া হয় নাই।

পরে একদিন রাজমোহন বাবুর স্ত্রী কি একটা ঔষধ জল দিয়া বাটিয়া মাথায় দিলেন। মা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, জল দিয়া বাটিয়া কি দেওয়া হইয়াছে। অমনি বলিলেন, "জল দেওয়া হইয়াছে, তবে ভাল করিয়াই জল মাথায় দেও"। এই মাথা ধোয়ান আরম্ভ হইল। চুলগুলি আংশিক কাটিয়া দিলাম। প্রথম দিন প্রায় ৪।৫ কলসী জল ঢালা হইল। তার পরদিন ১০ কলসী, তার পরদিন ৪০।৫০ কলসী জল মাথায় ঢালা হইল। তবুও ঢালিতেই বলিতেছেন। পরে ১০০।১৫০ কলসী জল ঢালা হইতে লাগিল। একটু বেলা হইলেই জল ঢালা সুরু হইত, সারা দুপুরটাই প্রায় জলের ধারা দেওয়া হইতে লাগিল। জল মাথায় ঢালার যেন মার একটা বিষম খেয়াল চাপিল। দেখিলাম, একদিন মাথা ধোয়াইয়াই ভুল করিয়াছি। এখন আর জল মাথায় দেওয়া বন্ধ করিয়া দিতে চান না। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জল ঢালা

শ্রীশ্রীমায়ের অদ্ভুত চিকিৎসা অবলম্বন।

চলিল। মা যা বলিতেছেন, তাই করা হইতেছে। ৩।৪টী ছেলে জল আনিতে আনিতে (কালিদাস, অমূল্য ইত্যাদি) হয়রাণ হইয়া পড়িত। একদিন জল দেওয়া বন্ধ করিয়া পুরাতন ঘি ও দুধ মাথায় দিলাম। সেই হইতেই জল বন্ধ হইয়া গেল। এই অসুস্থ শরীর; তার মধ্যে খুব আনন্দের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। ভোলানাথ মনে করিলেন, এই অসুখ নিয়া এত আনন্দ করিতেছেন, তবে অসুখ সারাইবার ভাবই জাগিবে না। তিনি মনে মনে বেশ জানিতেন, মা ইচ্ছা করিলেই সুস্থ হইতে পারেন। তাই তিনি একদিন ধমক দিয়া বলিলেন, "অসুখ নিয়া এত আনন্দের কি হইল?" তারপর হইতেই মা চুপ করিলেন। রুগ্ন অবস্থায় যেমন চুপ থাকা স্বাভাবিক সেইভাবেই থাকিতেন।

কয়েকদিন পরে ভোলানাথ একদিন মাকে বলিতেছেন, "দেখ, এখন সুস্থ হইয়া উঠ। অসুখটা সারাইয়া ফেল"। দুই তিন বার এই কথা বলিলেন। মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "দেখ, একবার ভাবে বাধা দিয়া ফিরাইয়া আনিয়া এই অবস্থা করিয়াছ; এখন আর কিছু বলিও না। যাহা হইবার হইবেই"। তখন বুঝিলাম, মাকে ফিরাইয়া আনিয়া এই ভাবে রাখাতে আজ এই অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে, ভাবে বাধা পাইলে মা আদেশ পালন করিয়া যান বটে, কিন্তু শরীরের একটা ভয়ানক পরিবর্ত্তন হয়। আমাদের কিছুই বলিবার বা করিবার উপায় নাই। শুধু তিনি যতটুকু সেবা করাইয়া লইতেছেন, করিয়া যাইতেছি মাত্র। (এই ব্যারামের পর হইতে প্রতি বৎসরই প্রায় তিন চার বৎসর পর্য্যন্ত এই সময়েই মার জ্বর হইত)।

শ্রীশ্রীমায়ের ভাবে বাধা দেওয়ায় ভোলানাথের বিপত্তি।

কয়েক দিন ভোলানাথও আবার অসুস্থ হইয়া পড়িলেন—পেটে বেদনা

জ্বর ইত্যাদি। কুলদা দাদা, মটরী পিসিমা প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন।

কুলদা দাদারও অফিস আছে। দিনে প্রায় সকলেই চলিয়া যাইতেন। রাত্রিতে বাবা, যোগেশ দাদা ও কুলদা দাদা থাকিতেন। কয়েকদিন পর নগেন দত্ত মহাশয় এবং নৃপেন্দ্র ডাক্তার মহাশয়ও রাত্রিতে আসিয়া আশ্রমে থাকিতে লাগিলেন। মার রক্ত বাহ্যি ও রক্ত প্রস্রাব হইতে লাগিল। অনেকদিন অসুখ চলিল। সুস্থ হইবার কথা বলিলে বলিতেন, "তোমরা আসিলেও তাড়াইয়া দেই না। রোগগুলি আসিয়া শরীরে খেলা করিতেছে; তাই বা তাড়াইব কেন? যতদিন খেলা করিবার খেলা করিয়া, আবার নিজেরাই চলিয়া যাইবে"। এই বলিয়া হাসিতেন। রোগেরা শরীরে খুব প্রবল ভাবেই খেলা সুরু করিল! কিছুদিন পর ধীরে ধীরে রোগের অপর লক্ষণগুলি কমিয়া আসিল। জ্বরও কমিল, কিন্তু একেবারে ছাড়িল না।

ইতিমধ্যে আমার সহোদর নন্দুকে একবার আসিবার জন্য লিখিতে বলিলেন। টেলিগ্রাম করা হইল। কলিকাতা হইতে নন্দু আসিল। মা ভাত খাইবেন বলিলেন। ভাত পাক করিয়া দিলাম; যেদিন মা ভাত খাইবেন সেইদিনই নন্দু আসিয়া ঢাকায় পৌছিল। কেন মা আসিতে বলিয়াছিলেন, জানি না। নন্দুকেও মা খুব স্নেহ করিতেন। মাতৃস্নেহ আমরা শ্রীশ্রীমার কাছে খুবই পাইয়াছি। আমি ও নন্দু আমাদের গর্ভধারিণীরও খুব অনুগত ছিলাম। মাকে ছাড়া আমাদের একটু সময়ও চলিত না। পিতা মাতার বিশেষতঃ মাতার সেবাই আমার শিশুকাল হইতে জীবনের লক্ষ্য ছিল। পিতামাতার সেবা করার ক্ষমতা সন্তানের কতটুকুই বা আছে? তবুও যতটুকু ক্ষমতায়

আমার ও 'নন্দুর' বাল্যকালের কথা।

কুলাইত, ঐ ভাব নিয়াই থাকিতাম। দিন রাত মার সঙ্গে সঙ্গেই আমার কাটিত। পূজা, সন্ধ্যা আর বিশেষ কিছু ছিল না। আমার অবস্থা দেখিয়া, গর্ভধারিণীর মৃত্যুর পর অনেকে মনে করিতেন, আমিও আর বাঁচিব না। কিন্তু শ্রীশ্রীমার চরণ দর্শনের সৌভাগ্য আছে, কাজেই কিছুই হইল না।

গর্ভধারিণীর মৃত্যুর এক বছর দেড় বছরের মধ্যেই শাহাবাগে শ্রীশ্রীমার চরণ দর্শন পাইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম। মা একবার আমার গর্ভধারিণীর ফটো দেখিয়া নন্দু ও আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই ছবি দেখিয়া মনে হয়, মা কত কষ্ট করিয়া তোমাদের দুইজনকে আমার জন্যই মানুষ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন"। মার এই স্নেহের কথায় আমরা গলিয়া যাইতাম। কত আনন্দই প্রাণে জাগিত। এই সব কথা লিখিবার প্রধান উদ্দেশ্য, মার স্নেহের স্মৃতি জাগাইয়া রাখা। আমার মনে হয়, এইটুকু স্মৃতিতে মনের ময়লা যতটা কাটে, অনেক পূজা জপাদিতেও তাহা হয় না। তাই এই স্নেহের পবিত্র স্মৃতি আমার নিকট বড়ই মূল্যবান্। মার কথা লিখিতে লিখিতে তাই দুই এক জায়গায় এই সব স্নেহের কথাও দুই একটি লিখিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের মত সন্তানের উপরও শ্রীশ্রীমার কত কৃপা! ইহা মনে করিলেও চোখে জল আসে। পূর্ব্ব জন্মের বহু তপস্যার ফলে শ্রীশ্রীমার চরণ দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, সন্দেহ নাই। আজ আবার নিজেই অসুখের সৃষ্টি করিয়া সন্তানদের একটু সেবা করিবার সুযোগ দিয়াছেন। মার কার্য্য সবই মঙ্গলময়। জ্বরটু এক কমিলেই মা ভাত খাইলেন, পরে জ্বরও নাই, পা ফুলা, ইত্যাদি কিছুই নাই। জ্যোতিষ দাদা কবিরাজ আনিয়া

আমার প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ স্নেহ-মাখা করুণা।

ঔষধের লিষ্ট আনিলেন। মা পরদিন ভোরেই বলিলেন, "আমি ভাত খাইব"। ২।৩ দিন ভাত খাওয়ায় মা ভালই আছেন।

বৈকালে প্রায় পাঁচটায় হাত মুট করিয়া উঁচু করিয়া আছেন দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "হাতে কি?" মা চোখ বুজিয়াই বলিতেছেন "ম্যালেরিয়া জ্বর দিয়া গেল"। অর্থাৎ রোগের মূর্ত্তিটা এই হাতে স্পর্শ করিল, মা গ্রহণ করিলেন। তখন আমি চমকিত ভাবে বলিলাম, "জ্বর নাকি?" দেখিলাম জ্বর হইয়াছে। তখন হইতে জ্বরও চলিল। জ্বর যেদিন থাকিত না মধ্যে মধ্যে ভাতও খাইতেন। জ্বর সারিয়া যাওয়ার পরে কয়েকদিন ভাত রুটি ইত্যাদি খাইয়াছেন। সর্ব্বদা ত ভাত খাওয়া ছিল না।

এদিকে রমণা আশ্রমে আর একটী ঘর উঠিয়াছে। ৺কালীমূর্ত্তিটী সিদ্ধেশ্বরী বাড়ীতেই আছেন। যোগেশ দাদাদেরই গ্রামের একটি ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছেন, বিবাহাদি করেন নাই, সংসারে বিরক্তিভাব আসায় যোগেশ দাদার খোঁজে আসিয়া ৺সিদ্ধেশ্বরীতে উপস্থিত হইলেন।

অতুল ব্রহ্মচারীর সিদ্ধেশ্বরীতে প্রথম মাতৃ-দর্শন।

তাঁহার নাম অতুল। তিনিই তখন ৺কালীর ভোগ রান্না করিয়া দিতেছেন, এবং পরে ৺কালীকে নিবেদন করিয়া দেন। যোগেশদাদা, আমি ও অতুল সেই প্রসাদই পাই। অপরাপর সকলে ৺অশ্বিনীবাবুর বাসাতেই খাওয়া দাওয়া করেন। পিসিমা ও দিদিমা তথায় রান্না করেন। এইভাবে চলিতেছে।

৺কালীমূর্ত্তিটি রমণা আশ্রমে নেওয়া হইবে। শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার পূর্ব্বে তথায় নেওয়ার কথা হইতেছে। নগেনবাবু ও ভূপতিবাবু আশ্রমের জন্য খুব পরিশ্রম করিতেছেন। জ্যোতিষ দাদার উপরই আশ্রমের বন্দোবস্ত করিবার সব ভার। ৺কালীমন্দির নির্ম্মাণ করিবার কথায়

মা বলিলেন, "ঐ স্থানে যে ভাঙ্গা শিবমন্দিরটি আছে ও একটী ভাঙ্গা শিব আছে, ঠিক সেইস্থানেই কালীর একটী ছোট মন্দির উঠিবে এবং যেখানে শিবটি বসান আছে সেই স্থানেই কালীমূর্ত্তি বসাইতে হইবে"। শ্রীযুক্ত নগেন রায় মহাশয়ই এই মন্দিরটি করিয়া দিলেন। ভূপতিবাবু, নগেনবাবু প্রভৃতি সকলে মিলিয়া রমণা আশ্রমে মার খাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

রমণা-আশ্রমে ৺কালীমূর্ত্তির জন্য শ্রীশ্রীমায়ের স্থান-নির্দ্দেশ।

৺কাশী হইতে মার অসুখের খবর পাইয়া নির্ম্মলবাবুও আসিয়াছেন। তিনিও মার কাছে ৺সিদ্ধেশ্বরীতেই থাকেন। আশ্রমের ৺কালীমন্দিরটি একটি আলমারির নমুনায় তৈয়ার হইল। ৺কালীমূর্ত্তিটি সিদ্ধেশ্বরীতে একটি কাঠের বড় আলমারীতেই আছেন, পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে। আশ্রমে যজ্ঞের আগুন রাখিবার জন্য কুণ্ডও করা হইয়াছে। মার সঙ্গে সঙ্গেই ৺কালীমূর্ত্তি এবং যজ্ঞের আগুনও যাইবে, এইরূপ মার আদেশ। জ্যোতিষ দাদাও এখন আসিতেছেন। মার কাছে আসা যাওয়া করিবার মত লোক সিদ্ধেশ্বরীতে কেহই বড় ছিলেন না। কিন্তু মার এই অসুখের মধ্যে সেখানকার অনেকেই মার কাছে আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাজমোহনবাবুর স্ত্রী আসিয়া দুপুর বেলা অনেক সময় মার কাছে থাকিতেন, এবং যতটুকু পারিতেন, মার সেবা করিতেন। বাড়ীতে ছেলেদের অসুখ ফেলিয়াও তিনি মার কাছে আসিয়া বহুক্ষণ কাটাইয়া গিয়াছেন। অপরাপর অনেকেই কেহ আচার, কেহ পুরাণ আমসত্ত্ব, কেহ পুরাণ তেঁতুল মার সেবার জন্য নিয়া আসিতেন। মা সে সব গ্রহণ করিলে; তাঁহারা খুবই আনন্দ লাভ করিতেন।

অসুস্থা মায়ের নিকট বহু ভক্ত সমাগম।

একদিন শ্রীযুক্ত রাজমোহন গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহিত অসুস্থ অবস্থাতেই

মার কথা হইতেছিল। মা নিজের অবস্থার কথা বলিতেছিলেন, "দেখ, বাবা, এবার চাঁদপুরে একদিন পেটের খুব অসুখ হইল; এমন অসুখ যে পায়খানা হইতে আর ঘরে আসিতে পারি না। ৫০।৬০ বার পায়খানা যাইতেছি, তাহাতেও মহা আনন্দ; যেন এই এক মহাকীর্ত্তন চলিয়াছে। সারাদিন এই ভাবে বেশ এক আনন্দ চলিল। রাত্রিতে স্বাভাবিক ভাবে সবই খাইলাম, আর কিছুই হইল না"।

শ্রী[illegible] মা সুস্থতা ও অ[illegible]তার উপরে।

রাজমোহন গাঙ্গুলী মহাশয় অতি পণ্ডিত লোক। তিনি বুঝিলেন, এই ত সেই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ। তিনি মহা আগ্রহ ও আনন্দের সহিত মার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা এই অবস্থা কি তোমার সব সময়ই থাকে?" মা একটু হাসিলেন; আর কোন জবাব দিলেন না।

———

দশম অধ্যায়

১৩৩৬ সনের আশ্বিন মাসে ৺মহালয়ার দিন সন্ধ্যার সময় মা ও ভোলানাথ রমণার আশ্রমে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ৺কালীমূর্ত্তিটি ও যজ্ঞাগ্নি ঐ আশ্রমে নেওয়া হইল। এইবার লইয়া এখন পঞ্চমবারে ৺কালীমূর্ত্তিটি স্থানান্তরিত হইল। এইবার গিয়া ৺কালী স্থির হইলেন। মা বলিলেন, "এখন যাহা হইবার ওখানেই হইবে"। আশ্রমে গিয়া উত্তরে যে ঘরটি উঠিয়াছে, তাহার দুইধারে দুইখানা খাটে মাকে ও ভোলানাথকে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। মার জন্য যে ছোট কুটীরটি পূর্ব্বে তৈয়ার হইয়াছিল, তাহার ভিতর পূর্ব্বেকার ভাঙ্গা ৺শিবটি রাখা হইয়াছে। নূতন মন্দিরে মার নির্দ্দেশ মত ৺কালীমূর্ত্তিটি স্থাপিত করা হইল। মা এখনও দাঁড়াইতে পারেন না, বড় কাহিল; তবে অসুখ এখন বিশেষ কিছুই নাই, ধীরে ধীরে সুস্থ হইতেছেন। ভোলানাথ খুবই অসুস্থ। কিছুদিন পর্য্যন্ত তিনি ঔষধ পত্র ব্যবহার করেন নাই। এখন নিয়ম মত চিকিৎসা হইতে লাগিল। কয়েকদিন পরে মা পূর্ব্বের সেই ছোট কুটীরটিতেই মার বিছানা নিয়া যাইতে বলিলেন, এবং সেই কুটীরেই মা থাকিতেন।

শ্রীশ্রীমায়ের "রমণা" আশ্রমে প্রথম আগমন ও অবস্থান। ১৩৩৬ (আশ্বিন—৺মহালয়ার দিন)।

৺দুর্গাপূজার সময় সেবারে ভক্তেরা ঐ পূজার কয়দিন আশ্রমে বিশেষ পূজা হইবার কিছুই ব্যবস্থা করেন নাই। ৺মহাসপ্তমী পূজার দিন ভোরে উঠিয়া মা বলিতেছেন, "আজ তাড়াতাড়ি ভোগ করিয়া দেওয়া দরকার"। কুলদা দাদাকে এই তিনদিন বিশেষভাবে ৺কালী-

পূজাদি করিবার কথা বলিয়া দিলেন। তখন সকলেই যাহা ঘরে আছে, তাহা দিয়াই পূজাদির বন্দোবস্ত করিলেন। পূজাদি হইয়া গেল। বলির কথা ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করায়, মা বলিলেন, "এই স্থানে কখনও যেন বলি না হয়"। তিন দিনই ষোড়শোপচারে ৺কালীমূর্ত্তির পূজা হইল। সেই হইতেই ৺দুর্গাপূজার সময় সেইভাবেই পূজাদি হয়।

৺দুর্গাপূজার সময় রমণা আশ্রমের ৺কালীমূর্ত্তিটিকে বিশেষ পূজার ব্যবস্থার সূত্রপাত।

এই সময় পূজার বন্ধে বিনয়বাবু (মুন্সেফ) ঢাকায় সপরিবারে আসিয়াছিলেন। তাঁর "উমা" নামে একটি মেয়ে ছিল। উমার ঐ সময় অসুখ হয়। রোজই তাঁহারা এই মেয়ে নিয়াই আশ্রমে যাইতেন। একদিন মা বলিলেন—"ওকে নিয়া কয়েকদিন আশ্রমে আসিও না।" তাঁহারা মনে করিলেন, মা অসুখের জন্য অসুবিধা হইবে বলিয়াই নিষেধ করিতেছেন। মার কাছে যাইবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁহারা এই নিষেধ বাক্য শুনিলেন না। কয়েকদিন পরেই মেয়েটি মারা গেল। তখন মা বলিলেন, "আমি নিষেধ করিয়াছিলাম"। সেই মেয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে ঢাকা রমণা আশ্রমে কীর্ত্তনের ঘর বিনয়বাবুই পরে করিয়া দিয়াছেন। এই ঘরের নামটি "নাম ঘর" করা হইয়াছে। আর ভাঙ্গা মন্দিরে যে মা দুধ কলা দেওয়াইতেন, এখনও প্রতিদিন পূজার সময় ৺মনসা দেবীর দুধ-কলা দেওয়ার ব্যবস্থা তিনিই করিয়া দিয়াছেন। এই রমণার আশ্রমে খুব বড় বড় সাপ ছিল। ভোলানাথও ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। মাও সুস্থ হইয়াছেন। ইতিমধ্যে অমূল্যের এক ভাগিনেয়ীর বিবাহ উপলক্ষে ভোলানাথ গ্রামে গেলেন। কিন্তু মা, এক বছরের

বিনয়বাবুর কন্যা "উমা"র মৃত্যু ; এবং তাহার স্মৃত্যর্থে আশ্রমে "নাম-ঘর" নির্ম্মাণ।

মধ্যে ঢাকা ছাড়িয়া কোথায়ও যাইবেন না বলায়, ভোলানাথ আর মাকে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন না।

প্রায়ই নূতন নূতন লোক মাতৃদর্শনে আসিতেছে। একদিন ভাওয়ালের মধ্যম কুমার (সন্ন্যাসী) মাকে দর্শন করিতে আসিলেন। প্রার্থনা করিয়া গেলেন—"আমি যেন রাজ্য পাইতে পারি।"

ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মাতৃ-সমীপে আগমন।

একবার মার কি খেয়াল হইল, প্রায় ১৫ দিন পর্য্যন্ত নিজের বিছানা-টুকুতেই দিনরাত কখনও বসিয়া, কখনও শুইয়া আছেন। খাইতেও বড় উঠিতেন না; পায়খানায় যাইতে হইলে উঠিতেন, কিন্তু আবার আসিয়া বিছানায়ই বসিয়া থাকিতেন। তারপর হইতে জ্যোতিষ দাদা প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে বাসা হইতে আশ্রমে আসিয়া মাকে উঠাইয়া মাঠে হাঁটিতে নিয়া যাইতেন। এই হাঁটা আরম্ভ হওয়ার পর, আবার এমন হইল, যে প্রতিদিনই প্রায় সমস্ত মাঠ ঘুরিতেন। কোন কোন দিন আরও দূরে যাইতেন; প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা এইভাবে হাঁটিতেন, কখনও কখনও কোথাও গিয়া একটু বসিতেন।

শ্রীশ্রীমায়ের শোওয়া, বসা বা চলা সবই খেয়াল মত।

একদিন মা রাত্রিতে যে শুইলেন, আর পরদিন উঠিতেছেন না। এইভাবে প্রায় ২।৩ দিন পড়িয়াই আছেন। পরে ভোলানাথ সকলকে নিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন; বহুক্ষণ কীর্ত্তন করার পর মার অবস্থা একটু পরিবর্ত্তন দেখা গেল। রাত্রিতে কীর্ত্তন হইল। পরের দিন দুপুর-বেলা মা উঠিয়া বসিলেন। অনেক সময় মা বলিয়া রাখিতেন, "যদি আমি পড়িয়া থাকি, কেহ ছুঁইও না, দরজা বন্ধ করিয়া রাখিও। তোমরা বসিয়া নিজেদের

দুই তিন দিবসব্যাপী শ্রীশ্রীমায়ের শয়ন, নাম-কীর্ত্তন দ্বারা ভঙ্গ ও ভাবের পরিবর্ত্তন।

ইষ্টনাম জপ করিও"। অনেক সময় তাহাই করা হইত। আবার কখনও কখনও উঠাইবার চেষ্টা করা হইত।

একবার শাহাবাগে মার ভাব হইয়াছে; পড়িয়া আছেন। অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে, সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। আমি ও বাবা মাকে ঐভাবে ফেলিয়া যাইতেছি না। কিছুক্ষণ পর মার ভয়ানক শ্বাস চলিতে লাগিল। শরীরও নানা রকম হইতে লাগিল। অবস্থা দেখিলেই ভয় হইত বুঝি বা এখনই দেহ ছাড়িয়া দিবেন। কি করিব, কেহই কিছু বুঝিতেছি না। অনেকক্ষণ পর অতি অস্পষ্ট ভাষায় মা বলিতেছেন, "নাম, পাঁচ জন"। আমরা বুঝিলাম, পাঁচ জনকে নাম করিতে বলিতেছেন। তখন ভোলানাথ, বাবা, আমি, অমূল্য ও মটরী পিসিমা নাম করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পর মা একটু স্থির হইলেন। এইরূপ কত ভাবের খেলা গিয়াছে লেখা অসম্ভব।

শ্রীশ্রীমায়ের ভাবাবস্থায় ভক্তবৃন্দের প্রতি কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ।

আবার একদিন রমণা আশ্রমেই মা রাত্রিতে শুইলেন। পরদিন সারাদিন ঐ অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। সন্ধ্যাবেলায় উঠিয়া বসিলেন। হাসিয়া বলিতেছেন, "আমার ভোর এতক্ষণে হইল"। এই বলিয়া চোখ মুখ ধুইতে চলিলেন। সেইদিন শনিবার ছিল, উদয়াস্ত নাম রক্ষা হইয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া সেদিন আমাদের খাওয়া-দাওয়া হয় নাই। সন্ধ্যাবেলা মা বলিতেছেন:—"আজ যখন ঘটনাচক্রে আশ্রমে কাহারও খাওয়া হয় নাই, আজ হইতে শনিবার দিন, দিনের বেলায় নাম কীর্ত্তন হইবে, সকলেই ফলমূল খাইয়া থাকিবে, সন্ধ্যার পর কীর্ত্তন শেষ হইলে, একসিদ্ধ ভাত পাক হইবে, সকলে

রমণা আশ্রমের ভক্তগণকে "শনিবার পালনের" আদেশ।

তাহাই প্রসাদ পাইবে।” মা শনিবার দিন সারাদিন কিছুই খাইতেন না। সন্ধ্যার পর দুধ ফল যাহা হয় খাইতেন। এই নিয়ম বহুদিন চলিয়াছিল। আমাকেও মা শনিবার দিন সন্ধ্যার পর, ফল দুধই খাইতে আদেশ করিলেন। পরে অন্যান্য অনেকেই এই নিয়মে সন্ধ্যার পর একসিদ্ধ ভাত খাইতে আরম্ভ করিলেন। মা বলিতেন—“অন্ততঃ সপ্তাহে একটা দিন শুদ্ধভাবে থাকা ও খাওয়ার সঙ্কল্প করা দরকার। পরে ধীরে ধীরে বাড়াইয়া যাইবে”।

এখন আর শাহাবাগের মত সব সময় মা পড়িয়া থাকেন না। মার সঙ্গে এই কথা হওয়ায়, মা বলিতেন, “দেখ এখন শুইয়া থাকা বা হাঁটা, চলা, কথা বলা, সবই যেন একই অবস্থা বলিয়া মনে হয়; কোন পার্থক্য নাই। সব সময়ই যেন একই অবস্থায় আছি”। একদিন হয়ত খেয়াল হইল, রান্না করিয়া আসিলেন। তাও বলিতেন, “এই যে রান্না করিয়া আসিলাম, এও যা—ঐ যে শুইয়া থাকা, তাও তাই; ভাবের কোনই পরিবর্ত্তন হয় না। মনে হয়, একই অবস্থায় আছি। তোমরা অবশ্য দেখিতেছ, শরীরের এক এক রকম ক্রিয়া হইতেছে, কিন্তু আমার পার্থক্যবোধ মোটেই হয় না”। এক এক সময় বেশ সকলের প্রতিই একটা যেন স্নেহের ভাব প্রকাশ পাইতেছে। আবার এক সময় দেখিতেছি, কাহাকেও যেন চিনেন না; আমরা দিনরাত কাছে কাছে আছি, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। কোনরূপ স্নেহেরই সাড়া পাওয়া যাইত না। কত কাঁদিতাম, কিন্তু যেন অরণ্যে রোদন করিতেছি। এই অবস্থায় জ্যোতিষ দাদাও মধ্যে মধ্যে দুপুর বেলা অফিস হইতে আসিয়া এইভাব দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু মার একই অবস্থা। অথচ সকলের সহিত কথা বলিতেছেন, আনন্দ করিতেছেন; কিন্তু লক্ষ্য

শ্রীশ্রীমায়ের ভাবাবস্থার কথা।

করিলেই বুঝা যাইত, ভাবের কি পরিবর্ত্তন! আমরা এ ভাবটা যেন সহ্যই করিতে পারিতাম না। কিন্তু উপায় কিছু ছিল না। কি এক অবস্থায় যে মা বসিয়া আছেন, আমাদের ধারণারও অতীত। আমরা স্নেহ-প্রীতিটুকুই বুঝি, তাই ব্যথা পাই। শরীর দিয়া যাহাই প্রকাশ হউক, বাস্তবিক পক্ষে যে কিছুতেই আসক্ত নন, জাগতিক কিছুই যে তাঁহাকে বাঁধিতে পারে নাই, এই ভাবটা এত সুস্পষ্টভাবে মার বাহ্যিক ব্যবহারেও মধ্যে মধ্যে ফুটিয়া উঠিত যে আমরা সাধারণ জীব তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ছট্‌ফট্ করিতাম।

অনেক সময় কথাচ্ছলে মা পরিষ্কারভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন, "যাহা দেখ, সবই শরীরের খেলা মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে কাহারও সহিত আমার এতটুকুও সম্বন্ধ বা বন্ধন নাই"। একদিন দিদিমাকে হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন, "দেখ, যদি তোমার উপর সম্পর্কের খাতিরে অপর সকল হইতে একটুও ভিন্ন ভাব জাগিত, তবে বহুদিন পূর্ব্বেই তোমাদের সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতাম। শরীরের আত্মীয় কিংবা অনাত্মীয় সকলের উপরই এক ভাব। কোনই পার্থক্য বুঝি না বলিয়াই সকলকে নিয়াই আছি। কাহাকে ত্যাগ করিব, কাহাকে ধরিব ? সবই যে আমার কাছে সমান"।

শ্রীশ্রীমা সমদর্শিনী।

একদিন ৺পুরীধামে একটি স্ত্রীলোক মাকে বলিতেছিলেন, "মা, স্বামীর উপর আপনারও কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে, গুরু-জ্ঞান আছে, স্বামী এবং অপর সকলেই কি আপনার কাছে সমান?" ভোলানাথ নিকটেই বসিয়াছিলেন। মা হাসিয়া বলিতেছেন, "এই কথার যদি সত্য জবাব দেই, তবে ত ভোলানাথ আমার উপর রাগ করিবে"। এই বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পরে বলিতেছেন, "সব সমান তবে

৺পুরীধামে শ্রীশ্রীমায়ের অনুরূপ উক্তি।

যেখানে যেই ভাব প্রকাশের দরকার, সেইরূপই হইয়া যাইতেছে মাত্র। প্রথম শিশুকালে পিতামাতাই গুরু ছিলেন। তারপর তাঁহারা স্বামীকে গুরু বলিয়া চিনাইয়া দিলেন। তখন স্বামীর প্রতি তীব্র গুরুভাব ছিল। আজ দেখিতেছি, বিশ্বময়ই গুরু; তোমরাও আমার গুরু। সবই যে তাঁরই রূপ, এক ভিন্ন ত দুই নাই"। মার মুখে এই কথা শুনিয়া সেই স্ত্রীলোকটি মুগ্ধ হইয়া গেলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে চুপ করিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, মার ভাব ধারণা করাও যে আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

মা রমণার আশ্রমেই আছেন। ভোরে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া আসেন। তারপর আসিয়া হয়ত কোন দিন একটু ফল খাইলেন, না হয় পড়িয়া রহিলেন। কোন দিন খাওয়ার সময় উঠিয়া হয়ত কিছু খাইলেন, আবার কোন দিন হয়ত শুইয়াই আছেন; প্রসাদ না পাইলে, কেহ কিছু খাইবে না, তাই বলিতেছেন—"একটু কিছু আনিয়া আমার মুখে দিয়া নিয়া যাও"। তাই করিলাম। মা হয়ত পড়িয়াই রহিলেন, কোন দিন বৈকালে উঠিলেন, কোন দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে উঠিলেন। কোন দিন হয়ত বসিয়াই আছেন; কিন্তু কিছু খাইতে চাহিলেন না। "যখন খাওয়ার ভাব হইবে, খাইব" বলিয়া দিতেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, এই সময় খাইতে হইবে, কি এই সময় শুইতে হইবে, এমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে মা বড় থাকিতে পারেন না। সময়ের পরিবর্ত্তনে ভাবের কোন পরিবর্ত্তন দেখা যাইত না। তাই সন্ধ্যার সময় উঠিয়াই বলিতেছেন—"আমার এখন ভোর হইল" বলিয়া হাত মুখ ধুইতে যাইতেন। তখনই হয়ত খাইলেন।

রমণা আশ্রমে শ্রীশ্রী-মায়ের দৈনিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

রান্না খুব পরিস্কার মতই হইত। মটরী পিসিমাই নিরামিষ রান্না করিতেন; দিদিমা কিংবা আমি সাধারণতঃ মাছ পাক করিতাম।

প্রথম প্রথম শাহাবাগে রান্নার জলও ব্রাহ্মণের তুলিতে হইত। এখন অন্য সকলে জল তুলিয়া থাকে। মা জাতিভেদ সম্বন্ধে বলিতেন—

জাতিভেদ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমায়ের মনোভাব।

"সকলেরই শুদ্ধ ভাবেই খাওয়া ভাল। সকল জাতির হাতে খাওয়া ঠিক নয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জাতিজ্ঞান আছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত জাতিভেদ মানিয়া চলাই ভাল। পরে যদি সাধনার প্রভাবে এ সব চলিয়া যায়, তখন যাহা হইবার হইবে।" আশ্রমে সব সময়ই প্রায় ভক্ত ব্রাহ্মণী স্ত্রীলোকেরাই পাক করিতেন। পরে যখন উৎসব উপলক্ষে মহোৎসবাদি আরম্ভ হইল, তখন পাচক ঠাকুর আনা হইত। ব্রাহ্মণ দ্বারাই পরিবেশন ইত্যাদি করা হইত। মার ইচ্ছাতেই এইভাবে চলিত। ভোলানাথেরও এই বিষয়ে খুব লক্ষ্য ছিল। অবশ্য, মার সকলের হাতে খাইতে কিছুই আপত্তি ছিল না। কিন্তু সকলের মঙ্গলের জন্যই মা এই নিয়ম পালন করিয়া চলিতেন। ভোলানাথও জাতিভেদ না মানিয়া চলা পছন্দ করিতেন না।

অসুখের পর কয়েকমাস কাটিয়া গেল। সম্ভবতঃ, ফাল্গুন মাস হইতে মা ভোলানাথকে সিদ্ধেশ্বরী আশ্রম ঘরে বসিতে বলিলেন। ভোলানাথ সেই ঘরে বসিয়াই সাধন ভজন করিতেন। একটি ব্রহ্মচারী রমণার আশ্রম হইতে ভোগের প্রসাদ তাঁহাকে দিয়া আসিত এবং

সিদ্ধেশ্বরীতে ভোলানাথের সাধনা এবং তাঁহার দীক্ষাদানের সূত্রপাত। (১৩৩৬ ফাল্গুন)।

তাঁহার অন্যান্য যাহা দরকার, করিয়া দিয়া আসিত। তিনি সিদ্ধেশ্বরীতেই থাকিতেন। রাত্রিতে রমণা আশ্রম হইতে একটি ব্রহ্মচারী তাঁহার কাছে গিয়া শুইয়া থাকিত। সাধারণতঃ অতুলই তাঁহার কাছে থাকিত। মধ্যে মধ্যে মা গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেন। প্রায় দুই মাস এইভাবে থাকিলেন।

মধ্যে মধ্যে তাঁহার সেখানেই আবিষ্ট ভাব হইত; ভাবে গড়াগড়ি দিতেন। এক এক দিন দুপুর বেলা রমণা আশ্রমে আসিতেন। তখন তাঁর অনেক রকম শারীরিক ক্রিয়া হইত। ব্রহ্মচারীদের দীক্ষা দিলেন। এবং এই অবস্থায় অন্যান্য ২।৪ জনকে দীক্ষা দিতে লাগিলেন।

একাদশ অধ্যায়

১৩৩৭ সনের ১লা বৈশাখ ভোলানাথ আশ্রমে আসিয়া নিজেই ৺কালীপূজা করিলেন। সেই হইতে আবার আশ্রমেই থাকিতেন। তখন ৺কালীর ছোট মন্দিরটির চারিদিকে সাময়িকভাবে চালা উঠাইয়া পূজার কার্য্যাদি চলিতেছিল। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই পূজাদি করিয়া ভোলানাথ আশ্রমের পঞ্চবটীর পাঁচটি গাছ (বট, অশ্বত্থ, অশোক, বেল ও আমলকি— এই পাঁচটি গাছ) নিজেই রোপণ করিলেন। এই গাছ স্থাপন করিবার সময়ও ভোলানাথের অনেক রকম শারীরিক ক্রিয়া হইয়াছিল। প্রত্যেক গাছ স্থাপন করিবার বীজমন্ত্র তিনি পাইয়াছিলেন। সেইদিন "পঞ্চবটী" স্থাপন করিবার সময়, এমন ভাবে মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছিলেন, যে তাঁর সমস্ত শরীর ধূলায় মাখামাখি হইয়া গিয়াছিল। মা নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন। মার দিকে চাহিয়া, অনুমতি নিয়া, প্রত্যেক গাছ স্থাপন করিলেন। এই ভাবে "পঞ্চবটী" হইল। পরে, মধ্য স্থানটি মার বসিবার জন্য বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই পঞ্চবটীর সম্বন্ধে এক বিশেষ ঘটনা এই স্থানে লিখিতেছি।

রমণা আশ্রমে ভোলানাথের ৺কালী পূজা ও পঞ্চবটী স্থাপন (১৩৩৭, বৈশাখ)।

অশোক গাছটি যখন রোপণ করা হয়, তখন দেখা গেল, গোড়ায় মোটেই মাটি নাই। ইহা দেখিয়া একজন বলিলেন, "এটি হয়ত বাঁচিবে না"। ভোলানাথ খুব জোরের সহিত বলিলেন, "কি বাঁচিবে না? ইহা কখনও মরিতে পারে না"। এই বলিয়া তিনি সে

পঞ্চবটী সম্বন্ধে একটি বিশেষ ঘটনা।

বীজ পাইয়াছিলেন, সেই বীজমন্ত্র দ্বারাই এই গাছটিও পুঁতিয়া রাখিলেন। সর্ব্বদা জল দিবার বন্দোবস্ত করা হইল। কিছুদিন পরে দেখা গেল, অশোক গাছটি যেন মরিয়াই গিয়াছে। শুষ্ক গাছ থাকিয়া কি হইবে ভাবিয়া; কমলাকান্ত তাহা উঠাইয়া নিকটেই ফেলিয়া দিল। ভোলানাথ তখন সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে থাকেন। সেখান হইতে একদিন আসিয়া উহা দেখিয়া ভয়ানক চটিয়া গেলেন। তিনি আবার শুষ্ক ডালখানিই কুড়াইয়া নিয়া পুঁতিয়া রাখিলেন এবং জল দিবার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি বলিলেন, "এই গাছ মরিতেই পারে না"। মা একদিন বলিলেন, "এক কাজ কর। আর একটি অশোকের ডাল আনিয়া এই শুক্‌না ডালটির সঙ্গে একত্র করিয়া পুঁতিয়া রাখ"। ভোলানাথ তাহাই করিলেন। কিছুদিন পরে দেখা গেল, শুক্‌না ডালে পাতা গজাইতেছে। আশ্চর্য্য বোধ হইল; ভোলানাথেরও মহা আনন্দ। ক্রমে ক্রমে সেই গাছটি বাঁচিয়া উঠিল।

১৩৩৭ সনে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব।

১৩৩৭ সনের শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব আসিয়া পড়িল। জন্মোৎসবের কয়েকদিন পূর্ব্বে মা হঠাৎ কথা বন্ধ করিলেন। পাঁচ সাত দিন কথা একেবারেই বন্ধ ছিল। তারপরও অনেক দিন পর্য্যন্ত মার স্বর বড়ই অস্পষ্ট ও মৃদু ছিল। কেহই প্রায় কথা বুঝিতে পারিত না। উৎসবের মধ্যেও এই ভাব চলিয়াছিল। উৎসব আরম্ভ হইল। এবার ভক্তেরা জন্মোৎসবের মধ্যে "মহোৎসব" দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভক্তেরা নানা স্থান হইতে চাল, ডাল ইত্যাদি ভিক্ষা করিয়া আনিয়া ভাণ্ডারে জমা করিতেছেন। ১৯শে বৈশাখ হইতে কৃষ্ণাচতুর্থী পর্য্যন্ত কীর্ত্তন রক্ষার ব্যবস্থা হইল। জন্মোৎসব আরম্ভ হইল। বহু লোক হইতেছে। আশ্রমের ভিতর জায়গা না হওয়ায়, মা গিয়া মধ্যে মধ্যে

মাঠে বসিতেছেন। মা যেখানে যাইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে লোক তথায় জমা হইতেছে। মা ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিতেছেন না।

উক্ত উৎসবের মধ্যে একদিন সন্ধ্যার সময় আমি মাঠে গিয়াছি, তখন লোকজন বড় বেশী নাই। মা আশ্রমের ভিতরেই নিজের কুটীরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। আমি আশ্রমের ভিতর যাইতেছি। তখন অল্প অল্প জ্যোৎস্না ছিল। প্রথমে দেখিতে পাই নাই, পরে দেখিলাম, আশ্রমের দরজার নিকটে ঠিক আমার পায়ের কাছেই একটি প্রকাণ্ড সাপ। আমি এদিক ওদিক যাইতে পারিতেছি না, এই অবস্থা। কি করিয়া জানি না, এত বড় সাপ, পায়ের সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছে। আমি হঠাৎ একটু সরিয়া পড়িলাম। সাপটিও আশ্রমের ফটকের নিকটে কুণ্ডলী পাকাইয়া বসিল। জটু প্রভৃতি কয়েকটি ছেলে কিছু দূরে কথা বলিতেছিল। আমি ডাকিতেই দৌড়িয়া আসিয়া দেখিল, সাপটি ওইখানেই বসিয়া আছে। আমি গিয়া মাকে এই খবর দিলাম। মা অমনি হাসিয়া হাততালি দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "কালই আমি এটিকে দেখিয়াছি"। এই বলিয়া সাপটিকে দেখিতে গেলেন। ভোলানাথ এবং অপর সকলেও গেলেন। মা কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে সাপটিকে দেখিলেন। সাপটি তখন মুখ বাড়াইয়া এদিক ওদিক দেখিতেছিল। হঠাৎ মা চলিয়া আসিলেন। পরে এ কথায় মা বলিয়াছিলেন, "আমার ইচ্ছা হইতেছিল, সাপটিকে গিয়া জড়াইয়া ধরি। কিন্তু কাছে গেলেই তোমরা বাধা দিবে, এইজন্য চলিয়া আসিলাম"। জটু বলিল, "মা সাপটিকে মারিয়া ফেলি?" মা নিজের গলায় হাত দিয়া ইসারায় যাহা দেখাইলেন, তাহাতে আমরা বুঝিলাম, নিষেধ করিতেছেন। এর

১৩৩৭ সালের জন্মোৎসব কালীন রমণা আশ্রমে সর্পদর্শনে শ্রীশ্রীমায়ের উক্তি।

বড় সাপ দরজার কাছে; কত লোক দিন রাত্রি আসিতেছে, যাইতেছে; কিন্তু সাপটিকে কিছুই করা হইল না। পরে সাপটি আশ্রমের ভিতরে আসিয়া প্রাচীরের পাশে চলিয়া গেল। আর কেহ কিছু বলিল না। সাপের সঙ্গে মার যে কি সম্বন্ধ, মা-ই জানেন।

আর একদিন সিদ্ধেশ্বরী ৺কালীমন্দিরের ছোট কুঠুরীতে মা প্রায় সারাদিনই শুইয়াছিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাহিরে আসিয়া বসিয়াছেন। কাপড় নাড়াচাড়া করিতেই কোলের ভিতরের কাপড় হইতে একটি সাপ বাহির হইয়া চলিয়া গেল। অথচ অন্ধকার ঘরে মা এতক্ষণ মাটিতে ঐ ভাবেই পড়িয়াছিলেন।

সিদ্ধেশ্বরীর সাপের কথা।

১৩৩৭ সনের উৎসব চলিতেছে। মহোৎসবের দিন সকলে খাইতে বসিয়াছেন। মা আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। পরে মাটিতে লুটাইয়া, সকলের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন। বলিলেন "নারায়ণ প্রণাম করিলাম"। মহা আনন্দে সকলে মিলিয়া উৎসব শেষ করিলেন। জন্ম-তিথির সময় পঞ্চবটীর বেদীর উপরে নিয়া মাকে রাত্রে বসান হইল। মা শুইয়া পড়িলেন। ভোলানাথ তথায় বসিয়া মার পূজা করিলেন। পূজা করিতে করিতে ভোর হইয়া গেল। অনেক বেলায় মা উঠিলেন। ভক্তেরা সেইদিন সেই বেদীর উপরই মাকে স্নান করাইয়া দিলেন। এই ভাবে উৎসব শেষ হইল।

১৩৩৭ সনে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথির দিন পঞ্চবটীর বেদীর উপর ভোলানাথের শ্রীশ্রীমাকে পূজা।

কিছুদিন পরেই মা'র দাক্ষিণাত্যের যাইবার কথা হইল। উৎসবের কয়েকদিন পরেই মা একদিন শুইয়া আছেন। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন:—"ঘরে ঘরে আতঙ্ক কান্না দেখিতেছি।" এই ঘটনায়

কিছুদিন পর হইতেই ঢাকায় হিন্দু-মুসলমানের ভয়ঙ্কর গোলমাল আরম্ভ হইল। ঘরে ঘরেই কান্না আরম্ভ হইল। মেয়েলোক ত দূরের কথা, পুরুষই ঘরের বাহির হইতে পারিতেছিল না। আশ্রমে কয়েকদিন কেহই যাইতে পারেন নাই। মা বলিলেন, "দেখ, তোমাদের উৎসবের পূর্ব্বে এই অবস্থা হইলে কি মুস্কিল হইত? মেয়েরা দিন রাত আসা যাওয়া করিয়াছে, এ সব কিছুই পারিত না"। ধীরে ধীরে বিবাদ কিছু কমিয়া আসিল।

ঢাকায় হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের পূর্ব্বাভাস।

এই সময়েই প্রফুল্লবাবু মাকে জয়দেবপুরে নিলেন। তিনি তখন জয়দেবপুরে ভাওয়াল রাজ এষ্টেটে সহকারী ম্যানেজার হইয়া আসিয়াছেন। খুব ধুমধাম করিয়া মাকে ষ্টেশন হইতে নিতে আসিয়াছেন। মা ট্রেণ হইতে নামিতেই একদল মেয়েরা আসিয়া মার গলায় মালা পরাইয়া দিল। কীর্ত্তনের দলও আসিয়াছে; মা একটু ভাবস্থ হইয়া পড়িলেন। আমার শরীরের উপর ভর দিয়া মা ধীরে ধীরে চলিলেন। মাকে গাড়ীতে উঠাইয়া নেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে বহুলোক চলিল। রাজ-বাড়ীর মন্দিরে মাকে নিয়া যাওয়া হইল। মার ফটো তোলা হইতেছে। মা ভাবস্থ অবস্থাতেই আছেন; এই ভাবেই প্রফুল্লবাবুর বাসায় যাওয়া হইল। প্রফুল্লবাবুর স্ত্রীও আমাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। সেই বাসায় খুব কীর্ত্তন হইল। মার ভাবও খুব হইল। মা পড়িয়া আছেন। অনেক রাত্রিতে ভূমিকম্প হইল। মাকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে নিয়া যাওয়া হইল। পর-দিন মা মেয়েদের নিয়া একটি ৺শিবমন্দির দেখিতে গেলেন। জয়দেব-পুরের অনেকেই মাকে নিয়া খুবই আনন্দ করিলেন। দুই দিন তথায় থাকিয়া মা ঢাকায় ফিরিয়া আসিলেন।

জয়দেবপুরে শ্রীশ্রীমায়ের গমন এবং প্রফুল্লবাবুর বাটিতে অবস্থান এবং ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন।

দুই চারি দিনের মধ্যেই মা দক্ষিণ দেশে যাইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে ভোলানাথ, বাবা, যোগেশদাদা, আশু, মার এক পিসিমা এবং আমি চলিলাম। এই পিসিমাই আরও একবার মার সঙ্গে বাহির হইয়াছিলেন। কলিকাতায় পৌঁছিয়া সালকিয়ার পিসিমার বাড়ী গিয়া উঠিলেন। তথা হইতে মা একদিনের জন্য রাজসাহী ঘুরিয়া আসিলেন। এই সময়ে একদিন ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়, চারুবাবু, পিসিমা, আমি, বেবী দিদি প্রভৃতি বহু লোকজন সঙ্গে নিয়া মা ও ভোলানাথ একবার ৺তারাপীঠে গেলেন। ভোলানাথ ৺তারামায়ের আদেশ পাইয়াছিলেন, বৎসরে একদিন আসিয়া ৺তারাপীঠে থাকিতে হইবে। তাহাই হইল—মাত্র একদিন থাকিয়াই সকলে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলাম। কলিকাতাতে সকলে তাঁহাকে বাসায় নিয়া ভোগ দিতেন। এই ভোগ উপলক্ষেই সকলে একত্র হইয়া মাকে নিয়া আনন্দ করিতেন।

শ্রীশ্রীমায়ের কলিকাতা হইয়া রাজসাহী এবং ৺তারাপীঠ গমন ও কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন।

কলিকাতা হইতে মা দক্ষিণ দিকে রওনা হইলেন। মা প্রথমে ওয়ালটিয়ারে গেলেন। ৩।৪ দিন তথায় থাকিয়া সম্মুখস্থ পাহাড়ে বেড়াইলেন। সেখান হইতে মাদ্রাজ গেলেন। মাদ্রাজেও প্রায় ৭ দিন ছিলেন। ইহার পর আর বেশীদিন বড় কোথাও থাকা হয় নাই। কাবেরী, গোদাবরী, পক্ষিতীর্থ, চিদাম্বরম, শ্রীরঙ্গম্, কাঞ্চিভরম্, মাদুরা প্রভৃতি নানাস্থানে ঘুরিতে লাগিলেন। এইসব জায়গাতেই, ২।১ দিন কি কোথাও একবেলা থাকিয়াই, অন্যত্র রওনা হইয়াছেন। রামেশ্বর—সেতুবন্ধ গিয়া ৫।৭ দিন ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের দক্ষিণাপথ পর্য্যটন।

ঐ দিকে দেখিবার অনেক আছে। যতটা সম্ভব হইতেছে, দেখিয়া

দেখিয়া যাওয়া হইতেছে। পরে কন্যা-কুমারিকা যাওয়া হইল। সে স্থানটি খুব নির্জ্জন। সমুদ্রের পাড়েই সুন্দর ধর্ম্মশালা। মনোরম স্থানটি দেখিয়া সকলেরই কিছুদিন থাকার মত হইল। ১৫ দিন তথায় থাকা হইল। সেদিকের তামিল ও তেলেগু ভাষা আমাদের একবর্ণও বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু মা এর মধ্যেই ২।৪টি বলিতেছেন। পরে অনেকগুলি শব্দ আমাকে দিয়া লিখাইলেন।

ঐ অঞ্চলে নানাস্থান ঘুরিয়া কন্যা-কুমারিকাতে অবস্থান।

সেখানে সমুদ্রের তীরেই ৺কুমারী দেবীর মন্দির। দেবীর কুমারী রূপ চন্দন দিয়া অতি সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখে। সন্ধ্যাবেলায় পাণ্ডাদের ছোট ছোট কুমারী মেয়েরা মন্দিরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গান করে। মা রোজই দুই বেলা সমুদ্রের ধারে ঘুরিয়া বেড়ান। কয়েক-দিনের মধ্যেই এই ছোট ছোট কুমারীদের সহিত মার ভাষার দিক দিয়া না হইলেও ভাবের দিক দিয়া পরিচয় হইয়া উঠিল। তাহারা ধর্ম্মশালায় আসিয়া মাকে মধ্যস্থানে বসাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গান করিত। আমরা তাহাদিগকে নারিকেল ও কলা দিতাম। সেখানে খুব নারিকেল ও কলা পাওয়া যায়। মার ইচ্ছায় একদিন পাণ্ডাদের ও একদিন কুমারীদের ভোজন করান হইল। কুমারীরা ঘাগ্‌রা ব্যবহার করে। ঘাগ্‌রা পরিয়াই ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিয়া নাচিয়া গান করে। মন্দিরে নিয়া তাহাদিগকে মালা, চন্দন, ঘাগ্‌রা ও জামা দেওয়া হইল। সকলেরই মহা আনন্দ।*

'কন্যা-কুমারিকা' ত্যাগ। ১৩৩৭ সন।

---

* কন্যাকুমারীতে বাবা ৺কুমারী দেবীর মন্দিরে জপ করিতে বসিয়াছেন। এক কোণে বসিয়া জপ করিতেছেন। বলিলেন, হঠাৎ কি জানি কেন চোখ খুলিয়া গেল। দেখি, দরজার সামনে দাঁড়াইয়া এক

এই সব আনন্দের খেলা করিয়া মা সেখান হইতে রওনা হইলেন। মা রওনা হইবার সময় গাড়ীর কাছে আসিলে ছোট ছোট মেয়েরা মাকে পুনরায় যাইবার জন্য নানা রকম ইসারায় বুঝাইতে লাগিল। মাও হাসিয়া হাসিয়া তাহাদের সহিত ইসারা করিতেছেন।

আমরা কন্যাকুমারিকা হইতে ত্রিভেণ্ড্রাম আসিলাম। সন্ধ্যা বেলা তথায় পৌঁছিয়াই মা মন্দিরাদি দেখিতে বাহির হইলেন। ৺পদ্মনাভের মন্দিরে গিয়া দেখি, দরজায় প্রহরী। আমাদের জিজ্ঞাসা করিল, আমরা ব্রাহ্মণ কি না? যেই শুনিল আমরা সকলেই ব্রাহ্মণ, অমনি দরজা ছাড়িয়া দিল। ঐদিকে ধর্ম্মশালায় থাকিতে গেলেও ব্রাহ্মণ কি না জিজ্ঞাসা করে। ব্রাহ্মণ হইলে আর কোনই আপত্তি করে না। আমরা মন্দিরের ভিতর গিয়া দেখি বহু লোক আহার করিতে বসিয়াছে। মন্দিরের চারিদিকেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহু লোকের এক সঙ্গে বসিয়া খাইবার স্থান করা হইয়াছে। পরে শুনিলাম, প্রত্যহ প্রায় ৩০০০ হাজার ব্রাহ্মণ সপরিবারে এখানে দুই বেলা প্রসাদ

ত্রিভেণ্ড্রাম গমন এবং ৺পদ্মনাভের মন্দির দর্শন।

গৌরবর্ণা বালিকা মূর্ত্তি। ভাবিলাম, এ কি? এখানে ত কোন স্ত্রীলোক আসে না? এ কন্যা কোথা হইতে আসিল? আমার দৃষ্টি পড়িতেই কন্যা মূর্ত্তি পিছাইয়া যাইতে লাগিল। আমিও ঘাড় বাড়াইয়া ঐ মূর্ত্তি দেখিতেছি, মূর্ত্তি পিছাইয়া যাইতেছে। আমার দৃষ্টি মূর্ত্তির মধ্যেই নিবদ্ধ রাখিবার জন্য নানাভাবে দেখিতেছি। এইভাবে মূর্ত্তিটি যাইতে যাইতে হঠাৎ দেখি, কন্যাকুমারীর প্রস্তর মূর্ত্তির সঙ্গে সেই বালিকা মূর্ত্তিটি মিশাইয়া গেল। বাবা কখনও নিজের এই সব দর্শনের কথা বলেন না। হঠাৎ আজ কয়েক বৎসর পর এই ঘটনাটি বলিয়া ফেলিলেন।

পান। এত লোক খাইতেছে, কোন হৈ চৈ নাই। ইহা তাহাদের দৈনন্দিন ব্যাপার। খুব পাকা বন্দোবস্ত। আমাদের বিদেশী দেখিয়া তাহারা খুব যত্ন করিয়া প্রসাদ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করিল। মার আদেশে আমরা রাজী হওয়ায়, তাহারা পরিষ্কার মত এক ধারে আমাদের বসাইয়া প্রসাদ দিল। মাও একটু মুখে দিলেন। পরে আমরা সকলেই প্রসাদ নিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিলাম। ৩।৪ দিন আমরা সেখানে ছিলাম। সেখানকার মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষের একজনের সঙ্গে আলাপ হইল। তিনি মাকে দেখিয়া মার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইলেন। তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমাদিগকে সব দেখাইলেন। বাঙ্গালীদের ওদিককার মন্দিরে বড় ঢুকিতেই দেয় না। ওখানকার মন্দিরে ৺পদ্মনাভের মূর্ত্তি। অনন্তশয্যার মত মূর্ত্তি। লক্ষ লক্ষ নারায়ণ শিলা দ্বারা ঐ মূর্ত্তি তৈয়ারী হইয়াছে বলিলেন। প্রকাণ্ড মূর্ত্তি। তিনটি দরজা। একটি দরজা দ্বারা মস্তকের অংশ, মধ্য দরজা দ্বারা শরীরের মধ্য ভাগ ও শেষ দরজার দ্বারা চরণ দর্শন করা যায়। একটি দণ্ডী সন্ন্যাসী সেই মন্দিরের পূজক। পূজক আসিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আর কেহই মন্দিরে যাইতে পারেন না— রাজা আসিলেও দাঁড়াইয়া থাকিবেন। সেখানকার রাজা ৺পদ্মনাভের সেবায়েৎ। সমস্ত সম্পত্তিই ৺পদ্মনাভের। কর্ত্তৃপক্ষের ঐ ভদ্রলোকটিই মাকে ও আমাদের নিয়া ৺পদ্মনাভের ভাণ্ডারগৃহ দেখাইলেন। সে এক বিরাট ব্যাপার! যেখানে প্রত্যহ ৩০০০ হাজার লোকের খাওয়া হয়, সেখানকার ভাণ্ডারটির অবস্থা সহজেই অনুমেয়। মা কিন্তু ঘুরিতে ঘুরিতে নিজেই গিয়া ভাণ্ডার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে ঐ ভদ্রলোকটি মাকে দেখিয়া ভিতরে নিয়া বলিলেন "এই ৺পদ্মনাভের ভাণ্ডারশালা"। মন্দিরের এক ধারে দেখিলাম, দোলনায় ৺নারায়ণ বটপত্রের মধ্যে শুইয়া আছেন। সৃষ্টির

প্রারম্ভের এই মূর্ত্তি। বিছানা বড়ই অপরিষ্কার ছিল। মার কথায় সেখানে নূতন বিছানা করিয়া দেওয়া হইল। মা সেখান হইতেই কয়েকখানা হস্তিদন্তের নির্ম্মিত ৺নারায়ণ বটপত্রে শুইয়া আছেন এই মূর্ত্তি নিয়া আসিলেন। এদিকে আসিয়া তাহা পূজা করিবার জন্য অনেককে দিয়াছিলেন। প্রায় সমস্ত সহর নিয়াই ওদিককার বৃহৎ বৃহৎ মন্দিরগুলি তৈয়ারী হইয়াছে। শ্রীরঙ্গমও তাই। প্রায় ৩।৪ মাস সমুদ্রের ধারে ধারে ঐ সব স্থান ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখা হইল।

ওখান হইতে ম্যাঙ্গেলোর হইয়া আমরা বোম্বাই যাই। সেখান হইতে সমুদ্র পথে ৺দ্বারকা যাওয়া হইল। ৺দ্বারকা মন্দিরে সকলে দর্শন করিতে গিয়াছেন। ৺শ্রীকৃষ্ণকে পয়সা দিয়া স্নানাদি করাইবার জন্য পাণ্ডারা ধরিয়াছে; নূতন গামছা কিনিতে বলিতেছেন। ইতিমধ্যে মা হঠাৎ মন্দিরে ঢুকিয়া ঘটির জল দিয়াই ৺শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করাইয়া নিজের আঁচল দিয়া গা মুছাইয়া দিয়াই বাহির হইয়া পড়িলেন। পাণ্ডারা বাধা দিবারও অবকাশ পাইল না।

"দ্বারকা" গমন এবং শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহটিকে অন্যের অলক্ষ্যে স্নাপন।

৺দ্বারকা হইতে আমরা ৺বিন্ধ্যাচল আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে ৺দুর্গাপূজার বন্দোবস্ত পূর্ব্বেই করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও কলিকাতায় আমাদের সহিত মিলিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিতেছেন। তাঁর বিশেষ আগ্রহেই ৺বিন্ধ্যাচলে ৺পূজার আয়োজন হইয়াছে। ৺কাশী হইতে ভক্তেরা সকলে আসিয়াছেন। ঢাকা হইতে ভূপতি-বাবুও এই সময় ৺বিন্ধ্যাচলে আসিয়াছিলেন। মহানন্দে মার উপস্থিতিতে

৺দ্বারকা হইতে ৺বিন্ধ্যাচল আগমন ও তথা হইতে ৺কাশী ও ৺গয়া হইয়া জমসেদপুর গমন।

৺দুর্গাপূজা হইয়া গেল। পরে সকলে ৺কাশীতে নির্ম্মলবাবুর বাসায় মাকে নিয়া গেলেন। তাঁহারা সকলেই পূজা উপলক্ষে ৺কাশী হইতে আসিয়াছিলেন। নেপালদা, শঙ্করানন্দ স্বামী সকলেই পূজায় উপস্থিত হইয়াছেন। আমরা মার সহিত পরে ৺কাশী গেলাম। ৺কাশীতে কয়েকদিন থাকিয়া ৺গয়াধামে যাওয়া হইল। নির্ম্মলবাবু ও তরু নিজেদের কাজ করিবার জন্য ৺গয়াধামে মার সঙ্গেই চলিলেন। ৺গয়াতে সকলে পিণ্ডদানাদি করিলেন। মা সকলকে নিয়া ফল্গু নদীতে স্নান করিলেন। সেইদিনই বৈকালে ৺বুদ্ধগয়াতে চলিলেন। বৌদ্ধমন্দিরে পৌঁছিয়া মা সেইখানেই রাত্রি কাটাইবেন বলিলেন। খুব সুন্দর স্থান। নির্জ্জন বাগান। বৃক্ষের নীচেই সামান্য কিছু বিছাইয়া মার সহিত আমরা রাত্রি কাটাইলাম। সকলকে ঐ বাগানে থাকিতে দেওয়া হয় না। কর্তৃপক্ষকে মার কথা বলায়, তাঁহারা থাকিতে অনুমতি দিলেন এবং অন্যান্য বন্দোবস্ত করিয়া দিতেও প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু আমাদের কিছুই দরকার নাই জানাইয়া দেওয়া হইল। মা রাত্রিতে বাগানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহুক্ষণ কাটাইলেন। ভোরে উঠিয়াই মা হাঁটিয়াই রওনা হইলেন। প্রায় ৩।৪ মাইল আসিয়া গাড়ী পাওয়া গেল। আমরা ৺গয়াতে আসিয়া জমসেদপুরে রওনা হইলাম।

জমসেদপুরে যোগেশদাদার ছোট ভাই কৃষ্ণবাবু চাকুরী করেন। যোগেশদাদার মা প্রভৃতি সকলেই সেখানে আছেন। আমরা জমসেদপুর গিয়া কৃষ্ণবাবুর বাসাতেই উঠিলাম। তিনি অতি ভাল লোক। মাকে ইতিপূর্ব্বে আর দেখেন নাই। যোগেশদাদার ভাইয়েরা সকলেই ওখানে ছিলেন। সকলেই মাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। কৃষ্ণবাবু সেই হইতেই মায় খুব অনুগত হইয়া পড়িলেন। এর পরে ছুটী নিয়াও

জমসেদপুর বাসের কথা।

তিনি কয়েকবার ঢাকায় মার দর্শনে গিয়াছেন। জমসেদপুরে টাটার লোহার প্রকাণ্ড কারখানা জগৎ বিখ্যাত। মাকে নিয়া সকলে সেই কারখানা দেখিয়া আসিলাম। ওখানে বেশীর ভাগই অল্প বয়স্ক ভদ্রলোকেরা সারাদিন কারখানায় পরিশ্রম করে, ধর্ম্মের বড় ধার ধারে না। মা যাওয়ার পর কীর্ত্তনের বন্দোবস্ত করা হইল। কীর্ত্তন হইল; মার খুব ভাব হইল। সেই অবস্থা দেখিয়া যেন সকলের চোখ খুলিল। সেইদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সকলে মাকে ঘিরিয়া বসিয়া রহিলেন। এর পূর্ব্বে ২।৩ দিন বড় কেহ আসেন নাই। কীর্ত্তনের পরের দিন ভোর বেলা হইতেই লোকজনের সমাগম হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্রত্যহই বহুদূর হইতেও মাকে দেখিতে লোক আসিতে লাগিল। কৃষ্ণদাদার বাসায় ভীড় লাগিয়াই আছে। বাসায় লোক ধরে না, এই অবস্থা। রাত্রি ৩।৪টা অবধি ভদ্রলোকেরা মাকে নিয়া বসিয়া থাকেন। কেহই উঠিয়া যাইতে চান না। এইভাবে সেখানে তাঁহাদের মধ্যে একটু সাড়া জাগাইয়া মা কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। যোগেশদাদার বৃদ্ধা মাতা "৺রামেশ্বর" দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, শ্রীশ্রীমা যোগেশদাদাকে তথায় রাখিয়া তাঁহার মাকে নিয়া ৺রামেশ্বর দেখাইয়া আনিবার আদেশ দিয়া আসিলেন। মা চলিয়া আসিলেন। কিন্তু সেই হইতেই জমসেদপুরে কীর্ত্তনের সুরু হইল। মার ছবি ঘরে ঘরে রাখিয়া পূজা আরম্ভ হইল। প্রতি অমাবস্যা পূর্ণিমায় ভোগ আরম্ভ হইল। কৃষ্ণদাদার বাসাতেই সকলে একত্র হইত। শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ছোট জামাতা শ্যামাকান্তও * ইহাতে বিশেষভাবে

---

* ইহার বিবাহের সময় মা উপস্থিত ছিলেন। ইনি এই সময়ে জমসেদপুরে চাকুরী করিতেছেন।

যোগ দিল। অশ্বিনীবাবু, লক্ষ্মীবাবু, অমূল্যবাবু, অবনীবাবু, অতুলবাবু প্রভৃতি অনেকেই যোগ দিলেন।

মা কলিকাতায় আসিয়াছেন। কলিকাতায় ত মার কাছে ভীড় লাগিয়াই আছে। দিনরাত্রি মা প্রায় একভাবেই বসিয়া আছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের কলিকাতায় আগমন।

দলে দলে লোক যাইতেছে, আসিতেছে। শ্রীযুক্ত যতীশ গুহ * মহাশয়েরা সপরিবারে কিছু দিন পূর্ব্বেই চণ্ডীবাবুর বাসায় মাকে দর্শন করিয়াছেন। পরে ঢাকাতে যতীশদাদার শ্বশুর মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রাণকুমার-বাবুর বাসায় গিয়া ও মার আশ্রমে গিয়া তাঁহারা মাকে দেখিয়া আসিয়াছেন। প্রাণকুমারবাবু এখন পাবনা বদলী হইয়া আসিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে একবার অনুকূল ঠাকুরের আশ্রম দেখাইতে একদিনের জন্য যতীশদাদা, মা ও ভোলানাথকে নিয়া পাবনা গিয়াছিলেন। কিন্তু তখন প্রাণকুমার বাবু মাকে পাবনা নিয়া যাইবার জন্য জামাতা যতীশ গুহ মহাশয়কে

---

* ইনি প্রাণকুমারবাবুর জামাতা এবং কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম অ্যাড্‌ভোকেট্। শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান। ইহাদের বর্ত্তমান বাটী কলিকাতায় (বালিগঞ্জে)। প্রতি সন্ধ্যায় ইহাদের বাটীতে সন্ধ্যারতি, ভজন-গান ও ভোগাদি হয় এবং প্রতি রবিবারে দ্বিপ্রহর সময় কীর্ত্তনসহ শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ ভোগাদি হয়। কলিকাতায় প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীমায়ের যে 'জন্মোৎসব' অনুষ্ঠিত হয় তাহা ইহাদের উদ্যোগে এই বাটীতেই হইয়া থাকে। সদা সর্ব্বদা কলিকাতার এবং তৎসন্নিকটস্থ স্থানের শ্রীশ্রীমায়ের ভক্তবৃন্দ, এই বাটীতে স্বতঃই সমবেত হইয়া মায়ের সংবাদাদি গ্রহণ করেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে সদালাপ ও আলোচনা করেন।

লিখিয়াছেন। কলিকাতায় মাকে যতীশদাদাদের বাড়ীতে নিয়া খুব কীর্ত্তন ও ভোগ হইল। যতীশদাদার ছোট ভাইগুলি ক্ষিতীশ, নিতীশ সকলেই মার খুব ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সমস্ত পরিবারটাই যেন মার জন্য পাগল। ইহাদের আত্মীয় কুটুম্বেরাও অনেকেই মার কাছে আসা যাওয়া করেন।

ক্ষিতীশদাদার শ্বশুর শ্রীযুক্ত পশুপতি বসু মহাশয় যোগীরাজ "গম্ভীরনাথ" বাবাজীর শিষ্য। তিনি প্রথম প্রথম মার সঙ্গে সঙ্গে জামাতাদের এই পাগলামি পছন্দ করিতেন না। মার সঙ্গে তাঁর কলিকাতাতেই দেখা হইল। তিনি মাকে বলিতেছেন, "আপনি এই সব ছেলেগুলিকে এইভাবে নাচাইতেছেন কেন, বলিতে পারেন" ?

শ্রীশ্রীমা ও পশুপতিবাবু

মা হাসিয়া উত্তর দিলেন, "বাবা, আমাকে তুমি লাঠি মার", ইত্যাদি নানা কথা হইল। পরে তিনি মার এত অনুরক্ত হইলেন যে মাকে বলিতেন "মা, সকলে তোমায় মা বলে, আমার তুমি বাবা; কারণ, আমার বাবা (গুরু) ও তুমি আমার কাছে অভেদ মনে হইতেছে"। তিনিও খুব সাধন ভজন করিয়াছেন। কথায়ও সকলকে আনন্দ দিতে পারিতেন। মা তাঁহাকে নিয়া খুব আনন্দ করিতেন। প্রাণকুমারবাবু এবং তাঁর স্ত্রীর মত লোকও জগতে বিরল। কিন্তু প্রায় ৬।৭ বছর যাবৎ প্রাণকুমারবাবুর স্ত্রীর কোমরটা অবশ হওয়ায় অপরের সাহায্য ছাড়া দাঁড়াইতেও পারেন না। ইঁহার ছোট ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এবং তাঁহার স্ত্রী সর্ব্বদাই মায়ের কাছে আসা যাওয়া করেন। মাকে কলি-কাতায় সকলের বাড়ী বাড়ী নিয়া গেল, কীর্ত্তনাদি হইল।

একটি সাধুও কয়েকদিন যাবৎ মার কাছে আসা যাওয়া করিতেন; এবারই কলিকাতায় মা একদিন গ্রে ষ্ট্রীটে উপেন্দ্রবাবু উকিলের বাসায়

ভোগে গিয়াছেন। সেখানে সেই সাধুটির স্ত্রী দুইটি শিশু সন্তান নিয়া গিয়া মার কাছে উপস্থিত। স্বামীকে গৃহে ফিরিবার জন্য কাঁদাকাটি করিতেছেন। মা ঐ সাধুটিকে বলিলেন, "তুমি ইহাদের সঙ্গে লইয়া ইহাদের বুঝাইয়া সান্ত্বনা দিয়া আস"। মার আদেশে তিনি তাহাই করিলেন। পরদিন আসিয়া আবার মার নিকট উপস্থিত। মা স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "আমি তাহাকে বুঝাইয়া আসিয়াছি। আমি ত আজ অনেক বৎসর যাবৎই তাহাকে বুঝাইতেছি, কেন বুঝিবে না? তাহাদের মঙ্গলের জন্যইত আমি বাহির হইয়াছি"। মা আর কিছু বলিলেন না।

শ্রীশ্রীমা ও একটি সাধু।

———

দ্বাদশ অধ্যায়

পরে শ্রীযুক্ত যতীশ গুহ মহাশয়দের বাসার সকলে মাকে নিয়া পাবনা চলিল। প্রায় ৩০।৪০ জন লোক মার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। যখন আমরা পাবনা যাইবার জন্য ষ্টেশনে আসিয়াছি, তখন দেখি, সেই সাধুটিও লোটা কম্বল নিয়া ষ্টেশনে হাজির; মার সঙ্গে পাবনা যাইবেন। সকলে মিলিয়া পাবনাতে প্রাণকুমারবাবুর বাসায় গেলাম। তিনি খবর পাইয়া পূর্ব্বেই সব বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মাকে পাইয়া মহানন্দে ঘরে নিয়া গেলেন। সঙ্গেও বহুলোক। সকলকেই যথেষ্ট যত্ন করিলেন। এখানেও এত লোক মাকে দর্শন করিতে আসিলেন, যে বাসায় জায়গা হয় না। দিন রাত্রি যে কোথা দিয়া চলিয়া যাইতেছে, কেহ টেরই পাইতেছে না। মা সঙ্গে সঙ্গে সকলকে নিয়া এক ঘরেই রাত্রিতে অল্প সময়ের জন্যই বিশ্রাম করিতেন। একদিন সকলে মিলিয়া মাকে নিয়া অনুকুল ঠাকুরের আশ্রমে গেলেন। ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হইল। সকলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আশ্রম দেখিলেন। আশ্রম হইতে কয়েক খানা বই মাকে দেওয়া হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা ফিরিয়া প্রাণকুমার বাবুর বাসায় আসিলাম। সেখানকার জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব (বাঙ্গালী) মাকে দেখিতে আসিয়া অনেকক্ষণ মার সহিত আলাপ করিলেন। মার মুখে মার জীবনের পূর্ব্ব ঘটনা শুনিয়া খুব আনন্দিত হইলেন। একদিন মা, প্রাণকুমারবাবুর স্ত্রীর আচার ও আমসত্বের হাঁড়ি খুঁজিয়া বাহির করিয়া নিয়া বসিলেন এবং সকলকে বিলাইয়া দিতেছেন। আমরা মাকে

শ্রীশ্রীমায়ের পাবনা গমন ও প্রাণকুমারবাবুর বাসায় অবস্থান।

একটু খাওয়াইয়া দিলাম। হাঁড়িগুলি খালি করিয়া প্রাণকুমারবাবুর স্ত্রীর কাছে নিয়া বলিতেছেন "এই দেখ, তোমার হাঁড়ি ভরা সব জিনিষ খাইয়া ফেলিলাম"। তিনি বলিলেন, "মা তুমি ত একটু খাইয়াছ?" মা বলিলেন, "এই যে সকলের মুখেই আমি খাইলাম।" কলিকাতা হইতে অনেক ফল আনাইয়াছিলেন; ধীরে ধীরে মাকে দিতেছিলেন। পাবনায় বেশী ফল পাওয়া যায় না। মা কিন্তু একদিন ডালা শুদ্ধ আমাকে দিয়া আনাইয়া সব বিলাইয়া দিতে বলিলেন। বলিলেন:— "এত জমা করিয়া ধীরে ধীরে খাইতে নাই, যেখানে যা পাওয়া যাইবে, তাই খাওয়া হইবে।" এইরূপ নানা ভাবে আনন্দ করিয়া, আবার সকলকে কাঁদাইয়া, পাবনা হইতে রওনা হইলেন। সেই সাধুটির পাবনা যাওয়ার পরদিনই জ্বর হইয়াছে। একদিন জ্বর নিয়াই সব খাইয়াছিলেন। তারপর এই ভীড়ে আর মার কাছে তিনি আসেন নাই। বৈঠকখানায় তাঁহার থাকিবার স্থান দেওয়া হইয়াছিল। মারও ওদিকে যাওয়া হয় নাই। আসিবার সময়ও তিনি আসিয়া মার সঙ্গে দেখা করিলেন না। তাঁহার মনে কেমন অভিমান হইয়াছিল, যে মা যখন নিজে দর্শন দেন নাই, আমিও যাইব না। গণ্ডগোলে কাহারও খেয়াল হয় নাই যে মাকে একবার ওদিকে নিয়া যাই। মা পাবনা হইতে রওনা হইয়া আসিলেন। রাস্তায় আসিয়া মা সাধুটির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন আশু বলিল, জ্বরের জন্য তিনি আসিতে পারেন নাই এবং অভিমান করিয়াই মার সঙ্গে দেখাও করেন নাই। মা বলিলেন, "আমার খেয়াল হয় নাই"। তারপর সকলকে বলিলেন, "তোমরা কেন একবার আমাকে মনে করাইয়া দিলে না?"

আমরা মার সহিত কলিকাতায় পৌঁছিলাম। কলিকাতা হইতে কয়েকদিনের মধ্যেই কক্সবাজার রওনা হইলাম। চট্টগ্রাম হইয়া

আমরা কক্সবাজার গেলাম। মার পিসিমা জমসেদপুরেই তাঁর মেয়ের কাছে থাকিয়া গিয়াছেন। আশুও কলিকাতায় রহিয়া গেল।

কলিকাতায় ফিরিয়া শ্রীশ্রীমায়ের কক্সবাজার গমন।

কলিকাতা হইতে ৺অতুল দত্ত মহাশয়ের স্ত্রী (টুনুর মা) আমাদের সঙ্গে চলিলেন। মা একদিনের জন্য পূর্ব্বে একবার (১৩৩৬ সনে যখন ৺আদিনাথ যান) যতীশ দাদার সহিত কক্সবাজারে আসিয়াছিলেন। কক্সবাজারের উকিল শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু চক্রবর্ত্তী মহাশয় মাকে উঠাইয়া নিজের বাসায় নিয়া গেলেন এবং সমুদ্রের ধারে তাঁহার একটা বাসা ছিল, সেই বাড়ীতেই মার থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন। আমরা মার সহিত সেই ছোট বাংলাতেই ছিলাম। দীনবন্ধুবাবুর নিজ বাসাতেই খাওয়া দাওয়া হইত।

একদিন মা সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে বালুর মধ্যে গর্ত্ত করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করায়, বলিলেন :—"আমার সমাধি স্থান তৈয়ারী করিতেছি।" আমি বাধা দিয়া মাকে উঠাইয়া নিয়া আসিলাম। তাহার ২।৪ দিন পরই ডাক আসিয়াছে। মা তাহা দেখিয়াই তাড়াতাড়ি অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। আমাকে বলিতেছেন :—"কাহার চিঠি আসিল, দেখ গিয়া। পাবনা হইতে মৃত্যু সংবাদ আসে নাই ত?" এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই ভোলানাথ চিঠি নিয়া মার কাছে গিয়া বলিতেছেন, "দেখ, প্রাণকুমার বাবুর চিঠি আসিয়াছে; পাবনায় তাঁহার বাসাতেই সেই সাধুটি মারা গিয়াছে"। মা তখন আমাকে বলিলেন "সন্ন্যাসীর ত মৃত্যুর পর সমাধিই দেয়। সেদিন সমাধিস্থান করিতেছিলাম। না?"

পাবনার সন্ন্যাসীটির মৃত্যুর পূর্ব্বাভাস।

আমরা প্রায় ২০।২২ দিন কক্সবাজারে ছিলাম। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার

কিছুদিন পরই একদিন অমাবস্যাতে মা জ্ঞানবাবু মুন্সেফের বাসায় ভোগে গিয়াছেন। আমরাও সঙ্গে গিয়াছি। তথা হইতে নিজেদের বাংলায় ফিরিয়াই মা নিজের এক হাত দিয়া আর এক হাত মোচড়াইতে মোচড়াইতে বলিতেছেন: "ভাঙ্গিয়া ফেলিব"? মুখে হাসি হইলেও চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। মার ত কিছুই বিশ্বাস নাই। তাই আমি বাধা দিয়া হাত দুইখানি ধরিয়া হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম। সারা রাত্রি মার কেমন একটা অবস্থা গেল।

রমণার ৺কালীমূর্ত্তিটির হাতের গহনা চুরির পূর্ব্বাভাস।

পরদিনও চোখে জল। আর মধ্যে মধ্যে হাত মোচড়াইতেছেন। কি কারণ, বুঝিলাম না। কয়েকদিন পরই ঢাকা হইতে যতীশ দাদার পত্রে জানিলাম, সেই অমাবস্যার দিনই ঢাকার রমণা আশ্রমের ৺কালীমূর্ত্তিটির হাত ভাঙ্গিয়া চোরে গহনা নিয়া গিয়াছে। মা হাতের যে অংশটি মোচড়াইতেছিলেন, ৺কালীরও হাতের সেই অংশটিই ভাঙ্গিয়া গহনা নিয়া গিয়াছে। এইভাবে দূরের খবর অনেক সময় মা শরীরের ভাব দিয়া প্রকাশ করিতেন।

এখানে কক্সবাজারের আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। এবার ৺কাশী হইতে ননী (কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র) আমাদের সঙ্গে গিয়াছে। কক্সবাজার আসিয়া

কক্সবাজারে ননীর অপূর্ব্ব অবস্থার কথা।

একদিন গায়ত্রী জপ (মার কথা মত সে জপ করিত) করিতে করিতে, তাহার হঠাৎ দুপুর-বেলা অদ্ভুত অবস্থা। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চ দিয়া যেন ফুলিয়া উঠিয়াছে। চোখ বুজিয়াই আছে; পদ্মাসনে বসিয়া আছে; অবিরত নাম চলিতেছে; বন্ধ হইতেছে না। দীনবন্ধুবাবু প্রভৃতি এই অবস্থা দেখিয়া অবাক। মাকে ডাকিয়া আনা হইল। মা আসা মাত্রই ছুটিয়া গিয়া মার চরণে

পড়িয়া নমস্কার করিল। চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে। সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া পড়িল। খুবই একটা আবিষ্টের ভাব। মা-ও দেখিতেছেন। ২।৩ দিন পর্য্যন্ত খাইতেও পারিল না। কখনও শরীর একেবারেই অবশের মত ছাড়িয়া দিত। কখনও কখনও অন্যমনস্কের মত চলিত। একদিন রাত্রিতে মা একান্তে নিয়া বসিয়া কি সব বলিলেন। তারপর হইতে এই ভাব কমিয়া গেল।

সেখান হইতে কিছুদিন পর মা আমাদের নিয়া ৺আদিনাথ আসিয়া কয়েকদিন ছিলেন। ৺আদিনাথেই একদিন ভোলানাথের সহিত কি একটু গোলমাল চলিতেছে। কয়েকদিন যাবৎই ভোলানাথের ক্রোধের ভাব চলিতেছে। মা চুপ করিয়াই আছেন। ৺আদিনাথ আসিয়াও ভোলানাথ সেইভাবেই কি বলায়, মা হঠাৎ এমন হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, যে সকলেই স্তম্ভিত। ভোলানাথও চুপ করিয়া গিয়াছেন। মা-ও মুহূর্ত্তেই ঐ ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া সমাধিস্থ অবস্থায় পড়িয়া গেলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত এইভাবে পড়িয়াছিলেন। পরে অনেক চেষ্টায় উঠান হইল। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ভোলানাথের ক্রোধের ভাব হইলে, অথবা কোন সত্য জিনিষের প্রতি কেহ উপেক্ষার ভাব প্রকাশ করিলে, মার ভয়ানক একটা অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখা যাইত।

শ্রীশ্রীমায়ের ৺আদিনাথ গমন।

শাহাবাগেও একদিন মা খাইতে বসিয়াছেন, আমি খাওয়াইয়া দিতেছি। ভোলানাথ খাওয়া দাওয়া করিয়া উঠিয়া গিয়াছেন। কি কারণে আশু ও অমূল্যের উপর রাগ হইয়াছে, তাহাদের মারিয়াছেন। ঘরে আসিতেই মা বলিলেন, "কতদিন বলিয়াছি, আমি খাইতে বসিলে এইভাবে রাগারাগি করিও না। কিছুতেই তাহা হইতেছে না"। এই বলিয়া চুপ করিলেন। আর খাইতে পারিতেছেন না। ইহা দেখিয়া,

ভোলানাথেরও তখন রাগ ছিল, মার এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই উপেক্ষার ভাবে কি বলিলেন। অমনি মা একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

ভোলানাথের ক্রোধে শ্রীশ্রীমায়ের দৃশ্যতঃ অবস্থা-ভেদ।

ডান হাত তুলিয়া ভয়ানক মূর্ত্তিতে হুঙ্কার করিয়া ভোলানাথের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভোলানাথ একেবারে চুপ। আমরা ত ভয়েই অস্থির। বাউল বাবু ছিলেন। তিনি ও বাবা হাত জোড় করিয়া "মা, মা", বলিয়া শান্ত হইবারই যেন প্রার্থনা জানাইতেছেন। কিন্তু হুঙ্কার করিয়াই মা চোখ বুজিয়া ফেলিলেন এবং দাঁড়ান অবস্থা হইতে একেবারে মাটিতে পড়িয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। সেদিন আর উঠানই গেল না। পরদিন অনেক চেষ্টায় উঠান হইল। আজও প্রায় সেই অবস্থা। অথচ কত সময় দেখিয়াছি, ভোলানাথ কত রাগ করিয়াছেন, কত কি বলিয়াছেন, তাহাতে মার "আনন্দময়ী" ভাবের এতটুকুও পরিবর্ত্তন হয় নাই। অনেক সময় দেখিয়াছি, ভোলানাথ হয়ত খুব চটিয়াছেন, মাকে খুব মন্দ বলিতেছেন, নিকটে আসিলে পাছে ভোলানাথ আরও চটিয়া যান, এইজন্য মা তাঁহার নিকট হইতে সরিয়া গিয়া হাসিয়াছেন। বলিতেন, "কিছুই লাগে না। আমার যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই আনন্দের ভাব থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত উনি শান্ত হইবেন না। রাগে শরীর ও মনই শুধু খারাপ করেন। আমার ত কিছুতেই কিছু হয় না। শরীরের অবস্থার একটা পরিবর্ত্তন দেখিলে তখন উনি ঠাণ্ডা হন। তাই বোধ হয়, পরিবর্ত্তন হইয়া যাওয়া দরকার। তাই হইয়া যায়। আমি ত ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না। যাহা দরকার, তাহাই শরীরের ভিতর হইয়া যাইতেছে"। আবার কখনও ভোলানাথকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য, হাসির ভাব লুকাইয়া গম্ভীর হইতেন; কি একেবারে উদাস ভাব হইয়া যাইত।

বাস্তবিকই তখন ভোলানাথ ঠাণ্ডা হইতেন। এইরূপে মা যে কত খেলাই করিতেন! ৺আদিনাথে মার এই ভাব হওয়ায়, ভোলানাথ অনেকটা শান্ত হইলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের চট্টগ্রাম হইয়া ৺চন্দ্রনাথ ইত্যাদি স্থান ভ্রমণান্তে ঢাকা গমন এবং মায়ের বর্ত্তমান জাগতিক জন্মের কথা।

৺আদিনাথ হইতে আমরা চট্টগ্রামে শশীবাবুর বাসায় আসিলাম। তিনি মার ও ভোলানাথের ফটো তুলিলেন। পরে ইনি মার বহু ফটো নিয়াছেন। শশীবাবুকে নিয়াই আমরা ৺চন্দ্রনাথে গেলাম। সেখানে শশীবাবুর একটি ধর্ম্মশালা আছে। সেখানেই তিনি আমাদের সব বন্দোবস্ত করিলেন। ৺চন্দ্রনাথ, বাড়বানল, সহস্রধারা সব দেখা হইল। পরে কসবা ৺কালীবাড়ী যাওয়া হইল। এখানেই মার পিতামহী পৌত্রের কামনা করিতে আসিয়া পৌত্রীর জন্মগ্রহণের প্রার্থনা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তারপরই শ্রীশ্রীমার জন্ম হয়। কসবাতে একদিন থাকা হইল। পরে চাঁদপুরে গিরিজা দাদার বাসায় গিয়া কয়েকদিন থাকা হইল। তথা হইতে ঢাকা যাওয়া হইল। প্রায় ৫।৬ মাস পর মা ঢাকায় ফিরিলেন। সকলেই মাকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। কয়েকদিন পর গর্ভধারিণীকে ৺রামেশ্বর দর্শন করাইয়া যোগেশদাদাও ঢাকায় ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের কলিকাতা আগমন এবং ভোলানাথের ভ্রাতা রেভারেণ্ড চক্রবর্ত্তীর সহিত বহুবর্ষ পরে মিলন।

তাহার কিছুদিন পর হঠাৎ কলিকাতা হইতে চারুবাবুর এক পত্রে খবর পাওয়া গেল যে ভোলানাথের ভ্রাতা আজ ২২ বৎসর যাবৎ নিরুদ্দেশ; তিনি কলিকাতাতেই আছেন; চারুবাবুর সহিত দেখা করিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছিলেন। মার ও ভোলানাথের খবর তিনি পাইয়াছেন, ইত্যাদি

ইত্যাদি। এই খবর পাইয়াই ভোলানাথ, মাকে ও আশুকে নিয়া কলিকাতা চলিয়া গেলেন। ৫।৭ দিন তথায় থাকিলেন। ভাইয়ের সহিত দেখা হইল। তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়া খৃষ্টধর্ম্মযাজকের পদে আছেন। বর্ত্তমানে তিনি "রেভারেণ্ড কে. কে. চক্রবর্ত্তী" নামে পরিচিত। বহুদিন পর মিলনে সকলেরই আনন্দ হইল। তিনি বলিলেন, অনেকদিন যাবৎই তিনি কলিকাতায় আছেন; কুশারী মহাশয় প্রভৃতি সকলকেই দেখেন, কিন্তু আত্মপরিচয় দেন নাই। এখন মার এই অবস্থা শুনিয়া আত্মপরিচয় দিতে ইচ্ছা হইল; তাই চারুবাবুর বাসায় গিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। চারুবাবু মার ভক্ত, মা সেই বাসায় আসা যাওয়া করেন, এসব খবর তিনি পাইয়াছেন।

———

ত্রয়োদশ অধ্যায়

৫।৭ দিন কলিকাতায় থাকিয়া ভোলানাথ মাকে নিয়া ঢাকায় চলিয়া আসিলেন। এদিকে আশ্রমে বড় মন্দির উঠিবে। কাজ আরম্ভ হইয়াছে। নগেনবাবুই কাজ দেখিতেছেন। তাঁহার লোকজন দিয়াই কাজ করাইতেছেন। মাটি খুঁড়িবার সময় অনেকগুলি সমাধি বাহির হইল। এমন কি, শরীরের হাড় পর্য্যন্ত পাওয়া গেল। কোন জায়গায় হাঁড়ির ভিতর ভস্ম ও মাটির প্রদীপ পাওয়া গেল। মা-ই ইহা দেখাইলেন।

কলিকাতা হইতে শ্রীশ্রী-মায়ের ঢাকায় গমন এবং ঢাকায় আশ্রমের স্থানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধকগণের সমাধির কথা।

তিনটি সমাধি বড় মন্দিরের মধ্যে পড়িল। পার্শ্বস্থিত আর একটির উপর ৺শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছে। ৺শিবমন্দির উঠিয়াছে। আর একটির উপর মার পাদপদ্ম স্থাপিত হইয়াছে। মা বলিলেন, এই আশ্রমের প্রায় সব জায়গাতেই সমাধি আছে। মার যে কুটীর উঠিয়াছে, তাহার নীচেও সমাধি আছে। অসুখের পর মা যখন আসিয়া এই কুটীরে শুইতে আরম্ভ করিলেন, তখন মা সামান্য একটি কম্বলের বিছানা পাতিয়াই শুইতেন। কয়েকদিন পর ভোলানাথও ভাল হইয়া ঐ ঘরে আসিয়া শুইলেন। মা দক্ষিণ দিকে শুইয়াছিলেন, ভোলানাথ আসিয়া উত্তর দিকে শুইলেন। তাঁহার বিছানায় তখন তোষক, লেপ, নেটের মশারী, বালিশ ইত্যাদি সবই ছিল। একদিন রাত্রিতে মা হঠাৎ উঠিয়া ভোলানাথকে বলিলেন, "তুমি উঠিয়া আমার বিছানায় যাও, আমি তোমার বিছানায় শুইব"। ভোলানাথ উঠিয়া গিয়া মার কম্বলে শুইলেন; বালিশও ছিল না। কয়েকখানা কাপড় জড়াইয়া মাথায়

দিলেন। মা গিয়া ভোলানাথ যে বিছানায় শুইয়াছিলেন, সেই বিছানায় শুইলেন। ৩।৪ দিন শুইয়াই বলিলেন, "এই বিছানা তুলিয়া রাখ"। এই বলিয়া, কম্বল পাতিয়া নিজের বিছানা করিলেন। কিন্তু মা উত্তর দিকেই রহিয়া গেলেন। মা ঐদিকে ভোলানাথকে শুইতে বারণ করিয়া নিজেই ঐ ধারে শুইতেন। সেই হইতেই ভোলানাথেরও কম্বলে বিছানা হইল। এই যে স্থান পরিবর্ত্তন করিলেন, ইহাতেও নীচে সমাধির কি ঘটনা আছে বলিলেন। মা নাকি এক কঙ্কাল মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। পরে প্রমাণ করিয়াছেন, উহা যতীশদাদার পূর্ব্বজীবনের সমাধিস্থান।

মা আশ্রমেই আছেন; মধ্যে মধ্যে ভক্তদের বাড়ীতেও নিয়া যায়; প্রত্যূষে মাঠে ঘুড়িয়া বেড়ান। বৈকালেও সব মেয়েদের নিয়া মাঠে মাঠে ঘুড়িয়া বেড়ান। ভদ্রলোকেরা তখন সব আসিতেন; মাঠে বসিয়া বসিয়া মার বেড়ান দেখিতেন।

রায় বাহাদুর বৃদ্ধ; তিনি বলিতেন:—আমি ত মার কিছু বুঝি না। তবে এটা বুঝি, ইনি অসাধারণ। এই যে এতগুলি মেয়ের মধ্যে হাঁটিতে-ছেন, সকলের উপরে মাথা উঠিয়াছে, যেন রাজহংসী।" * বাস্তবিকই মার চলিবার ভঙ্গী ও শরীরের গঠনই যেন কি এক রকম! হাঁটিয়া আসিয়া মা মাঠে বসিতেন, কি কখনও নিজের কুটীরের বারান্দায় বসিতেন। সকলে তখন মাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইত বা বসিত। এইভাবে রাত্রি ৯।১০টা হইয়া যাইত। তখন সকলে ধীরে ধীরে বিদায় নিতেন। কেহ কেহ অনেক রাত্রি অবধি থাকিতেন।

---

* এই রায় বাহাদুরের (যোগেশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়) কথায় মা একবার বলিয়াছিলেন, "ইহার ভিতরের ভাবটা ভাল, যদিও বাহিরে অনেক বিপরীত ভাবের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। আমি যখন প্রথম প্রথম শাহাবাগ গিয়াছি,

শ্রীশ্রীমায়ের এক সময় কলিকাতায় অবস্থানকালে উক্ত রায়বাহাদুর এবং তাঁহার পুত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহা এই স্থানে উল্লেখ করিতেছি।

১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীশ্রীমা কিছু সময়ের জন্য কলিকাতাতে আসিয়াছিলেন। এই সময়ে রায়বাহাদুর (শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র ঘোষ

ইহাদের সঙ্গে পরিচয় হইল, আমি ত ইহার মোটরের শব্দ পাইয়াই ঘরের ভিতর চলিয়া যাইতাম। তখন আমি বড় কাহারও সামনে বাহির হইতাম না"। এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। পরে বলিতেছেন, "ইনিই আসিয়া আমাকে ডাকিয়া বাহির করিতেন। আমার কাছে নিজ জীবনের অনেক কথা বলিতেন। একদিন ইনি বলিতেছেন, "আমার ছোট বেলাকার এক বন্ধু সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে। আর আমি কোথায় পড়িয়া রহিলাম," এই বলিতে বলিতে ঝর ঝর করিয়া চোখের জল পড়িত। আর একদিন বলিতেছেন, "আমরা কয়েকজন একবার জঙ্গলে বেড়াইতে যাইয়া পথ হারাইয়া ফেলিলাম। তখন বিপদে পড়িয়া ভগবানের কথা স্মরণ হইল। হঠাৎ দেখি একটি বালক কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতেই সে আমাদের পথ দেখাইয়া জঙ্গলের বাহিরে নিয়া আসিল। তাহাকে পুরস্কার দিব ভাবিয়া পয়সা খুলিয়া তাহাকে দিতে গিয়া দেখি, কেহ কোথায়ও নাই। তখন বুঝিলাম 'ভগবানেরই ছলনা' এই বলিয়া বহুক্ষণ অনবরত চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন।" কাহার ভিতর কি ভাব আছে তাহা দেখিয়া মা কৃপা করেন। আমরা তাহা না বুঝিয়া মার সম্বন্ধে অনেক সময় বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া বসি। যেমন অনেক সময় কেহ কেহ বলেন, "মা বড়লোকদেরই কৃপা করেন"। ইহা অত্যন্ত ভুল ধারণা।

মহাশয়) কলিকাতায় ৩৬ নং থিয়েটার রোড ভবনের একাংশে সস্ত্রীক বাস করিতেন। ঐ বাটীটি ঢাকার নবাব বাহাদুরের কন্যা নবাবজাদি প্যারিবানু খানাম সাহেবার বাটী। রায়বাহাদুর নবাব এষ্টেটে তাঁহার চাকুরী সম্পর্কে ঐখানে থাকিতেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ মহাশয় সরকারী চাকুরী উপলক্ষে তখন ব্যারাকপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। নবাবজাদি সাহেবা শ্রীশ্রীমায়ের একজন বিশেষ ভক্ত। তাঁহার বিশেষ আগ্রহ নিবন্ধন শ্রীশ্রীমা উহার বাটীতে তখন মধ্যে মধ্যে আসিয়া বাস করিতেন। তখন গৃহীর বাড়ীতে রাত্রিবাস করা মা পরিত্যাগ করেন নাই।

শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় রায়বাহাদুরের সহিত একই স্থানে ঐ বাটীতে আসেন শুনিয়া, অতুলবাবুর মনে এই আকাঙ্ক্ষা জাগে, যে একদিন তাঁহার ব্যারাকপুরের বাসায় শ্রীশ্রীমাকে লইয়া আসিবেন। তদনুসারে, মাকে লইবার দিন ও সময় স্থির করিবার মানসে, তিনি উক্ত থিয়েটার রোড ভবনে একদিন আসেন। কিন্তু আসিয়া দেখেন যে সেদিন শ্রীশ্রীমা ভোলানাথের সমভিব্যাহারে, ৭।৮ মাইল দূরবর্ত্তী তাঁহার এক ভক্তের বাড়ীতে, রায় বাহাদুর ও তাঁহার পত্নীকে সঙ্গে লইয়া, কিছু পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন; অবগত হইলেন, যে ফিরিতে অনেক রাত্রি হইবে। অতুলবাবু নবাবজাদির সহিত দিন স্থির সম্বন্ধে আলোচনা সমাপ্ত করিয়া, তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া আসিলেন যে তাঁহার পিতা (রায়বাহাদুর) ফিরিলে, তাঁহাকে যেন জানান হয় যে অতুলবাবু শ্রীশ্রীমাকে একদিন ব্যারাকপুর লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিতে আসিয়াছিলেন।

দূর হইতে শ্রীশ্রীমা ভক্তের নিবেদন জানিতে পারেন।

এ দিকে উক্ত ভক্তের বাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের সম্মুখে যখন কীর্ত্তনাদি

হইতেছিল, তখন মা কয়েকবার অসম্বদ্ধ এবং উদাসভাবে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "আমাকে যেতে হ'বে। আমাকে যেতে হ'বে"। রায় বাহাদুর বা উপস্থিত কোনও ব্যক্তি তখন তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তারপর উক্ত ভক্তের বাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন রায়বাহাদুর নবাবজাদির প্রমুখাৎ শুনিলেন যে তাঁহার পুত্র অতুলবাবু মাকে ব্যারাকপুরে নিবার বন্দোবস্ত করিতে আসিয়াছিলেন তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে শ্রীশ্রীমা অতুলবাবুর কথাবার্ত্তা ৭।৮ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অনুভব করিয়া, "আমাকে যেতে হবে, আমাকে যেতে হবে" বলিতেছিলেন। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যে সময় অতুলবাবু উক্ত বন্দোবস্তের কথা নবাবজাদির সহিত কলিকাতায় আলোচনা করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই শ্রীশ্রীমা তাঁহার ঐ ভক্তের বাটীতে ঐরূপ কথা বলিয়া উঠিয়াছিলেন।

তারপর নির্দ্দিষ্ট দিনে (সম্ভবতঃ ৪ঠা এপ্রিল, ১৯২৭) শ্রীশ্রীমাকে ও ভোলানাথকে ব্যারাকপুরে নেওয়া হয়। শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমন হইবে শুনিয়া সেখানে বহুলোকের সমাগম হয় এবং সকলে মিলিয়া মহা আনন্দে কীর্ত্তনাদি করেন।

কীর্ত্তনের সময় ভাবাবিষ্ট অবস্থায় শ্রীশ্রীমা আসরে গড়াগড়ি দিতে থাকেন এবং ভাবাবস্থায় মা যে কত প্রকার কষ্টসাধ্য আসনে সহজভাবে আসীনা হইয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া সমাগত ব্যক্তিমাত্রেই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তখন মায়ের মুখের এক অলৌকিক জ্যোতিঃ, কি অপূর্ব্ব ভাব !! তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। অবশেষে সমাধি অবস্থায় তাঁহার মুখ হইতে সুমধুর সংস্কৃত ভাষায় কত স্তোত্র, কত মন্ত্র স্বতঃই উচ্চারিত হইতে লাগিল। সকলেই

কীর্ত্তনের সময় শ্রীশ্রীমায়ের বিচিত্র বাহ্যিক অবস্থা।

চমৎকৃত, স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীশ্রীমায়ের সংস্কৃত ভাষার কোনও লৌকিক জ্ঞান ছিল না। তথাপি কিরূপে ঐরূপ স্তোত্রাদি অনর্গল বিশুদ্ধভাবে নির্গত হইল, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। শ্রীশ্রীমায়ের সবই লোকোত্তর ভাব !!

রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তনাদি চলিল। তখন পর্য্যন্ত তাঁহার সমাধিভাব প্রায় পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সেই রাত্রেই ফিরিতে হইবে বলিয়া শ্রীশ্রীমাকে প্রায় অচেতন অবস্থায় অতি কষ্টে গাড়ীতে উঠাইয়া, ভোলানাথ এবং রায়বাহাদুর ও তাঁহার পত্নী সমভিব্যাহারে তাঁহাকে কলিকাতায় পাঠান হয়।

একদিন শ্রীযুক্ত রামঠাকুর মহাশয়কে নিয়া প্রাণকুমারবাবু প্রভৃতি অনেকে মার আশ্রমে আসিয়াছিলেন। রামঠাকুর মহাশয় আসিয়া সাষ্টাঙ্গে মাকে প্রণাম করিলেন; মাও হাত জোড় করিয়াই রহিলেন। কিছু সময় থাকিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। রামঠাকুর মহাশয় মার পিতার বয়সী। তিনি মাকে প্রণাম করিলেন, অথচ মা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন না, ইহাতে ঠাকুর মহাশয়ের ভক্তেরা গিয়া কেহ কেহ তাঁহার নিকট অনুযোগ করিলেন। প্রাণকুমারবাবু তাহা শুনিয়া আসিয়া মাকে জানাইলেন। মা হাসিয়া বলিলেন, "তুমি তাঁদের বলিও, ঠাকুর মহাশয়ের পা সর্ব্বদাই আমার মাথায় আছে, কিন্তু আমি যে সাধারণভাবে প্রণাম করিতে পারি না, কি করিব? শরীর যেন কেমন হইয়া যায়"। এই কথা শুনিয়া আর কাহারও কিছু বলিবার রহিল না। এদিকে রামঠাকুর মহাশয়কে (ইনি একজন খুব উন্নত সাধক পুরুষ) তাঁর একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আনন্দময়ী মা আপনার মেয়ের বয়সী। আপনি কেন তাঁর পায়ের

শ্রীযুক্ত রামঠাকুর মহাশয়ের শ্রীশ্রীমাকে দর্শন।

ধূলা লইলেন? সকলের ত নেন না?" তিনি বলিয়াছেন, "যিনি আমার প্রণাম পাইবার যোগ্য, তাঁহাকেই প্রণাম করিয়াছি"। রামঠাকুর মহাশয় অনেককেই বলিতেন, "তোমরা রমণা গিয়া মাকে দর্শন কর; মা ত সাক্ষাৎ ভগবতী"। রামঠাকুর মহাশয়ের জীবনের ইতিহাস অতি অদ্ভুত। অবান্তর বোধে এখানে তাহার উল্লেখ হইতে বিরত হইলাম।

সম্ভবতঃ এই সময়তেই জ্যোতিষ দাদা, একদিন ভোরে মা ও ভোলানাথ এবং আমাকে নিয়া, তেজগাঁও "মাধবী মা"র আশ্রমে যান। মাকে মাধবী মা খুব আদর করিলেন। পরে তিনিও রমণার আশ্রমে আসিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের সহিত মাধবী মায়ের মিলন।

একদিন মা সারাদিন পড়িয়াছিলেন; বৈকালে উঠিয়া মাঠে গিয়া বসিয়াছেন। অনেক লোক মার কাছে বসিয়া আছে। এর মধ্যে "সারস্বত সভা"র শীতলবাবু মাকে বলিতেছেন, আপনি এই যে পড়িয়াছিলেন, তখন হয়ত ভগবানের সহিত যুক্তভাবে ছিলেন, এখন সেই অবস্থা হইতে নামিয়া, আমাদের সহিত কথা বলিতে পারিতেছেন। মা হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা কি ভগবান ছাড়া? আমি ত নামা উঠা কিছু বুঝি না, বাবা। সব সময়ই একই অবস্থা। শুধু শরীরের ভিন্ন ভিন্ন রকম ক্রিয়া বাহিরে দেখা যায় মাত্র। সিদ্ধেশ্বরীতে অসুখের সময়ও যখন সমস্ত শরীর অবশ হইয়া গিয়াছিল, তখন মা হাসিতেন,

শরীরের বাহ্যিক অবস্থা-ভেদ সত্ত্বেও ভিতরে শ্রীশ্রীমার সর্ব্বদা একই অবস্থা।

কথা বলিতেন, শুধু শরীরটা পাথরের মত অচল হইয়া থাকিত। এই অবস্থার কথাও একদিন মা হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "এখন আমি কথা বলিতেছি, হাসিতেছি, চোখ মেলিয়া আছি কিনা; তাই

শরীরটা যে পাথরের মত পড়িয়া আছে, তাহা বলিতেছ অবশ হইয়া গিয়াছে। আর আমি যদি চোখ বুজিয়া থাকিতাম, কথা বন্ধ হইয়া যাইত, তখন শরীরের এই অবস্থা কত হইয়াছে, তখন বলিয়াছ, সমাধিস্থ হইয়াছেন। কথা বলিলে, চোখ খোলা থাকিলে ত সমাধিস্থ হওয়া যায় না?" এই বলিয়া হাসিয়াছেন। তখন বুঝিলাম, কথা ঠিকই। শরীরের এইরূপ অবস্থা ত কতবার রাস্তায় চলিতে চলিতে, কথা বলিতে বলিতে, কীর্ত্তনের মধ্যে হইয়া গিয়াছে। ২।৩ দিনও ভাবে নিমগ্ন অবস্থায় কাটিয়াছে। কিন্তু তখন মা চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিতেন। তাই আমরা সমাধি অবস্থাই বলিয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে, এ সব অবস্থার কথা ভাষায় বলাই আমাদের বাতুলতা।

মাকে নিয়া সকলেরই আনন্দে দিন কাটিতেছে। "সাধন-সমর" আশ্রমের অতুল ঠাকুর মহাশয় আসিয়া মার চরণে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি রোজ ভোরে মাকে ফুল দিয়া অঞ্জলী দিতেন। ডালা ভরা ফুল দিয়া মার কোল ভরিয়া দিতেন।

"সাধন সমর" আশ্রমের অতুল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীশ্রীমাকে অর্চ্চনা।

মার সেই বাজিতপুরের জানকীবাবুর স্ত্রী ঊষাদিদিও ঢাকা আসিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে আশ্রমে আসেন। মাও তাহাদের বাসায় ২।৩ দিন গিয়াছেন; আমিও সঙ্গে গিয়াছি। তাঁর মুখেও মার পূর্ব্ব কথা শুনি। মার হাতের কি রান্না খাইবেন বলিয়াছিলেন, তাহা খাওয়ান হয় নাই। একদিন আশ্রমে মা তাঁর ইচ্ছামত জিনিব পাক করিলেন; তাঁকে খাইতে বলা হইল। মা পাক করিতে পারিয়া উঠেন না; হাত যেন উল্টাইয়া যায়; তবুও যতটুকু পারিলেন, করিলেন। এইরূপ কত খেলাই হইতেছে। মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "যে দিন যায় সে দিন আর আসে না"।

ঊষাদিদির কথা।

একবার সভা উপলক্ষে অন্যান্য স্থান হইতে বড় বড় দার্শনিক ব্যক্তিরা ঢাকায় আসিয়াছেন। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র সরকার মহাশয়ও আসিয়াছেন। মার নাম শুনিয়া তাঁহারা সকলে আশ্রমে আসিয়াছেন। ঢাকারও প্রফেসারেরা কেহ কেহ এই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। মাকে নিয়া তাঁহারা সব বসিয়াছেন। নানা কথা হইতেছে। মার জীবনের পূর্ব্ব কথা সব তাঁহারা শুনিতে চাহিয়াছেন। মা যতটুকু পারেন, বলিতেছেন। কেহ কেহ এসব ঘটনা লিখিয়াও নিতেছেন। কথা উঠিল, মাকে মার মামাত ভাই নিশিবাবু এবং জানকীবাবু বাজিতপুরে মার ভাবাবস্থায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কে"? মা বলিয়া যাইতেছেন, "তারপর মুখ হইতে কি বাহির হইল" এই বলিয়াই, অন্য কথা বলিতেছিলেন। কিন্তু মহেন্দ্রবাবু প্রভৃতি ঐ স্থানেই বিশেষ করিয়া ধরিলেন, "আপনার মুখ হইতে কি বাহির হইয়াছিল?" এদিকে তখন হইতেই মার নিষেধ ছিল, যাহা বাহির হইল, তাহা যাঁহারা শুনিলেন তাঁহারা কেহ যেন প্রকাশ না করেন। আজ বহু বৎসর পর সেই কথাই উঠিয়া পড়িয়াছে। মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আমার বলিতে কি? আমিত নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু বলি নাই। যাহা বাহির গিয়াছে" এই বলিতেই মুখ লাল হইয়া উঠিল, চক্ষুও সজল হইল। মা বলিলেন, আমার মুখ দিয়া তখন বাহির হইয়াছিল "পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ"। এই বলিয়াই যেন কেমন হইয়া গেলেন। কিন্তু কথা চলিতে লাগিল। পরে নিজের দীক্ষার কথা বলিলেন। ভোলানাথের গুরু কে, ও তাঁহার দীক্ষার বিষয় সব বিস্তারিত তাঁহারা জানিতে চাহিলেন। মা ভোলানাথের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া, অনুমতির অপেক্ষা করিলেন। ভোলানাথ ইসারায় নিষেধ করায় মা বলিলেন, উনি নিষেধ করিতেছেন।

ঢাকায় দার্শনিক পণ্ডিতগণের প্রশ্নে শ্রীশ্রীমায়ের আত্মপরিচয় প্রদান।

সেই কথা আর কিছু বলিলেন না। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তাঁহারা উঠিয়া গেলেন। মা ঘরে আসিয়া কেমন হইয়া পড়িলেন। মুখ দিয়া আত্মপরিচয় বাহির হওয়ায় শরীর কেমন হইয়া গেল; শুইয়া পড়িয়া রহিলেন। ভোলানাথ বলিলেন, "কেন বলিলে? তুমিইত নিষেধ করিয়া রাখিয়াছিলে"। মা বলিলেন, "আমিত কিছুই নিজে ইচ্ছা করিয়া করি না। বোধ হয়, সময় হইয়াছে, তাই এইভাবে বাহির হইল"। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মা পড়িয়াছিলেন ও চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল।

আর একদিন ঊষাদিদি আসিয়াছেন। তাহাতেও আমরা এই কথা উঠাইয়াছিলাম। তিনিও বলিলেন, "এত বছর পর আবার বলিতে বাধা কি? এখনত প্রকাশই হইয়া পড়িয়াছে। জগতের মা হইয়া বাহির হইয়াছে"।—এই কথা মাকে বলিয়াই বলিলেন, সেদিন বলিয়াছিলে, "পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ"। মা কাছেই বসিয়াছিলেন। এই কথা বলার পরেই মার চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল। চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। ঊষাদিদি মার এই অবস্থা দেখিয়া বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। মার পা ধরিয়া ক্ষমা চাহিতেছেন। বলিতেছেন "এই কথা বলিয়া কি অপরাধী হইলাম"? মা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "কিছুই অপরাধ কর নাই। যখন যাহা হওয়ার হইয়াই যাইতেছে। নতুবা এত বছর পর তোমার সহিতই বা এইভাবে দেখা হইল কেন? এই কথাই বা উঠিবে কেন?"

ঊষাদিদির নিকট ঐ প্রকার পরিচয় প্রদান।

এ বিষয় মায়ের মুখ হইতে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

বাজিতপুরে মার আপনা আপনি দীক্ষা হইয়া যাইবার পর, একদিন মা নিজের কাজে বসিয়াছেন, শরীরে নানারূপ ক্রিয়া হইয়া যাইতেছে

জপাদিও হইয়া যাইতেছে। দীক্ষার পর হইতে নিত্য নিয়মিত কাজ-টুকু না হইলে, মা জলও খাইতেন না। এইসব দেখিয়া মার মামাত ভাই নিশিকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভোলানাথকে বলিলেন, "ইহার (বাহির হইতে ত হয় নাই) এসব কি হইতেছে? দীক্ষাদি হইল না কিছু না, এসব কি করিতেছে? তুমি কিছু বলিতে পার না?" তখনই মার হঠাৎ ভাবের কেমন একটা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। চেহারাও পরিবর্ত্তিত হইল। বড় ভ্রাতাকে বলিয়া উঠিলেন, "কি বল্‌বে রে, কি বল্‌বে?" তিনি মার মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ে পিছাইয়া গেলেন। ভয়ে ভয়ে হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, "আপনি কে?" মার মুখ হইতে বাহির হইল, "পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণী"। ভোলানাথও জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" মার মুখ হইতে তখন বাহির হইল, "মহাদেবী"। এই সময়ে নিশিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি দীক্ষা হইয়াছে"। মা বলিলেন, "হ্যাঁ"। নিশিবাবু বলিলেন, "রমণীবাবুর কি দীক্ষা হইয়াছে?" মা বলিলেন, "না"। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে হইবে" মা বলিলেন, "৫ মাস পর, ১৫ই অগ্রহায়ণ।" নক্ষত্র বলিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু নক্ষত্রটা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। সব বলিয়া দিলেন। তিনি তিথিটা বুঝিতে পারিলেন না দেখিয়া, মা পরিষ্কার-ভাবে বলিতেছেন, জানকীবাবু পুকুরে মাছ ধরিতেছেন, তাহাকে ডাকিয়া আন, সে বুঝিবে"। মা যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখান হইতে জানকী-বাবুকে দেখা যায় না। কিন্তু মা বলিয়া দিলেন, পুকুরে মাছ ধরিতেছেন। তখনই জানকীবাবুকে ডাকিয়া আনা হইল। জানকীবাবু আসিয়া তিথি বুঝিলেন। জানকীবাবুও জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" তাহার কাছে মার মুখ দিয়া বাহির হইল, "পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ"। তিনিও ঠাট্টা

শ্রীশ্রীমায়ের প্রমুখাৎ তাঁহার আত্ম-পরিচয় বিবরণ।

করিয়া বলিলেন, "আপনি সয়তান"। মা বলিতেছেন, "আমার তখন শরীরের অবস্থা আসন পাতিয়া বসা। গায়ের কাপড়ও ঠিক ছিল না। আমি জানকীবাবুর সম্মুখে ঘোমটা দিতাম। ভোলানাথ ও বড় ভাইয়ের নিকটে কত লজ্জার ভাবে চলিতাম। কিন্তু সে সময় এসব ভাবই ছিল না। আমি বুঝিতেছি গায়ের কাপড় ঠিক নাই। কিন্তু ঠিক করিয়া দিবার মত লজ্জার ভাবই নাই। আমি পরিষ্কারভাবে সব বলিতেছি। এইসব কথাবার্ত্তায় সেদিন তাহারা অফিসেই কেহ গেল না। প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইসব চলিল"। কথা উঠিল, মা একবার হইলেন "নারায়ণী", একবার হইলেন "নারায়ণ", একবার হইলেন "মহাদেবী"; ইহার কারণ কি? মা বলিলেন, আত্মীয়দের স্ত্রীভাব, ভগ্নীভাব, তাই তাঁহাদের নিকট স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ এত। একটা পূজা হইতেছিল তাহাতে মহাদেব মহাদেবী বলা হইল। এও একটা দিক। মোট কথা মূর্ত্ত অমূর্ত্ত বলিয়াত কিছু কথা নাই, যে কিছুই পূর্ণকেই বুঝাইতেছে"। ঝুলনপূর্ণিমার পর যে সোমবার সেইদিনই এইসব কথা হয়। তাহা কি পূর্ণিমার ৩৪ দিন পর তাহা খেয়াল নাই। তাহাদের ভাব অনুযায়ী। বাস্তবিক কিন্তু "নারায়ণ" শব্দই ঠিক ভাবে বাহির হইয়াছিল। আর 'মহাদেবী' শব্দটা বাহির হওয়ার একটা কারণ এই যে, যখনই যে দেবী বা দেবতার পূজা করা হয়, পূজক তখন তদভাবাপন্ন হইয়া যায়। আমি তখন পূজা করিতেছিলাম, তাই ঐরূপ শব্দ বাহির হইয়াছে। পূজা করিতেছিলাম অর্থ

১৩২৯ সনের বৈশাখ মাস হইতেই মার ভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। ১৩২৯ সনের শ্রাবণ মাসেই মার আপনা হইতেই দীক্ষা হইয়া যায়। এই দীক্ষার পর হইতেই মার মুখ হইতে স্তোত্রাদির মত সংস্কৃত ভাষায় অনেক বীজাদি বাহির হইতে থাকে। মা বলিয়াছেন

কিন্তু বাহিরের কোন প্রকার ফুল-বেলপাতার পূজা নয়। দীক্ষার পর হইতে সেই ভাবেরই কতগুলি ক্রিয়া ভিতরে হইয়া যাইত।

শাহাবাগে একবার জঙ্গলে ঘুরিতে ঘুরিতে মাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় আমার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে মা বলিয়াছিলেন "একটা নেবুর কাঁটা নিয়া আস"। আর জঙ্গলের কি একটা ছোট ফল, তাহার রসটা অনেকটা বেগুনে রং ছিল, সেই ফলটির মুখ একটু ছাড়াইয়া হইল দোয়াত। আর নেবুর কাঁটাটি হইল কলম। সঙ্গে আর কেহই নাই। মা আমার হাতে কি কাপড়ে সেই দোয়াতের কালি দিয়া ও সেই কলম দিয়া লিখিয়া দিলেন, "নারায়ণ"। কিন্তু তখন বলা নিষেধ ছিল বলিয়া প্রকাশ করি নাই। আজ ত প্রকাশই হইয়া গিয়াছে। তাই এ কথা প্রকাশ করিলাম। সেই কাঁটাটি ও ফলটি আমি রাখিয়া দিয়াছিলাম ; এখন তাহা শুকাইয়া ঝুরঝুর হইয়া গিয়াছে।

আমার নিকট এক সময়ে ঐ প্রকার পরিচয় প্রদান।

এদিকে মন্দির প্রস্তুত হইয়া গেল। কথা হইয়াছে, মার জন্মোৎসবের

"এই সব বাহির হইবার সময় সর্ব্বপ্রথম শব্দ 'ওঁ' বাহির হয়"। ছোট বেলা হইতে গুরুজনের নিষেধ থাকায় মা এ শব্দ উচ্চারণ করিতেন না। কিন্তু তখন আর সে নিষেধের কথা মনে হইল না। ভিতর হইতে যেন ঠেলিয়া বাহির হইতে লাগিল। আসন ও মুদ্রাদি দীক্ষার পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। দীক্ষার পর হইতে আরও বিশেষভাবে আরম্ভ হইল। ১৩৩০ সনে মা যখন শাহাবাগ আসিলেন, তখনও বিশেষ-ভাবে যোগ ক্রিয়াদি শরীরের ভিতর হইয়া যাইতেছিল। সেই সব ক্রিয়ায় মার তখন ৭ মাস ঋতু বন্ধ ছিল। পরে কিছু দিন স্বাভাবিক হইয়া ২৭।২৮ বৎসর বয়সেই মার ঋতু একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

মধ্যে মন্দিরে দেবতা প্রতিষ্ঠা হইবে। মন্দিরের কি নমুনা হইবে, তাহাও মা বলিয়া দিলেন। ৺কালী মন্দিরটি ভিতরে রাখিয়া মন্দির চারিদিক দিয়া উঠিল। ৺কালী মন্দিরের নীচের প্রায় অর্দ্ধেক অংশ এই বড় মন্দিরের ভিতরে ঢুকিয়া গেল। যে অংশটুকু উপরে রহিল, তাহাতে এক পার্শ্বে দরজা রাখা হইল। দরজা খুলিবার জায়গাও রাখা হইল। ৺কালী মন্দিরটির ছাদের উপরই এবার যে দেবতা প্রতিষ্ঠা হইবে, তাঁহার সিংহাসন প্রস্তুত হইল। মন্দিরের ভিতরে একটি গুহা করা হইল। সিংহাসনের পিছনের দিক দিয়াই সেই গুহায় যাওয়ার সিঁড়ি হইয়াছে। মন্দিরের বাহিরের দিক দিয়াও তিনটি ছোট ছোট কুঠুরীর মত করা হইয়াছে। এবং বারান্দার নীচের দুই ধারে দুইটি কুঠুরী করা হইয়াছে। শুধু বসিয়া সাধন ভজন করিবার জন্যই এইসব কুঠুরী করা হইল।

ঢাকার আশ্রমে মন্দিরের কথা।

১৩৩৮ সনের উৎসব ১৯শে বৈশাখ হইতে আরম্ভ হইল। কলিকাতা হইতে পিসামহাশয় (কালাপ্রসন্ন কুশারী), পিসিমা এবং ভোলানাথের যে ভ্রাতা নিরুদ্দেশ ছিলেন (কামিনীবাবু বা রেভারেণ্ড চক্রবর্ত্তী মহাশয়) তিনি সপরিবারে গিয়াছেন। কলিকাতা হইতে আরও কয়েকজন ভক্তও গিয়াছেন। মন্দিরে ৺অন্নপূর্ণা স্থাপন করা হইল। ৺অন্নপূর্ণার এক ধারে ৺শিব ভিক্ষার ঝুলি নিয়া দাঁড়াইয় আছেন ; অন্যদিকে, মা যেভাবে শূন্যের মধ্যে চলন্ত ৺কালী দেখিয়াছিলেন, সেইভাবেই শূন্যে চলন্তভাবে ৺কালীমূর্ত্তি। (পায়ের নীচে শ্রীশ্রীমা ৺শিব দেখেন নাই বলিয়া, ৺শিব দেওয়া হয় নাই) ৺অন্নপূর্ণার উপরে ৺বিষ্ণুমূর্ত্তি। মার গায়ে যে সব গহনা ছিল, তাহা দিয়াই এইসব মূর্ত্তির গহনা দেওয়া হইয়াছে। ভোলানাথ নিজেই সব স্থাপন

১৩৩৮ সনের শ্রীশ্রী-মায়ের জন্মোৎসব এবং মন্দিরে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা।

করিলেন। মা কিছু সময় মন্দিরে থাকিয়া, ভিতরের গুহায় গিয়া পড়িয়া রহিলেন। মার জন্মতিথিতে এবার এই ৺অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি স্থাপন করা হইল। এই মূর্ত্তির উপরই শ্রীশ্রীমার জন্মতিথির পূজা হইল। সেই হইতেই ঢাকায় জন্মতিথিতে আর মার শরীরের উপর পূজা হয় না, ৺অন্নপূর্ণার উপরই পূজা হয়। এতদিন গুহাস্থিত ৺কালীর ভোগ মটরী পিসিমা প্রভৃতি সকলেই রাঁধিয়া দিতেন। এখন হইতে মা আদেশ করিলেন, যোগেশদাদা মন্দিরে পূজা করিবেন। যোগেশদাদা, অতুল, কমলাকান্ত বা কুলদা দাদাই ভোগ পাক করিবেন, ভোগের জলও তুলিবেন। তাঁহারা আর কাহারও হাতে খাইবেন না; শুদ্ধভাবে থাকিবেন। যোগেশদাদা এতদিন অন্য স্থানে থাকিতেন। এখন হইতে আশ্রমেই থাকিবার আদেশ হইল। মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে একদিন মা আমাদের দিয়া সিদ্ধেশ্বরীতে খুব ভাল ভাবে অনেক প্রকার রান্না করাইয়া ব্রহ্মচারীদের খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। মার ভোগও সেইদিন সেখানেই হইল। কুলদা দাদা, যোগেশদাদা, অতুল, কমলাকান্ত ও কানুকে খুব পরিতোষ করিয়া মা বসিয়া খাওয়াইলেন। কারণ, এরপর হইতেই মন্দিরের সেবার ভার তাঁহারা নিয়া আর কাহারও হাতে খাইতে পারিবেন না। ভোলানাথ নিজেই যজ্ঞাদি বিশেষভাবে করিলেন।

দেব-সেবা ও ভোগাদির ব্যবস্থা এবং যোগেশ ব্রহ্মচারীর আশ্রমবাসের সূত্রপাত।

এই প্রতিষ্ঠার পর হইতেই কুণ্ডে যে দিন-রাত যজ্ঞাগ্নি জ্বলিতেছিল, তাহা বন্ধ করিয়া অপরভাবে যজ্ঞাগ্নি আনিয়া রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। এবং প্রত্যহ কুণ্ডে সেই অগ্নি আনিয়া যজ্ঞ হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইল। ৺কালীমূর্ত্তিরই এতদিন পূজা হইত। এই জন্মতিথির দিন, ৺কালী পূজা করিয়া আভ্যন্তরীণ ৺কালী মন্দিরের দরজা বন্ধ

করিয়া দেওয়া হইল। দরজার সম্মুখে একখানা ঐ ৺কালীরই ফটো রাখা হইল। তাঁহার নিকটেই পূজা হয়, এবং ফটোতেই প্রত্যহ রক্তজবার মালা দেওয়া হয়। এই দরজা খোলা ও বন্ধের ভার যোগেশদাদার উপর রহিল। ব্যবস্থা হইল, প্রতি বৎসর জন্মতিথির সময় একদিনের জন্য আভ্যন্তরাণ ৺কালী মন্দিরের দরজা খোলা হইবে এবং পূজা হইবে। পরদিন সারাদিন মন্দিরের দরজা খোলা থাকিবে। দুপুর বেলার পূজার পর সকলেই (জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে) মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে মন্দির পরিষ্কার করিয়া আবার ৺কালীর পূজা করিয়া ৺কালী মন্দিরের দরজা এক বৎসরের জন্য বন্ধ হইবে। যোগেশদাদাই দরজা খুলিবেন এবং বন্ধ করিবেন, এই মার আদেশ হইল।

যজ্ঞাগ্নি রক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা এবং ৺কালী-মূর্ত্তিটিকে মাটির নীচে মন্দির মধ্যে স্থাপনের ও বৎসরে একদিন জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের উক্ত মন্দিরে প্রবেশ বিধির সূত্রপাত।

এই জন্মোৎসবে কলিকাতা হইতে যতীশ দাদারা তিন ভাই, নবতরুদাদা* ও জ্ঞানদাদা গিয়াছেন। মা একদিন বলিলেন, "অনেক রাত্রি ছেলেরা জাগিয়া জাগিয়া নাম করিতেছে; আজ আমরা মেয়েদের নিয়া নাম করিয়া রাত্রে জাগিব"। এই কথা শুনিয়া মেয়েদের সব

---

* নবতরুদাদা শ্রীশ্রীমায়ের একজন ভক্ত এবং তাঁহার বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান। ইনি বিবাহাদি করেন নাই এবং শ্রীশ্রীমায়ের জন্য পাগলপ্রায়। "জ্ঞানদাদা"—ইনিও অবিবাহিত এবং নবতরু-দাদার হৃদ্য বন্ধু। ইনি ৺পরমহংস দেবের সহধর্ম্মিণী—৺শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবী দীক্ষিত শিষ্য। আনন্দময়ী মায়ের প্রতিও ইহার তীব্র ভক্তি ও অনুরাগ।

বলিলাম। যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারা আনন্দের সহিত রাজী হইল। সেদিন রাত্রিতে প্রায় ৩০ জন স্ত্রীলোক মিলিয়া সারা রাত জাগিয়া নাম করিলেন। মাও সঙ্গে সঙ্গে নাম করিলেন। পর দিন এই খবর পাইয়া অনেক মেয়েরা আবার রাত্রি জাগরণের জন্য মাকে অনুরোধ করিলেন। মাও রাজী হইলেন। আবার একদিন মেয়েরা মিলিয়া সারা রাত নাম করিয়া রাত্রি জাগরণ করিলেন। সেদিন প্রায় ১০০।১৫০ মেয়ে জমা হইয়াছিল। মাও মহা আনন্দে সারা রাত সকলকে নিয়া জাগিলেন; কত আনন্দ করিলেন। পর দিন ভোর বেলা ছেলেদের নিকট নাম দিয়া, মা মেয়েদের নিয়া স্নান করিতে চলিলেন। তখন এক অপরূপ দৃশ্য হইল। মহা আনন্দে সকলকে নিয়া মা সিদ্ধেশ্বরীর ৺কালীবাড়ীর পুকুরে স্নান করিলেন। অনেকক্ষণ জলকেলি চলিল। স্নান করিয়া উঠিয়া মা বলিলেন, "এখন আমাদের বাল-ভোগ দাও"। বাবা এবং আরও কে কে উপস্থিত ছিলেন; তাঁহারা বাল-ভোগের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। মা সকলকে নিয়া সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে গিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। পরে দধি, চিড়া, মুড়ি, ইত্যাদি যাহা ওখানে পাওয়া গেল, যোগাড় করিয়া বাল-ভোগ দেওয়া হইল। বহু লোক, মাঠ ভরিয়া প্রসাদ পাইতে বসিয়া গেল। মাও সেই সঙ্গে বসিলেন। এইরূপে আনন্দ উৎসব করিয়া, মা সকলকে নিয়া রমণা আশ্রমে আসিলেন। স্ত্রীলোকেরা প্রায় সকলেই বিদায় নিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। আরও একদিন রাত্রিতে মা মেয়েদের নিয়া কীর্ত্তন করিয়া রাত জাগিলেন। সেদিনও সিদ্ধেশ্বরীর পুকুরে

শ্রীশ্রীমায়ের নেতৃত্বে সমস্ত রাত্রি ব্যাপী মহিলাগণের নাম কীর্ত্তন—মায়ের জলকেলি এবং সকলের সহিত বাল্য-ভোগ গ্রহণ। অপূর্ব্ব উৎসবানন্দ।

স্নান ও তথায় লুচি মিষ্টি দিয়া বাল-ভোগ হইল। এইভাবে মেয়েদের নিয়া কীর্ত্তন প্রথম আরম্ভ হইল। পরে মেয়েরা মধ্যে মধ্যে দিনেও মার কাছে বসিয়া কীর্ত্তন করিতেন। মেয়েদের নিয়া যখন রাত্রিতে মা কীর্ত্তন করাইতেন, তখন সব পুরুষদের বাহির করিয়া দেওয়া হইত। আশ্রমের ফটক বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। শুধু বাহিরে ২।৪ জন পুরুষ মায়ের নির্ব্বাচন মত মাঠে বসিয়া থাকিতেন। মা সব কাজই এইরূপ সুশৃঙ্খলার সহিতই করিতেন। এতগুলি স্ত্রীলোক, (অল্পবয়স্কা মেয়েরাও আছে), মাঠের মধ্যে থাকিবে, তাই ২।৪ জন পুরুষ পাহারার মত বাহিরে মাঠে বসাইয়া রাখিতেন। এই ভাবে উৎসব শেষ হইল।

উৎসবের কিছু পূর্ব্বেই মার আদেশে বাবা ও আমি বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়া সিদ্ধেশ্বরীতে স্থান নিয়াছিলাম। সেই হইতেই বাবা বাড়ীতে আর প্রবেশ করেন নাই ; আমিও না। উৎসব হইয়া গিয়াছে। মন্দিরে, সন্ধ্যাবেলার আরতি দেখিতে মা অনেক সময় মেয়েদের নিয়া মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়াইতেন। ব্রহ্মচারীরাই ভোগ পাক করিতেন। এক এক দিন মা গিয়া ভোগ রাঁধিতে বসিতেন। নিয়ম হইল, সপ্তাহে দুই দিন খিচুড়ি ও তিন দিন তরকারি ও চাউল মিলাইয়া সিদ্ধ ভাত এবং দুই দিন পঞ্চতরকারি দিয়া ৺অন্নপূর্ণার ভোগ হইবে। নিয়ম মতই সব হইতে লাগিল। অটলদাদাও এই উৎসবে সস্ত্রীক আসিয়াছিলেন।

বাবার ও আমার গৃহবাস-ত্যাগের প্রারম্ভ।

———

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

উৎসবান্তে, ১৩৩৮ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে মার বাহির হইবার কথা হইতেছে। কয়েকদিন পরই মা ও ভোলানাথ বাজিতপুর হইয়া দার্জ্জিলিং যাইবেন স্থির হইল। সঙ্গে বাবা, জ্যোতিষদাদা, অটলদাদা (সস্ত্রীক) আরও ২।১ জন ও আমি যাইব। আমরা আশ্রম হইতে ষ্টেশনে যাইবার জন্য মোটরে উঠিয়াছি। এর মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কুশারী মহাশয়ের স্ত্রী, শ্রীযুক্ত যতীন মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী এবং আরও ২।১ জন স্ত্রীলোক মার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। কথায় কথায় তাঁহারাও ঐ এক বস্ত্রেই মার সঙ্গে মোটরে উঠিয়া বসিলেন; তাঁহারাও বাজিতপুর যাইবেন। এই পাগলামী দেখিয়া লোকে কি বলিবে বলিয়া, মা হাসিতে লাগিলেন। সঙ্গে অনেক লোক হইয়া গেল। আমরা প্রথম বাজিতপুর গেলাম। রাস্তায় যাইতে "শ্রীপুর" ষ্টেশন পড়ে। মা এখানে ভাসুরের কাছে থাকিতেন। বিবাহের পর শ্বশুরমহাশয় এক বছর ছিলেন, তার পর মারা যান। মা বিবাহের পর হইতে ৩।৪ বছর ভাসুরের কাছেই ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে। তিনি শ্রীপুরে ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন। ষ্টেশনের বাড়ী দেখাইয়া মা বলিলেন, "এই বাড়ীতে আমরা ছিলাম।" পুকুর দেখাইয়া বলিতেছেন, "এই পুকুরে স্নান করিয়াছি"—ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা ময়মনসিংহে কালীপদবাবুর বাসা হইয়া গেলাম। বাজিতপুরেও খুব ভিড় হইল। সেখানকার নায়েব সুরেনবাবুর বাসায় মা উঠিলেন। তাঁহাদের মুখে এবং অপরাপর অনেকের মুখেই, মা

ঢাকা ত্যাগ ও বাজিতপুর গমন।
(১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ।)

যাহা যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, বাজিতপুরের সেই সব ঘটনাগুলি পুনরায় শুনিতে পাইলাম। সুরেনবাবুর বাসার পাশেই মা পূর্ব্বে যে বাসায় থাকিতেন, সেই স্থানটি খালি পড়িয়া আছে। ঘর পড়িয়া গিয়াছে, ভিটা এখনও আছে। মার যে স্থানে বসিয়া ৫ মাস পর্য্যন্ত আসনাদি হইত, সেই স্থানের মাটি আনিয়া, রমণা আশ্রমের পঞ্চবটীর বেদীর ভিতর রাখা হইয়াছে। মা যে কাঁঠাল গাছটি পুতিয়াছিলেন, তাহাতে কাঁঠাল হইয়াছে। ভক্তেরা তাহা হইতে কাঁঠাল ২।১টি নিয়া আসিলেন। তাঁহাদের কাছে ঐ গাছের কাঁঠালও কত আদরের জিনিষ। মা যেখানে পাক করিতেন, সেই স্থানটিও দেখিলাম। যে মেয়েটি মার কাজ করিয়া দিত, তাহাকেও দেখাইলেন। মা যখন মৌন ছিলেন, এই মেয়েটি সেই অবস্থায় অতি সুন্দরভাবে সব কাজ করিয়া যাইত। আরও কত পুরাতন চিহ্ন দেখাইলেন। মা গিয়াছেন শুনিয়া, সকলেই মাকে দেখিতে আসিলেন। ২।৩ দিন সেখানে থাকা হইল। খুব আনন্দ করা হইল।

পরে আমরা আবার ময়মনসিংহে কালীপদবাবুর বাসায় আসিলাম। সেখান হইতে সঙ্গীরা অনেকে ঢাকায় চলিয়া গেলেন। আমরা মার সহিত দার্জ্জিলিং গেলাম। আমরা দার্জ্জিলিং গিয়া ষ্টেশনে বসিয়া আছি, কোথায় যাওয়া হইবে, ঠিক হয় নাই। এর মধ্যে বীরেন মহারাজ হঠাৎ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। তিনি মাকে তথায় দেখিয়া মহা আনন্দিত হইলেন এবং খুব আগ্রহের সহিত মাকে তাঁহার বাসায় নিয়া গেলেন। আমরা সেখানেই রহিলাম। একদিন খুব কীর্ত্তন হইল। ৪।৫ দিন দার্জ্জিলিং থাকিয়া আবার মা সকলকে নিয়া নামিয়া আসিলেন।

ময়মনসিংহ হইয়া দার্জ্জিলিং গমন। (১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ।)

কলিকাতার দিকে মা চলিলেন। রাস্তা হইতেই জ্যোতিষদাদা ও অটলদাদা ঢাকা চলিয়া গেলেন। আমরা মার সহিত কলিকাতায় গেলাম। বালিগঞ্জে যতীশদাদার বাসায় যাওয়া হইল। তথা হইতে প্রাণকুমারবাবুর আহ্বানে চুঁচুড়া যাওয়া হইল। যতীশদাদারাও অনেকেই সঙ্গে গেলেন। সেখানেও সকলে মাকে নিয়া কীর্ত্তনাদি করিয়া খুব আনন্দ করিলেন। প্রাণ-

দার্জ্জিলিং হইতে কলি-কাতা ও চুঁচুড়া হইয়া ৺নবদ্বীপে গমন। (১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ।)

কুমারবাবুর স্ত্রীর কোমর অবশ ছিল, পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। মা একদিন সকলকে নিয়া ৺গঙ্গায় স্নান করিতে গেলেন। ৺গঙ্গার ভিতর সাঁতার কাটিয়া সকলকে নিয়া স্নান করিতেছেন, অনেকে মাকে জলের মধ্যেই কোলে নিতেছেন, আবার মাকে জড়াইয়া মার কোলেই যাইতেছেন। এইভাবে কত খেলাই হইতেছে! প্রাণকুমারবাবুর স্ত্রীও মাকে কোনও মতে কোলে নিলেন এবং মার কোলে উঠিলেন। চুঁচুড়া হইতে গিরীন-দাদাদের বাড়ী নিকটেই। তিনি আসিয়া, তাহাদের বাড়ী "আগনা"তে মাকে ও অন্যান্য সকলকে নিয়া গেলেন। দুইদিন তথায় থাকিয়া, সকলে মার সহিত আবার চুঁচুড়া আসিলেন। ২।৩ দিন চুঁচুড়া থাকিয়া, পরে ৺নবদ্বীপ যাওয়া হইল। প্রাণকুমারবাবুর স্ত্রীও সঙ্গে গেলেন। কলিকাতার দলও সঙ্গেই ছিল। ৺নবদ্বীপ গিয়াও মা ৺সুরধুনীতে সকলকে নিয়া স্নান করিয়াছিলেন। সেই সময়ও মা প্রাণকুমারবাবুর স্ত্রীকে হাত ধরিয়া ধরিয়া জলের মধ্যেই হাঁটাইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "তুমি বারান্দার রেলিং ধরিয়া ধরিয়া অল্প অল্প হাঁটিতে চেষ্টা করিও। রোজ সকাল সন্ধ্যায় চেষ্টা করিও"। তারপর হইতে তিনি তাহাই করিতে লাগিলেন। সেই হইতেই আশ্চর্য্য ফল দেখা গেল। তিনি অল্প

প্রাণকুমারবাবুর স্ত্রীর আশ্চর্য্য রোগ-মুক্তি।

অল্প করিয়া ক্রমে বেশ হাঁটিতে পারিতেন। ভোলানাথও ইহাকে দুইবার (পাবনা ও অন্য এক স্থানে, ঠিক মনে নাই) মন্ত্র পড়িয়া ঝাড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি ৭।৮ বৎসরের ব্যাধি মুক্ত হইলেন। প্রায় ৯।১০ মাস পর কলিকাতায় গিয়া দেখিলাম, তিনি স্বাভাবিকভাবেই চলাফেরা করিতে পারেন।

ইতিপূর্ব্বে মা আরও তিনবার ৺নবদ্বীপ আসিয়াছিলেন। শেষবার আমাদের নিয়াই গিয়াছিলেন। মাত্র একদিন ছিলাম, বিশেষ কিছুই দেখা হয় নাই। এবার যতীশদাদারা আছেন। তাঁহারা ৺নবদ্বীপের অনেক জানেন, বড় বড় বৈষ্ণবদের সহিতও তাঁহাদের পরিচয় আছে। অনেক স্থান দেখা হইল। জ্ঞানদা'ও সঙ্গে ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রী৺সারদাদেবীর (৺রামকৃষ্ণদেবের স্ত্রীর) শিষ্য। ৺রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যা চিরকুমারী শ্রীশ্রীগৌরীমা তখন কয়েকটি মেয়ে নিয়া ৺নবদ্বীপে তাঁহার আশ্রমে ছিলেন। জ্ঞানদাদাকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করেন। জ্ঞানদাদা, মাকে এবং আমাদের সকলকে গৌরীমার কাছে নিয়া গেলেন। তিনি অতি বৃদ্ধা; মা তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ কৌতুক করিলেন। সেখান হইতে ৺রাধাশ্যামের মন্দির, যেখানে বহু স্ত্রীলোকেরা একত্র হইয়া নাম কীর্ত্তন করে, সে জায়গায় যাওয়া হইল। মা সেখানেও কিছুক্ষণ বসিয়া পুনরায় অন্যত্র চলিলেন। এইভাবে মন্দিরাদি ও পুরাতন স্থান সব দেখা হইল। সন্ধ্যায় "ললিতা সখীর" ওখানে যাওয়া হইল। তাঁর সহিতও যতীশদাদার পরিচয় আছে। স্থির হইল, রাত্রি ১২টায় তিনি কীর্ত্তন করিয়া মাকে শুনাইবেন। এক মন্দিরে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সেখান হইতে খাওয়া-দাওয়া করিয়া ললিতা সখীর তথায় গিয়া নাটমন্দিরে বসা হইল। রাত্রি ১২টায় তিনি সুন্দর কীর্ত্তন

৺নবদ্বীপে মন্দিরাদি দর্শন ও "ললিতা সখীর" কীর্ত্তন শ্রবণ।

করিলেন। যতীশদাদারাও সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন করিলেন। অনেক রাত্রি হইয়া গেল। মার আদেশানুযায়ী আমরা সেই রাত্রি সকলেই মার সহিত ঐ নাটমন্দিরেই শুইয়া রহিলাম। পরদিন মা সকলকে নিয়া ৺সুরধুনীতে স্নান করিলেন। এইদিনই প্রাণকুমারবাবুর স্ত্রীকে জলের মধ্যে হাঁটাইয়াছিলেন। বৈকালেও ৺সুরধুনীর তীরে বেড়াইতে গেলেন। সেখানে বসিয়া যতীশদাদার বড় মেয়ে "লতিকা" গান করিয়া শুনাইল। লতিকা গান ধরিল, "সুরধুনীর তীরে ও কে হরি বলে নেচে যায়" ইত্যাদি।

সম্ভবতঃ তার পরদিনই মা সকলকে নিয়া কলিকাতা রওনা হইলেন। কলিকাতা গিয়া যতীশ দাদাদের বাড়ীর দোতালার হলটিতেই মা থাকিলেন। সকলেই রাত্রিতে মাকে নিয়া সেই হলটিতেই শুইত। কীর্ত্তনাদি সেই ঘরেই হইত। একদিন ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয় প্রভৃতি অনেকে আসিবেন, কীর্ত্তনাদি হইবে, অনেকেই প্রসাদও নিবেন—এই সব ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহারা আসিলে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। অনেকদিন পর সেইদিন মার খুব ভাব হইল। মার এই অবস্থা। কাজেই সারাদিন অনেকেরই খাওয়া হইল না। সন্ধ্যার অনেক পরে মা কিছু প্রকৃতিস্থ হইলে ভোগ দেওয়া হইল। পরে সকলে প্রসাদ পাইলেন। হলটিতে মার ভাব হইয়াছিল বলিয়া, যতীশ দাদারা সেই ঘরটি মার ও অন্যান্য দেবদেবী এবং সাধু-মহাপুরুষদিগের ছবি দিয়া মন্দিরের মত সাজাইয়া রাখিয়াছেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় আরতি-কীর্ত্তন সেই ঘরেই হয়। কলিকাতাস্থ ভক্তেরা অনেকেই আসিয়া সেখানে মিলিত হন। কলিকাতা গিয়া দেখি, নির্ম্মলবাবু সপরিবারে এবং ৺কাশীর হরেন্দ্র ডাক্তার মহাশয়ের স্ত্রী, মার দর্শনে ৺কাশী হইতে আসিয়াছেন।

৺নবদ্বীপ হইতে কলিকাতায় আগমন ও যতীশ দাদার বাটীতে অবস্থান। (১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ।)

কয়েকদিন পরেই মা আমাদের নিয়া ৺পুরী চলিলেন। সঙ্গে নির্ম্মল বাবুও সপরিবারে চলিলেন। কাশীর হরেন্দ্র ডাক্তার মহাশয়ের স্ত্রীও মার সঙ্গে ৺পুরী চলিলেন। আমরা ৺পুরী গিয়া হরলালবাবুর বাসায় উঠিলাম। হরলাল-বাবু যতীশ দাদাদেরই কুটুম্ব। মা সকলকে নিয়া সেই বাসাতেই আছেন। একদিন মা সকলকে নিয়া ছাদে বসিয়া আছেন, হঠাৎ বলিলেন, "বিপদ আসিতেছে বলিলাম, তোমরা কি করিবা, কর দেখি?" সকলেরই ভয় হইল, কিন্তু করিবার কি আছে? কি বিপদ কেহই ত জানেন না। মা আর কিছুই বলিলেন না। কিন্তু মার ভাবে বুঝিলাম, এখানে যেন কি বিপদ হইবে।

৺পুরীধামে গমন ও হরলাল বাবুর বাসায় অবস্থান এবং নির্ম্মল-বাবুর পুত্র সন্তোষের আকস্মিক মৃত্যুর পূর্ব্বাভাস।

তখন রথযাত্রার বড় বেশী দেরী নাই। মন্দির তখন বন্ধ থাকে। দেবতা দর্শন করা যায় না। মা প্রায়ই সকলকে নিয়া সকালে বৈকালে সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে যাইতেন। অনেকক্ষণ সেখানেই কাটাইয়া আসিতেন। কোন কোন দিন হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-মন্দির কি অন্য কোন মন্দিরেও যাইতেন। ৺জগন্নাথ দেবের মন্দিরেও যাইয়া বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া আসেন।

৺পুরীধামে মন্দিরাদি দর্শন।

কয়েকদিন পর নির্ম্মল বাবুরা সকলেই চলিয়া আসিবেন, ভোলানাথের ইচ্ছায় আমরাও সেই সঙ্গে চলিয়া আসিব স্থির হইয়াছে। ৺পুরীতে মার সংবাদ পাইয়া অনেক লোকই মাকে দেখিতে আসিতেছেন। সকলেই এখন না যাইয়া রথযাত্রার পর যাইবার জন্য মাকে অনুরোধ করিতেছেন। মার আপত্তি নাই।

পুত্র সন্তোষকে ৺পুরী-ধামে রাখিয়া নির্ম্মল বাবুদের ৺কাশী গমন।

কিন্তু ভোলানাথ চলিয়া আসিতে চাহিতেছেন। আমাদের চলিয়া আসাই স্থির। যেদিন রওনা হওয়া হইবে, সেইদিন অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে বিছানায় বসিয়া ভোলানাথ মাকে বলিতেছেন, "দেখ, সকলে যখন রথযাত্রার পর যাইতে বলিতেছে, তাই যাওয়া যাইবে"। আমাদের আসা স্থগিত হইয়া গেল। কিন্তু নির্ম্মলবাবু প্রভৃতি সকলেই সেদিন ৺কাশী চলিয়া যাইবেন। ইতিমধ্যে নির্ম্মলবাবুর বড় ছেলে "সন্তোষ" কিছুতেই ৺কাশী যাইতে রাজী নয়। সে মার সহিত ঢাকা আশ্রমে গিয়া থাকিতে চাহিতেছে। ভোলানাথ রাজী হইলেন; মা কিন্তু কিছুই বলিতেছেন না। সন্তোষের বাবা ও মা তাহাকে শ্রীশ্রীমার কাছে রাখিয়া আসাই স্থির করিলেন। তাঁহাদের বিধবা একটি মাত্র মেয়ে "তরু"। স্থির হইল রথযাত্রা দেখিবার জন্য সেও থাকিবে; পরে তাহাকে কলিকাতা হইতে ৺কাশী পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। সকালবেলা মা গিয়া এক ঘড়ে পড়িয়া আছেন। এই থাকিবার কথা হওয়ায়, আমার মনটাও কেমন খারাপ হইয়া গেল। আমি মাকে গিয়া বলিলাম, "আবার থাকা ঠিক হইল কেন? তোমার ভাবে বুঝিতেছি, এখানে কোন বিপদ হইবে, এখান হইতে চলিয়া যাওয়াই ত ভাল ছিল"। মা বলিলেন, "সকলেই ত চলিয়া যাইতেছে, শুধু আমরা কয়জন মাত্র থাকিব"। আমি, মা, ভোলানাথ, বাবা ও মরণী থাকিবেন, পূর্ব্বে এই কথা ছিল। পরে যখন স্থির হইল, "তরু" ও "সন্তোষ" থাকিবে, তখন মা আমাকে বলিলেন, "উহারাও থাকিবে নাকি? বেশ, তোমরা দেখিয়া শুনিয়া রাখিও"। এই কথায় আমার কেমন খট্‌কা লাগিল। আমি বলিলাম, "তোমার ভরসায় রাখিয়া যাইতেছে, আমরা দেখিয়া রাখিব, এ কি কথা?" মা কিছু বলিলেন না। আমি সন্তোষের মাকে গিয়া বলিলাম, মা এ কথা বলিতেছেন। তিনি আসিয়া মাকে অনেক বলিলেন। পরে

মার হাতে ছেলেমেয়ের হাত দিয়া বলিয়া গেলেন, "তোমার হাতে দিয়া গেলাম"। মা একটু হাসিলেন মাত্র, বিশেষ কিছুই বলিলেন না। সকলেই চলিয়া গেলেন।

সন্তোষ সর্ব্বদাই মার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিত। নির্ম্মল বাবুরা রওনা হইয়া যাওয়ার ৮ দিন পর একদিন সকাল বেলা সমুদ্রের ধারে সকলে মার সহিত বেড়াইতে গিয়াছেন। তার পূর্ব্ব দিনই জ্যোতিষ দাদা ঢাকা হইতে কোনও কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা আসিয়া তথা হইতে মার দর্শনে ৺পুরী আসিয়াছেন। দুই দিন থাকিতে পারিবেন। সকলেই সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে গিয়াছেন। প্রায় ৮ টার সময় সকলে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। ভোলানাথ ৺বিমলা মার মন্দিরে চলিয়া গেলেন। মা একটু জল খাইয়া শুইয়া শুইয়া জ্যোতিষ দাদা প্রভৃতি সকলের সহিত কথা বলিতেছেন। সন্তোষও বেড়াইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তারপর তাহাকে দেখা না যাওয়ায় অনেককেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "সন্তোষ কোথায়"? তরু বলিল, "বোধ হয়, ভোলানাথের সঙ্গে মন্দিরে গিয়াছে"। সকলেই সেই বিশ্বাসে চুপ করিয়া গেলাম। ইতিমধ্যে মা চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছেন। বেলা প্রায় ১টা; তখন ভোলানাথ মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে সন্তোষকে না দেখিয়া, সকলেরই সন্তোষের জন্য চিন্তা হইল। সন্তোষের বাঁ দিক অবশ ছিল এবং মৃগীরোগ ছিল। মা-ও উঠিয়া বিছানাতেই বসিয়া আছেন। খোঁজ করিতে করিতে, বাড়ীতে পিছন দিকের কূয়ার মধ্যে সন্তোষের মৃতদেহ পাওয়া গেল। তখন সন্তোষের বয়স ২৭।২৮ বৎসর হইবে। এই অভাবনীয় ঘটনায় সকলেই মর্ম্মাহত হইয়া গেল। বাবা ও আরও ২।১ জন মিলিয়া মৃতদেহ উঠাইয়া

সন্তোষের আকস্মিক মৃত্যু। (১৩৩৮ সালের রথযাত্রার কিছু পূর্ব্বে।)

আনিলেন। ভোলানাথ এবং বাসাস্থ সকলেই অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মা স্থির, ধীর; একটুও ব্যস্ততা নাই। একবার উঠিয়া আসিয়া দেখিলেনও না। যেমন বসিয়া কথা বলিতেছিলেন, তেমনই কথা বলিতেছেন। বাপ, মা, মার কাছেই দিয়া গিয়াছিলেন, আজ ৯ দিন মাত্র তাঁহারা গিয়াছেন, এর মধ্যে এই ঘটনা; অথচ সেজন্য একটুও ভাবের পরিবর্ত্তন মার মুখে দেখা গেল না। মার সহিত দেখা করিতে আসিয়া, এই অবস্থা দেখিয়া, অনেকেই ফিরিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু পরে যখন শুনিলেন, মা উপস্থিত সকলের সহিতই পূর্ব্বের মত কথা বলিতেছেন, তখন সকলেই মার কাছে উপরে গেলেন। মা স্বাভাবিক ভাবেই সকলের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। বাড়ীতে এত বড় দুর্ঘটনা, অথচ তাঁর ভাবে মনে হইতেছে, যেন কিছুই হয় নাই। ৺বিজয় গোস্বামীর আশ্রম হইতে গোঁসাইজীর এক দৌহিত্র এবং শিষ্য মাখনবাবু এবং অন্যান্য কয়েকজন আসিয়া মৃতদেহ নিয়া গেলেন। ভোলানাথও গেলেন। উৎকল মাহাত্ম্যে লেখা আছে, "৺পুরীধামে যে ভাবেই মৃত্যু হউক, অপমৃত্যু বলা হয় না, শ্রাদ্ধাদি হইতে পারে। সেখানে অপমৃত্যু হইলেও বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়"। পণ্ডিতেরাও এই মত দিলেন। শব দাহ করা হইল।

অনেক রাত্রিতে সকলেই কিছু কিছু জল খাইয়া বিশ্রাম করিতেছেন। মা কিছুই খাইলেন না। এই দুর্ঘটনায় মার এই স্থির ভাব দেখিয়া তাঁহাকে পাষাণীই বলা যায়। কিন্তু আবার রাত্রিতে মার আর এক ভাব ফুটিয়া উঠিল। যখন সকলে শান্ত হইয়া শুইল, তখন মার কাছে আমি ও তরু বসিয়া আছি। তখন মা সন্তোষের কত কথাই বলিতে লাগিলেন। পূর্ব্বদিন রাত্রিতে মা সারা রাত্রি ছট্‌ফট্ করিয়াছিলেন; একটুও শুইতে পারেন নাই। পরে ঘর হইতে বারান্দায় আসিয়া

বসিয়াছিলেন। আবার একবার বলিয়াছিলেন, "সোমবার"। আমরা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু মার এই অবস্থা দেখিয়া-শুনিয়া, আশু কোনও বিপদের আশঙ্কা করিতেছিলাম। (পরদিনই সোমবার সন্তোষ মারা গেল)। তখন মার "সোমবার" কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। আজ মা আমাদের সহিত শুধু সন্তোষের কথাই বলিতে লাগিলেন। তখন দেখিলাম, মার হৃদয় যেন ভালবাসায় ভরা। কঠিন ও কোমলের সুন্দর সমন্বয় না থাকিলে, এত লোক আসিয়া "মা" বলিয়া কি চরণে পড়িতে পারে? সারা রাত এই ভাবেই গেল। ভোরে উঠিয়াই কূয়ার ধারে গিয়া, কি ভাবে পড়িতে পারে, তাহাই দেখিতেছেন। সন্তোষের শরীর ঐরূপ ছিল বলিয়া কখনও কূয়ার ধারে একা যাইত না। সেদিন বৃষ্টির মধ্যে কেন একা গিয়াছিল, কে জানে? মা ইহাও বলিলেন, যখন মা সেদিন সমুদ্র হইতে আসিয়া জল খাইয়া শুইলেন, কথা বলিতেছিলেন, হঠাৎ কে যেন গলা চাপিয়া ধরিল, শ্বাস বন্ধের মত হইয়া উঠিল, মা নিজের শরীরে এই ভাব হইতেই বুঝিয়াছিলেন, তখনই সন্তোষেরও জলে পড়িয়া শ্বাস বন্ধ হইতেছিল। মা চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিলেন। বলিলেন, "তখন কিছুই বলিতে পারিলাম না; আর তখন বলিলেও, জীবিত উঠান যাইত না। কূয়ায় পড়া মাত্রই প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছিল। যাহা হইবার তাহা হইবেই। পূর্ব্বে কিছুই বলিতে পারি না। মুখ দিয়া কিছু বাহির হয় না। কি করিয়া হইবে? নিয়তি যে পূর্ণ হওয়া চাই। আমি যে প্রথম হইতেই দেখিতেছিলাম, এইখানেই সন্তোষের মৃত্যু হইবার"।

উক্ত মৃত্যু সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমায়ের উক্তি।

এই ঘটনার পরেও মা বলিতেছিলেন, "এইখানে আর বেশী দেরী করিও না। রথ যাত্রার দিন রাত্রিতেই যেন রওনা হওয়া হয়"।

রথযাত্রা উপলক্ষে এবং মা আছেন এই জন্য, কলিকাতা হইতে যতীশ দাদা, তাঁহার মা ও স্ত্রীকে নিয়ে আসিয়াছেন। আরও ২।৪ জন আত্মীয়া সঙ্গে আছেন। ছেলেপিলেও আছে। রথযাত্রার দিন মা সকলকে নিয়া রথ দেখিতে গিয়া এক জায়গায় বসিয়া আছেন। কি জন্য জানিনা, সে দিন ঠাকুর রথে উঠিয়া বসিলেন বটে, কিন্তু রথ টানা হইল না। পরের দিন হইবে, স্থির হইল। যতীশ দাদার মা প্রভৃতি অনেকেরই ইচ্ছা, তুই দিন থাকিয়া রথ টানা প্রভৃতি দেখিয়া যান। কিন্তু মা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, রথের দিন রওনা হওয়া চাই। তাই আমরা ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। সেদিন রাত্রে সকলে বাসায় ফিরিলাম। সারাদিন খাওয়াও হয় নাই। বাবা তখনই খাইবার বন্দোবস্ত করিতে ষ্টেশনে গেলেন। সংবাদ আনিলেন, রাত্রিতে তখন আর কোন গাড়ী যাইবে না, পরদিন ভোরে একটা গাড়ী মোগলসরাইয়ের দিকে যাইবে। আমরা যতীশ দাদাদের বলিয়া রাজী করাইয়া, তখনই ষ্টেশনে সকলে চলিয়া আসিলাম। মার কথা মনে করিয়া, তাঁহারাও আর থাকিতে সাহস পাইলেন না। মা কিন্তু তখন আর কিছু বিশেষ বলিতেছেন না। সারারাত আমরা ষ্টেশনে বসিয়া রহিলাম।

৺পুরীধাম ত্যাগের আয়োজন।

ভোরের গাড়ীতে মোগলসরাই চলিলাম। কথা হইল, তথা হইতে তরুকে ৺কাশী পাঠাইয়া দিয়া, মা আমাদের নিয়া ৺বিন্ধ্যাচল চলিয়া যাইবেন। ৺পুরী হইতে জমসেদপুর যাওয়ার কথা হইতেছিল, কিন্তু তখন আর যাওয়া হইল না। ৺কাশীতে টেলিগ্রাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মোগলসরাইতে জিতেন দাদার স্ত্রী ও হরেন্দ্র ডাক্তার আসিয়াছিলেন। তরুকে তাঁহাদের সহিত ৺কাশী পাঠাইয়া, মা আমাদের

মোগলসরাই হইয়া ৺বিন্ধ্যাচল গমন।

নিয়া ৺বিন্ধ্যাচল চলিয়া গেলেন। যতীশ দাদারাও সকলেই ৺বিন্ধ্যাচলে মার সঙ্গেই গেলেন। মার সব দিকেই লক্ষ্য আছে। ৺কাশীর পণ্ডিতগণ এইভাবে মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া, শ্রাদ্ধের বিধি দিলেন না। ৺কাশীতে এই ভাবে মরিলে অপমৃত্যু বলিয়া শ্রাদ্ধ হইবে না তাহাতে পিতামাতার দুঃখ হইবে, শুধু এই জন্যই শ্রাদ্ধ করাইলেন তাহা নয়, বিধি আছে অথচ শ্রাদ্ধ হইল না এই কথায় পরে পিতা মাতার দুঃখ হইবে, তাই মা শ্রাদ্ধ যে শাস্ত্রমত হইতে পারে তাহার খবর আনাইবার জন্য পুরীতে চিঠি পত্রাদি লিখাইলেন। উৎকল মাহাত্ম্যে এইভাবে মৃত্যুরও শ্রাদ্ধবিধি আছে। তাই মা ৺বিন্ধ্যাচল হইতে ৺পুরীতে টেলিগ্রাম করাইয়া, পণ্ডিতদের মত আনাইয়া, ৺বিন্ধ্যাচল হইতে কাশীতে পুনঃ পুনঃ লোক পাঠাইয়াছিলেন। পরে স্থির হইল শ্রাদ্ধ হইবে। ৺কাশীর পণ্ডিতগণই ভাল ভাবেই শ্রাদ্ধাদি করাইলেন। তখন বরিশালের পুণ্যস্মৃতি স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের ভগিনী, কালাচাঁদ বাবুর বৃদ্ধা মাতা এবং ভাগিনেয় কালাচাঁদ বাবু, ৺বিন্ধ্যাচলের আশ্রমে, মার আদেশেই ছিলেন। তাঁহারা মাকে পাইয়া মহা আনন্দিত হইলেন। যতীশ দাদারাও সকলে আছেন। মরণীও এবার সঙ্গেই আছে।

কিছুদিন ৺বিন্ধ্যাচল থাকিয়া যতীশ দাদারা কলিকাতা ফিরিবেন, পথে ৺কাশীতে ৺বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া যাইবেন। মা-ও আমাদের নিয়া, সেই সঙ্গেই ৺কাশী চলিলেন। ঐ মৃত্যুর ১২ দিন পর, মা সন্তোষের পিতা-মাতার কাছে গেলেন। মাকে দেখিয়াই সন্তোষের মা আসিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। নির্ম্মলবাবু, স্থির ভাবেই একটু হাসি হাসি মুখে মাকে বলিলেন, "মা দুইটিকে

৺বিন্ধ্যাচল হইতে কাশীধাম গমন।

দিয়া আসিয়াছিলাম। একটিকে গ্রহণ করিয়াছ। আর একটিকে কেন ফিরাইয়া দিয়াছ"? মা বুঝিলেন, প্রাণের কত ব্যথা তিনি চাপিয়া হাসি হাসি মুখে এই কথা বলিতেছেন। মা তাঁহার দিকে চাহিয়া এমন করুণভাবে বলিতে লাগিলেন যে সন্তোষের মা কান্না বন্ধ করিয়া মাকেই শান্ত করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর মা ঠাণ্ডা হইলেন। পরে একদিন নির্ম্মলবাবু মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মা! তুমি সেদিন কেন কাঁদিয়াছিলে"? মা বলিয়াছিলেন, "তুমি যে কাঁদ নাই, তাই আমি কাঁদিয়া তোমার বুকের ব্যথা হাল্কা করিয়া দিলাম"। মা সন্তোষের মাকে অনেক সান্ত্বনা-বাক্য বলিলেন। মা ১৫ দিন সেই বাসায় রহিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই ১৫ দিন মার কৃপায়, সন্তোষের মা ও বাবা খুবই শান্ত ছিলেন। ইহাদের অত বড় পুত্র কয়েকদিন হইল মারা গিয়াছে, অথচ ইহাদের এই শান্ত ভাব দেখিয়া, সকলেই চমৎকৃত হইয়া যাইত। দিন রাত্রি মার কাছে লোক আসিতেছে, কীর্ত্তন হইতেছে; বাড়ীতে মহা উৎসব চলিল।

যতীশ দাদারা কলিকাতা চলিয়া যাইবার পর মা আবার আমাদের নিয়া ৺বিন্ধ্যাচলে গেলেন। এবার শঙ্করানন্দ স্বামীজী, মাণিক প্রভৃতিও সঙ্গে গেলেন। একদিন মা ৺বিন্ধ্যাচল আশ্রমের বারান্দায় বসিয়া আছেন, পাহাড়ে কয়েকটি ভদ্রলোক বেড়াইতে আসিয়া, একটি মিষ্টির পুঁটুলি ও জলের পাত্র আশ্রমের নিকট পাহাড়ের মধ্যে রাখিয়া, একটু দূরে গিয়াছেন। মা আমাকে বলিলেন, "ঐ সব নিয়া আস ত"। আমি নিয়া আসিলাম। সেই পুঁটুলি হইতে খুলিয়া একটু মিষ্টি মার নিজের মুখে দিয়া দিতে আমাকে মা বলিলেন। এই নিয়া আনন্দ

৺বিন্ধ্যাচলে পুনর্গমন এবং মীরজাপুরের উপেনবাবু ও কুলদাবাবুর প্রথম মাতৃ-সন্দর্শন।

হইতেছে, এর মধ্যেই সেই ভদ্রলোকেরা আসিয়া দেখেন, তাঁহাদের পুঁটুলিটি নাই। খোঁজ করিতেই আশ্রম হইতে একজন গিয়া তাঁহাদের ডাকিয়া আনিলেন। পরে এই সব কথা শুনিয়া তাঁহারাও খুব আনন্দ পাইলেন। মাকে প্রণাম করিয়া তাঁহারা তখন চলিয়া গেলেন।

পরদিনই আবার তাঁহারা মাকে দর্শন করিতে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাদের মধ্যে একজন ডাক্তার, নাম শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁহার স্ত্রীকেও নিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই মীরজাপুরে থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে অপর জন অবিবাহিত; নাম কুলদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তিনি সেই হইতেই ওখানে মার কাছে প্রায় সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ঢাকা এবং অন্যান্য স্থানেও তিনি মার দর্শনে গিয়াছেন। ৺বিন্ধ্যাচল হইতে একদিন উপেন্দ্রবাবু (ডাক্তার) মাকে মীরজাপুরে তাঁহার বাসায় নিয়া গেলেন। মীরজাপুরেই ৺গঙ্গার ধারে তাঁহার একটা বাগান বাড়ী আছে। সেখানেই মার থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন। মা আমাদের নিয়া দুইদিন তথায় থাকিয়া আবার ৺বিন্ধ্যাচল আসিলেন। নির্ম্মলবাবুও সপরিবারে আসিয়া কয়েকদিন ৺বিন্ধ্যাচলে মার কাছে থাকিয়া গেলেন। নির্ম্মলবাবুর বাহিরে কিছুই প্রকাশ না থাকিলেও, মা বুঝিতেছিলেন, ভিতরে তাঁহার খুব লাগিয়াছে। তাই মা তাঁহাদের ৺বিন্ধ্যাচলে আসিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহারা ৺কাশী চলিয়া গিয়াছেন; এবং ৺কাশীর শুধু শঙ্করানন্দ স্বামীই বিন্ধ্যাচলে রহিলেন।

একদিন রাত্রিতে মা বারান্দায় শুইয়া আছেন। অনেক রাত্রি হইয়াছে, সকলেই শুইয়াছেন। আমি শুধু মার কাছে বসিয়া আছি। এর মধ্যেই মার শরীরের পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল। অবস্থা দেখিয়া আমি সকলকে ডাকিলাম। সকলে ধরাধরি করিয়া মাকে ভিতরে

৺বিন্ধ্যাচলে শ্রীশ্রীমায়ের শরীরে অদ্ভুত ক্রিয়া প্রকাশ। —"দেবীর অষ্টাঙ্গ যোগ।"

নিয়া গেলাম। মার শরীরে অতি অদ্ভুত সব ক্রিয়া লক্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু মা স্থির ভাবে এক জায়গাতেই আছেন। যেন একটার পর একটা অবস্থা হইয়া যাইতেছে। কম্বলের উপর শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে; কম্বলের উপর আছেন। অস্থির ভাব মোটেই নয়; স্থির ভাবেই একটার পর একটা হইয়া গেল। পরে স্থির হইয়া রহিলেন। সকলেই নিঃশব্দে বসিয়া এই সব দেখিতেছেন, মার শরীর ধরিবারও আবশ্যক হয় নাই। কিছুক্ষণ পর ঐ অবস্থাতেই, চোখ বুজিয়াই মৃদুভাবে বলিলেন, "দেবীর অষ্টাঙ্গ যোগ"। আর কখনও এই ভাবে ক্রিয়া হওয়া বা এইভাবে বলা শুনি নাই। আমরা বুঝিলাম, ইহা অষ্টাঙ্গ যোগ, শরীরের মধ্যে হইয়া গেল। পরে মা চুপ করিয়া শুইয়া রহিলেন।

———

পঞ্চদশ অধ্যায়

কয়েকদিন পর মা আমাদের নিয়া ৺অযোধ্যা হইয়া ৺কাশী গেলেন। ৺অযোধ্যায় আমরা আর যাই নাই। মা ৺হরিদ্বার হইতে আশুকে নিয়া একবার ৺অযোধ্যা গিয়াছিলেন। কোথায় গিয়া মা বসিয়াছিলেন, আশু কোথায় ভাত পাক করিয়াছিল, সব মা আমাদের দেখাইলেন। ৺কাশী হইতে কলিকাতা হইয়া ঢাকা গেলাম।

৺বিন্ধ্যাচল হইতে ৺অযোধ্যা, ৺কাশী, এবং কলিকাতা হইয়া ঢাকায় গমন।

পিসিমা ও পিসেমশাই (কালীপ্রসন্নবাবু) চাঁদপুরে পুত্রের নিকট হইতে ঢাকা আশ্রমে মার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। পিসিমা আসিলেন। মা প্রায় রোজই তাঁহার সহিতই খাইতেন এবং খুব আনন্দ করিতেন। ধর্ম্মের ভাবটা তাঁহারও খুব প্রবল। নামে তাঁহার বেশ অবস্থা হয়। মার আদেশও তিনি যথাসাধ্য পালন করেন। তাঁহার হাতেই মা পৈতা নিয়াছিলেন, পূর্ব্বেই তাহা লেখা হইয়াছে। এবার আবার মা ও তিনি বসিয়া গল্প করিতেছেন। পিসিমার হাতে একটি ছোট বাঁশের লাঠি আছে। কোথায় হয়ত পাইয়াছেন; হাতেই আছে। কি কথায় কথায় সেই বংশদণ্ডটি তিনি আমাদের হাতে দিয়া বলিলেন, "এই নে তোর দণ্ড"। মা তাঁহাকে বলিলেন, "শীঘ্রই দণ্ড নিয়া, কুলদা যজ্ঞ করিতেছে, তাহার কাছে দিয়া, যজ্ঞের অগ্নি স্পর্শ করিয়া আনেন"। পিসিমা তাহাই করিলেন। পরে আনিয়া, মার হাতে দিলেন। মা তাহার মধ্যে নিজের পরিহিত রেশমের সাড়ী হইতে কিছু সুতা খুলিয়া দণ্ডের গায়ে জড়াইলেন। পরে দণ্ডটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "আজ

এই দণ্ডটি ছাড়িয়া কথা বলিও না"। খেলায় খেলায় সব হইতেছে। কিন্তু মার কথা আমরা খেলায় খেলায় বলিয়া উড়াইয়া দিই না। কারণ, জানি মা এইভাবেই কত বড় বড় কাজ করিয়া যাইতেছেন। আমি তাহাই করিলাম। রাত্রিতে বলিলেন, "এই দণ্ডটি কাপড়ে জড়াইয়া সিদ্ধেশ্বরীতেই উপরে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া দাও"। তাহাই করিলাম। পিসিমা দণ্ডটি দিয়াই বলিলেন, "এখন ব্রহ্মচারীর গেরুয়া বস্ত্র কই"? বেবী দিদি উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখন রোজই আশ্রমে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মা তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ব্রহ্মচারীর গেরুয়া বস্ত্র বেবী নিয়া আসিবে"। কয়েকদিন পরই বেবী দিদি একটি বস্ত্র গেরুয়া রং করিয়া নিয়া আসিলেন। মা নিজের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া, প্রথমে সেই বস্ত্রটি পরিয়া, কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। পরে আমাকে সেই কাপড়খানা দিয়া বলিলেন, "তুমি এই কাপড়খানা পরিয়া কিছুক্ষণ এই ঘরে বসিয়া জপ কর; পরে ছাড়িয়া রাখিয়া বাহির হইও"। তাহাই করিলাম। আর কেহই জানিল না। মা এই কাপড়খানাও রাখিয়া দিতে বলিলেন এবং ইহাও বলিলেন, "কেহ যেন দেখে না, মধ্যে মধ্যে এই কাপড়খানা পরিয়া রাত্রিতে জপাদি করিও"। এইভাবে এক খেলা খেলিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের হস্ত হইতে আমার "দণ্ড ও গেরুয়া বস্ত্র" প্রাপ্তি এবং তাহা গোপন রাখিবার আদেশ।

এদিকে মার গলায় সেই সোনার হার পৈতার মত আছে এবং পুরাণা পৈতাগুলি যাহা গলায় দিয়াছিলেন, তাহাও আছে। পাবনাতে হয়ত কেহ কেহ তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। মা পাবনা হইতে ঢাকা আসিবার পর, পাবনা হইতে জনৈকা ভদ্রমহিলা একটি পৈতা হাতে কাটিয়া, মাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। মা বলিলেন,

শ্রীশ্রীমায়ের জ্যোতিষ দাদাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ ও পরে নিজ হস্তে পৈতা দান।

"সবই নিজে নিজে হইয়া যাইতেছে, দেখিতেছি"। এই বলিয়া পৈতাটী গ্রন্থি দেওয়াইয়া নিজের গলায় দিলেন এবং পুরাণ পৈতাগুলি খুলিয়া রাখিলেন। কয়েকদিন পরই সেই সোনার হারটি জ্যোতিষদাদার পৈতা করিয়া দিলেন। সর্ব্বসাধারণে এই খবর জানিল না।

পূর্ব্বে একদিন শাহবাগে মা, জ্যোতিষদাদা ও নন্দু এক ঘরে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ মা বলিয়া উঠিলেন, "এই ঘরে আমরা তিন জন ব্রাহ্মণ আছি"। বৈদ্যবংশজাত জ্যোতিষদাদা সম্বন্ধেও মার ব্রাহ্মণ বলিয়া একটা ভাব তখন ভাসিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তখন আর কিছু হয় নাই। এখন মা তাঁর গলায় ঐ সোনার পৈতাটি দিয়া দিলেন। সম্ভবতঃ সেই হইতেই তাঁহাকে স্বপাক খাইতেও আদেশ দিলেন। অনেকদিন জ্যোতিষদাদা স্বপাক খাইয়াছেন। একদিন মা আমাকেও বলিয়াছিলেন, "জ্যোতিষের ভাবটা খুব ভাল, সংসারে আছে, সকলে ধরিতে পারে না"। এইভাবে মা পৈতার খেলা খেলিলেন। খেলায় গেলায় মা অনেক কাজই করিতেন।

আর একটি ঘটনা লিখিতেছি। ঢাকায় 'পণ্ডিত সা' বলিয়া একটি উকিল ছিলেন। তাঁর স্ত্রী 'শ্যামলা দেবী' মার কাছে আসা-যাওয়া করিতেন। তিনি বহু বৎসর মৌনী ছিলেন; খুব সাধনা করিতেন। বেশ অবস্থা হইত। মার কাছে আসিয়া সব বলিতেন। মাও তাঁকে নিয়া খুব আনন্দ করিতেন। একদিন তাঁর বাসায় মাকে নিলেন। আমি ও ভোলানাথ সঙ্গে গেলাম। তাঁর পূজার ঘর মাকে নিয়া দেখাইলেন। মা অনেকক্ষণ সেখানে বসিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার একটি কমণ্ডলু ছিল। মা তাহা দেখিয়া হাতে নিয়া বলিলেন, "খুকুনী, এই কমণ্ডলুটি আমাদের সঙ্গে নিয়া যাইও। আমি জল খাইব"। শ্যামলা দেবীও হাসিয়া রাজি হইলেন। কিন্তু আসিবার সময় কমণ্ডলুটি আনিতে ভুলিয়া গেলাম।

তখন মা উত্তমা কুটীরে থাকিতেন। বাবা বাসা হইতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যাইতেই, বাবাকে শ্যামলা দেবীর নিকট হইতে কমণ্ডলুটি নিয়া আসিতে মা পাঠাইয়া দিলেন। বাবা সেই বাসায় কখনও যান নাই। তাঁহাদের সহিত পরিচয়ও নাই। কারণ, পণ্ডিত মহাশয় কখনও মার কাছে আসেন নাই। মার আদেশে গিয়া কমণ্ডলুটি চাহিয়া আনিয়া মাকে দিলেন। মা কয়েকদিন সেই কমণ্ডলুতে জল খাইলেন। পরে কোথায় পড়িয়াছিল। এদিকে সেই কমণ্ডলুটি একদিন কি উৎসব উপলক্ষে সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল; তারপর আর কাহারও ঐটির খোঁজ নাই।

উকিল পণ্ডিত সা'র বাটী হইতে শ্রীশ্রীমায়ের কমণ্ডলু গ্রহণ।

কতকদিন পরে একদিন সিদ্ধেশ্বরীতে বসিয়া আমি পূজা করিতেছি, হঠাৎ কমণ্ডলুটির কথা আমার মনে হইল। বহুদিন আর কমণ্ডলুটির কথা কাহারও মনেই হয় নাই। আমি পূজা করিয়া উঠিয়া ৺কালীবাড়ীর ভৈরবীকে ঐটির কথা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছি; কারণ সেই আমাদের আশ্রমে ধূপ-বাতি দিত। আশ্চর্য্যের বিষয়, দরজায় গিয়া দাঁড়াইয়াছি, সেই সময় পুকুরে একটি লোক সাঁতরাইতেছিল, তাহার পায়ে কি লাগিল। সে উঠাইয়া দেখে, একটি কমণ্ডলু; কালো হইয়া গিয়াছে। কাহার জিজ্ঞাসা করিতেই, আমি তখন সেখানেই দাঁড়াইয়া আছি, দেখিয়াই চিনিলাম, মার সেই কমণ্ডলু। ভৈরবীকে আর জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, আমি কমণ্ডলুটি নিয়া আশ্রমে গিয়া মাকে সব বলিলাম। মা বলিলেন, "এইটি মাজিয়া জল ভরিয়া আমার বিছানার কাছে রাখিয়া দাও। আমি জল খাইবার জন্যই আনিয়াছিলাম"। তাহা করা হইল, পরে ঢাকনী তৈয়ার করা

শ্রীশ্রীমায়ের আমার বাবাকে সেই কমণ্ডলুটি প্রদান।

হইল। মা উহাতে দুই এক দিন জল খাইলেন। এর মধ্যে একদিন বাবা ও অন্যান্য কে আশ্রমের ঘরের ভিতর বসিয়া আছেন, মা বিছানায় শুইয়া কথা বলিতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বাবা বলিতেছেন, আমি "আল্‌গাভাবে জল খাইতে পারি না"; ইত্যাদি কি কথা হইতেই মা বলিলেন, "এই কমণ্ডলুটি নিয়া আল্‌গাভাবে জল খাইতে অভ্যাস কর"। এই বলিয়া কমণ্ডলুটি বাবাকে দিলেন। বাবা মার প্রদত্ত জিনিষ অতি শ্রদ্ধার সহিত নিলেন। সেই হইতে বাবা কমণ্ডলুতে জল খাইতে লাগিলেন। অসুবিধা হইলেও, মার আদেশ, তাই অভ্যাস করিতে লাগিলেন। তখন ইহা খেলায় খেলায় করিলেন। পরে ইহার পরিণতি আশ্চর্য্য প্রকার। কেন না, শেষে বাবাকে সন্ন্যাসী করিয়া কমণ্ডলুই ধরাইয়াছিলেন। এই ভাবেই মা খেলায় খেলায় কত কাজ করিয়া বসেন।

মা ঢাকাতেই আছেন। ৺দুর্গা পূজা আসিল। পূজার সময় নিশিবাবু মাকে নিজের বাড়ীতে (সামসিদ্ধি গ্রামে) নিয়েছেন। তথায় "সিদ্ধি মা" নামে এক মা আছেন। তাঁহার সহিত ঢাকাতে মার ২।৩ বার দেখা হইয়াছে। তাঁহার শ্বশুর বাড়ী "আটপাড়ায়"—ভোলানাথের বাটীর সন্নিকট। একদিন তথায় থাকিয়া মা ঢাকায় ফিরিয়াছেন। আবার ঢাকার এক ভক্ত (প্রমথ বাবু, উকিল) মাকে তাঁহাদের দেশের বাড়ীতে নিয়া গেলেন। বহু ভক্ত সঙ্গে গেলেন। খুব আনন্দ হইল। ইতিমধ্যে মাকে যোগেশবাবু (রায় বাহাদুর) আরও একবার নিজ বাড়ী "পাউলদিয়া"তে নিয়াছিলেন। কার্ত্তিক মাসে ৺কালী পূজার কিছু দিন পূর্ব্বেই মা আবার কক্সবাজার চলিলেন।* এবার ৺আদিনাথ

শ্রীশ্রীমায়ের কক্সবাজার গমন।

---

* ১৩৩৮ সনে কক্সবাজারে যাওয়ার সময় কুলদা দাদার রমণা আশ্রমে

ও ৺চন্দ্রনাথ দর্শন করিতে মটরী পিসিমা, দিদিমা প্রভৃতিও সঙ্গে চলিলেন। ঢাকার 'সাধনা,' 'বাসনা' দুই বোন মার কাছে সর্ব্বদাই কীর্ত্তনাদি করিত। এবার বড় বোন 'সাধনা'ও এই সঙ্গে চলিল। যতীশ গুহ এবং তার ছোট ভাই নিতীশও মার সঙ্গে চলিল। নেপালদাদাও এই সময়তে ছুটি নিয়া মার কাছে ঢাকাতে ছিলেন। তাঁহারও মার সঙ্গে কক্সবাজার যাওয়ার কথা ছিল; কিন্তু পীড়িত হইয়া পড়ায় তিনি যাইতে পারিলেন না। মা কক্সবাজার যাওয়ার পরই কুলদা দাদা গৃহত্যাগ করিয়া রমণা আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। মা সকলকে নিয়া প্রথমে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে অনাথের বড় ভাই উপেন্দ্রবাবুর বাসায় গেলেন। তথা হইতে কুমিল্লা জেলার সুলতানপুর গ্রামে মার মাতুলালয়ে যাওয়ার কথা হইল। কিন্তু পরে ঘটনাচক্রে তাহা হইয়া উঠিল না। মার ছোটমামা বড় পণ্ডিত ছিলেন; অবস্থাও ভাল ছিল। ছোটবেলায় প্রতি বছর ৺দুর্গা পূজায় মা মাতুলালয়ে যাইতেন। সেই সব গল্পও মা করিয়াছেন। মাতুলালয়ে ঠাকুর ঘরটি মার নাকি খুব ভাল লাগিত। সেখানকার ফুল ও চন্দনের গন্ধে মা নাকি খেলাধূলা ছাড়িয়া অনেক সময় সেখানে বসিয়া থাকিতেন। সিদ্ধেশ্বরীর পূজকগণ যেখানে থাকেন, সেই বাড়ীর ঠাকুর-ঘরেও মা নাকি মাতুলালয়ের ঠাকুরঘরে যেরূপ গন্ধ পাইতেন, সেইরূপ গন্ধ পাইয়াছিলেন। আর একদিন বাবা যে শ্রীশ্রীমাকে নিজ বাড়ীতে পূজা

আসিয়া থাকিবার কথা হইল। মা কক্সবাজার যাওয়ার পর তিনি গৃহত্যাগ করিয়া আশ্রমবাসী হইলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—তাই চাকুরী রাখিতে হইল। আশ্রম হইতে অফিসে যাইতেন, এবং অফিস হইতে আশ্রমেই ফিরিতেন। আর গৃহে যান নাই। ইনি অনেকদিন বাক্‌সংযম করিয়াছিলেন।

করিয়াছিলেন—যেদিনকার পূজায় বাবার বাহ্যপূজা শেষ হইল, এই কথা মা বলিয়াছিলেন—সেদিনকার পূজার দিনও মা বলিয়াছিলেন, "আজিকার এই পূজায়ও মামার বাড়ীর ঠাকুরঘরের যে গন্ধে আমি বসিয়া থাকিতাম, সেই গন্ধ পাইতেছি"। মা ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে আমাদের নিয়া চট্টগ্রাম হইয়া কক্সবাজার চলিয়া গেলেন।

এবারও আমরা গিয়া দীনবন্ধুবাবুর সমুদ্রের ধারের ছোট বাংলোতেই স্থান নিলাম। খাওয়া-দাওয়া দীনবন্ধুবাবুর বাড়ীতেই হইত। কক্সবাজার যাইয়া কয়েকদিন পরই মার জ্বর হইল। একটু বেলা হইলেই জ্বর আসিত; কয়েক ঘণ্টা খুব বেশী জ্বর থাকিত, আবার বৈকালের দিকে জ্বর কমিয়া যাইত; মা সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে আসিতেন, যাহা খাইবার খাইতেন। কিছুদিন এইভাবে চলিলে, ভোলানাথ ও দীনবন্ধুবাবু মাকে ঔষধ খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। মা বলিলেন, "উহারা (জ্বর) আসিয়াছে; কিছুদিন শরীরে খেলা করিয়া চলিয়া যাইবে। আচ্ছা, অমুক দিন (বার বা তারিখ আমার মনে নাই) পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, সেদিনও যদি জ্বর আসে, তবে তোমাদের কথা মত ঔষধ খাইব"। কিন্তু মা যে দিনের কথা বলিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে আর জ্বর হইল না। এবার কক্সবাজারে অনেকদিন থাকা হইল। দীনবন্ধুবাবুর পরিবারের সহিতও খুব মিশামিশি হইল। দীনবন্ধুবাবু মাকে মেয়ের ভাবে দেখিতেন। তিনি পূজা সন্ধ্যা কিছুই করিতেন না। মা তাঁহাকে গায়ত্রী পড়িতে বলিলেন, এবং বলিয়া দিলেন "তুমি গায়ত্রী পড়িলে তোমার এই মেয়েটার শরীর ভাল থাকিবে, ইহা মনে রাখিও"। সেই হইতে তিনি গায়ত্রী পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কক্সবাজারে অবস্থান।

একদিন একটি ঘটনা হইল। যতীশদাদা, দীনবন্ধুবাবুর বাসা হইতে খাওয়া দাওয়া করিয়া আসিয়া সমুদ্রের ধারের বাংলোয় বসিয়া আছেন। মা ও আমরা সকলেই দীনবন্ধুবাবুর বাসাতেই আছি। হঠাৎ যতীশদাদার মনে হইল, "আচ্ছা মা যদি এখন একা আসিয়া উপস্থিত হন, তবে বুঝি"। এই ভাবের একটা কথা মনে উঠিল; তিনি বসিয়া আছেন। মা ঐ বাড়ী হইতে একা আসেন না। দুই বাড়ীর মধ্যে ব্যবধান মন্দ নয়। রোজই

তথায় একটি বিচিত্র ঘটনা।

মাকে খাওয়াইয়া আমি খাইতে বসি; মা একটু অপেক্ষা করেন, আমার খাওয়া হইলেই মা আমাদের নিয়া চলিয়া আসেন। বাবাও রাস্তার ধারের বৈঠকখানায় খাওয়া দাওয়া করিয়া অপেক্ষা করেন। আসিবার সময় তাঁকেও ডাকিয়া নিয়া আসি। ভোলানাথও প্রায়ই এই সঙ্গেই আসেন। সেদিন মা আমাকে কি একটা কাজে অন্য ঘরে পাঠাইয়াছেন; ফিরিয়া আসিয়া দেখি, মা সেখানে নাই। সব বাড়ী খুঁজিয়া মাকে না পাইয়া, বৈঠকখানায় গিয়া দেখি, বাবা মার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। মা কোথায় গেলেন খুঁজিতেছি; বাংলোয় চলিয়া গিয়াছেন মনেই আসে নাই। কারণ মা কখনও এইভাবে একা আসেন না। কিন্তু আমাদের খুঁজিতে দেখিয়া একটি লোক বলিল, মা একা একা বাংলোর দিকে গিয়াছেন। আমরা তাড়াতাড়ি বাংলোয় আসিয়া দেখি, মা ও যতীশদাদা বসিয়া আছেন। মা হাসিতেছেন। যতীশদাদা তখন উক্ত ঘটনার কথা বলিলেন। তিনি বসিয়া বসিয়া ঐ কথা ভাবিতেছিলেন, হঠাৎ মা গিয়া একা তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়া হাসিতেছিলেন। তিনি ত চম্‌কিয়া উঠিয়া, তখনই পায়ের ধুলা মাথায় নিলেন। মা এই ভাবে তাঁহার সংশয় ভঞ্জন

করিলেন। কিন্তু আমাদের সংশয়-ভরা মন বিশ্বাস করিতে চাহে না। স্থিরভাবে বিশ্বাস রাখা অনেক সাধন সাপেক্ষ।

আর একবার কলিকাতায় থাকা কালে মা সালকিয়াতে পিসিমার বাসায় আছেন। একদিন বসিয়া কথা বলিতেছেন, হঠাৎ মুখ দিয়া "আঃ উঃ" ইত্যাদি যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দ ২।১ বার বাহির হইল। ; ২।৪ দিন পর খবর পাওয়া গেল কুলদা দাদার জামাইটির কলেরা হইয়াছে। মার যখন মুখ দিয়া ঐরূপ শব্দ বাহির হয়, তখন ঢাকায় জামাইটিও রোগের যন্ত্রণায় ঐরূপ করিতেছিল।

অন্যত্র অনুরূপ ২।৪টি ঘটনা। কক্সবাজার ত্যাগ।

এইরূপ ঘটনা আরও হইয়াছে। মা হয়ত মোটরে কোথায়ও যাইতেছেন, হঠাৎ ঐরূপ "আঃ" শব্দ হইল। মা দাঁত দিয়া জিব কাটিয়া একটু হাসিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিতেন, "আবার ঐরূপ শব্দ আরম্ভ হইল। আমি কি করিব? আমি ত ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না"। কয়েকদিনের মধ্যেই কাহারও অসুখের কি কোন বিপদের খবর পাওয়া যাইত। এইরূপ ভাবে মা মুখে কিছু না বলিলেও দূরের ঘটনা যে মা জানিতেছেন, তাহা শরীর দিয়াই প্রকাশ হইয়া যাইত। মধ্যে মধ্যে ২।১টি কথা বলিয়াও ফেলিতেন। এমনও হইত—কোথায়ও যাওয়ার কথা। সেখান হইতে লোক নিতে আসিবে; কবে আসিবে ঠিক নাই। সে সম্বন্ধে অনুমানে সকলে কিছু কথাবার্ত্তাও বলিতেছেন। মা চুপ করিয়া শুনিতেছেন; কি তাহাদের কথাতেই যোগ দিতেছেন। পরে হয়ত একা একা হাঁটিতেছেন, কি বিছানায় শুইয়া আছেন, হঠাৎ বলিলেন, "সোমবার" কি "৫ দিন"; এইরূপ একটা শব্দ করিলেন। কত কথাই আপন মনে বলেন, কেহ বড় লক্ষ্যও করিল না। শেষে দেখা গেল, মার মুখ দিয়া যে দিনের কথা বাহির হইয়াছিল, সেইদিনই লোক আসিল, কি তথায় রওনা

হওয়া হইল। তবে সব সময় এ সব হইত না। আর খেয়াল করিয়া সব সময় মিলাইয়াও দেখা হইত না। অনেকদিন পর হইলে ত আমরা ভুলিয়াই যাইতাম।

মার মুখ দিয়া যে কত রকমের শব্দ বাহির হইত, তাহার অন্ত নাই। এক এক দিন মা রাত্রিতে শুইয়া আছেন, হঠাৎ এত জোরে একটা কথা (২।১টি শব্দ) বাহির হইল, যে সকলের গাঢ় ঘুমও ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল। আমি অনেক সময় বেশী রাত্রিতে মার কাছে বসিয়া থাকায় ঐ শব্দ স্পষ্টভাবে শুনিয়াছি, কিন্তু কিছুই অর্থ বুঝি নাই। কখনও শব্দ করিয়া মা হয়ত চোখ মেলিয়া একটু দেখিলেন, কখনও এক ভাবেই চোখ বুজিয়া আছেন। এইরূপ ভাবে কখনও কখনও স্তবও বাহির হইতে থাকিত। শুইয়া আছেন, হয়ত ধীরে ধীরে স্তব সুরু হইল; পরে ঐ ভাবেই উঠিয়া আসন করিয়া বসিলেন। ক্রমশঃই উচ্চৈস্বরে স্তব বাহির হইতে থাকিত। পরে আবার ধীরে ধীরে কমিয়া আসিত।

রমণার আশ্রমে একদিন রাত্রিতে আপন মনে হাঁটিতেছেন; মন্দিরের দরজায় গিয়া বসিলেন। গভীর রাত্রি; বসিয়া বসিয়া মার স্তব আরম্ভ হইল। চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। শব্দ ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইল। আবার ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসিল। মা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। সারা রাত ঐ ভাবেই কাটিয়া গেল। পর দিন উঠিয়া বসিলেন। কত সময় যে এই ভাবেই কাটিয়া যাইত—ঠিক নাই। মার ভাবের অবস্থার কথা লিখিয়া শেষ করা যায় না, সম্ভবও নয়।

দিদিমা, যতীশদাদা প্রভৃতি কয়েকজন চলিয়া আসিলেন। আমরা বাকী কয় জন মাকে নিয়া থাকিলাম। ১।১½ মাস থাকার পর কক্সবাজার হইতে চলিয়া আসা হইল।

ষোড়শ অধ্যায়

প্রায় দেড় মাস কক্সবাজার থাকিয়া আমরা মার সহিত ৺আদিনাথ ও চট্টগ্রাম হইয়া ৺চন্দ্রনাথে আসিলাম। দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী কখনও বাহির হইতে পারেন নাই; এমন কি, বৃদ্ধা হইয়া গেলেন গঙ্গাস্নান পর্য্যন্ত করেন নাই; মার কাছে এই সব দুঃখ প্রকাশ করায়, মা দীনবন্ধুবাবুকে রাজি করাইয়া সপরিবারে মার সঙ্গে নিয়া আসিলেন। প্রথমে ৺চন্দ্রনাথ দর্শন করাইলেন।

৺আদিনাথ ও ৺চন্দ্রনাথ গমন।

পরে চাঁদপুর হইয়া কলিকাতা চলিলেন। এবার সঙ্গে অনেক লোক। তাই মা এবার সকলকে নিয়া সুরেশবাবুর বালিগঞ্জে একটা দোতালা বাড়ী খালি ছিল, তাহাতেই উঠিলেন। পরে অন্যান্য বাসায়ও গেলেন। ভোলানাথের ৺তারাপীঠ যাওয়ারও সময় আসিয়াছে। তাই মা সকলকে নিয়া ৺তারাপীঠে চলিলেন। এবার যতীশদাদারা সপরিবারে এবং কলিকাতা হইতে আরও অনেকেই মার সহিত ৺তারাপীঠে চলিলেন। পূর্ব্বের আদেশমত ভোলানাথ এক দিন মাত্র ৺তারাপীঠে থাকিবেন।

কলিকাতা ও ৺তারাপীঠ হইয়া ৺কাশীধামে গমন।

একদিন পরেই সকলে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলাম। কলিকাতাতে কয়েকদিন খুব আনন্দ চলিল। মা সকলের বাড়ী বাড়ী যাইতেছেন। কাকাবাবুর (কামিনীবাবু) বাসায়ও মা গেলেন। যেখানেই মা যাইতেছেন, ভক্তেরা সকলে সেখানেই একত্রিত হইতেছেন। এখন অনেক সময়েই মার অমৃতময়ী উপদেশবাণী সকলে বসিয়া

শুনিতেছেন। সন্ধ্যাবেলা যেখানেই মা থাকেন, কীর্ত্তন হয়। কিন্তু পূর্ব্বের মত কীর্ত্তনে মার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না। মা চুপ করিয়া বসিয়া কীর্ত্তন শোনেন। কখনও একটু ভাব হইলে, সকলে তাহা ধরিতে পারে না; মা নিজেই সামলাইয়া নিতেছেন। কিছু দিন কলিকাতা থাকিয়া দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রীকে ৺কাশী দেখাইবার উপলক্ষে, সঙ্গীয় সকলকে নিয়া মা ৺কাশী চলিলেন। কলিকাতা হইতে পিসিমাও আমাদের সঙ্গে চলিলেন। ৺কাশীতে কয়েকদিন থাকিয়া দর্শনাদি করা হইল।

পরে ৺বিন্ধ্যাচল চলিলেন। তুই দিন ৺বিন্ধ্যাচল থাকিয়া তথা হইতে জামসেদপুরে চলিলেন। এবার ৺কাশী হইতে মার সঙ্গে যোগেন রায় মহাশয় আসিলেন। জ্যোৎস্না রাত্রিতে বিন্ধ্যাচলের খোলা পাহাড়ে মাকে বসাইয়া রাত্রি প্রায় বারটা পর্য্যন্ত যোগেনবাবু খুব কীর্ত্তন করিলেন। ৫।৭ জন আমরা বসিয়াছিলাম। মাঝখানে মা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন; আমরাও চারিধারে—সকলেই নীরব। যোগেন্দ্র রায় মহাশয় মধুর কণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেছেন। স্থান, কাল, পাত্র সবই ভাগ্যক্রমে অনুকূল হওয়ায় আমরাও আনন্দে বিভোর হইয়া গিয়াছিলাম। অনেকদিন হইতেই জামসেদপুরের ভক্তেরা মাকে একবার দর্শন করিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইয়াছিল।

৺বিন্ধ্যাচল হইয়া জামসেদপুর গমন

মাকে পাইয়া তাহারা মহা-আনন্দে উৎসব আরম্ভ করিল। এ-বারও মা কৃষ্ণদাদার বাসাতেই উঠিলেন। সকলেই সেই বাসাতে মিলিতেন। তাঁহারা একদিন মাকে সকলের বাড়ী বাড়ী নিয়া গেলেন। প্রত্যেক বাড়ীতেই দেখিলাম, মার ছবি বসাইয়া পূজার আসন পাতা রহিয়াছে। সব বাড়ীতেই গিয়া দেখি, মার জন্য আসন

জামসেদপুরে শ্রীশ্রীমা।

পাতিয়া ফল-মিষ্টির ভোগ সাজাইয়া, গৃহকর্ত্রী মার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। যাহাতে এই অল্প সময়ের মধ্যেই সব বাসাতেই মার পায়ের ধূলা পড়িতে পারে, সেই জন্য পূর্ব্ব হইতেই নিজেরা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া নিয়াছিল। সেই অনুসারে মাকে সব বাড়ীতেই ঐ সময়ের মধ্যেই ঘুরাইয়া আনিলেন। মা ২।৩ দিন মাত্র ওখানে রহিলেন। কীর্ত্তনও খুব হইল।

বাংলা দেশের মেয়েরা নিজেদের সৌভাগ্য বজায় রাখিবার কামনায় মাকে সকলেই মাছ খাওয়াইতে চাহিতেন। প্রথম প্রথম ২।১ বাড়ীতে মা একটু একটু খাইতেন। কিন্তু পরে যে যে বাড়ীতে যাইতেন, তথায় মা মাছ মুখেই নিতে চাহিতেন না। আমিও সামান্য একটু তাঁহার মুখে দিয়া দিতাম। এই ভাবেই সামঞ্জস্য বজায় রাখা হইতেছিল। কিন্তু আমি বুঝিতাম, সব বাড়ীতেই মাছের তরকারি বেশী হইত; অথচ মাকে সামান্য একটু একবার তাহা হইতে মুখে দিয়া দেওয়াতে কাহারও তৃপ্তি হইত না; আমি মার ইচ্ছানুসারেই ঐরূপ করিতাম।

একদিন জামসেদপুরে ভোলানাথ এবং অন্যান্য সকলে বলায়, আমি মাকে মাছ এবং ভাত একটু বেশী খাওয়াইয়াছিলাম। মা ভাতও খুবই কম খাইতেন; আমিও সেইরূপই খাওয়াইতাম। কিন্তু সেদিন একটু বেশী খাওয়ান হইল। মুখ ধুইয়া আসিয়াই মা আমাকে বলিলেন,

জামসেদপুরে অবস্থান।

"আজ সবই একটু বেশী খাওয়াইয়াছ না?" আমি বলিলাম, "আমি ঐরূপ সামান্য একটু একটু করিয়া তোমার মুখে দেই, তাহাতে সকলেই দুঃখিত হয়। তাহারা এত যোগাড় করে, তুমি কিছুই খাও না, সকলে ত জানে না, তাহারা মনে করে, আমি দেই না বলিয়াই তুমি খাও না, দিলেই হয়ত তুমি আরও একটু খাও। এই সব ভাবিয়া আজ একটু বেশী

দিয়াছি"। অমনি মা গম্ভীরভাবেই বলিলেন, "তুমি সর্ব্বদা খাওয়াইয়া দেও, তুমি জান, আমি কি খাই। এত নিন্দা-প্রশংসার দিকে না দেখিয়া, নিজের কাজ নিয়মিতভাবে করিয়া যাওয়াই তোমার উচিত। বাহিরের দিকে এত দেখিলে, কখনও নিজের কাজে লক্ষ্য থাকে না। আজ বেশী খাইয়া আমার শরীর কেমন করিতেছে"। বুঝিলাম, মার কথাই ঠিক। আমি খুব অনুতপ্ত হইলাম। দেখিলাম, বাহিরের দিকে লক্ষ্য করিয়া মার সেবার ত্রুটি করিয়াছি।

তথা হইতে কলি-কাতা গমন।

২।৩ দিন জামসেদপুর থাকিয়া মা সকলকে নিয়া কলিকাতা রওনা হইলেন। ষ্টেশনে যাইবেন, রাত্রিতে বোধ হয় গাড়ী ছাড়িবে। ৫।৭ খানা মোটর করা হইয়াছে, তবুও কুলায় না। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই মার সহিত ষ্টেশনে যাইবার জন্য প্রস্তুত। গাড়ীতে জায়গা হয় না, গাড়ী হইতে অনেক লোক নামাইয়া দেওয়া হইতেছে। রাত্রিতে তখন আর গাড়ী আনাইবারও সময় নাই। মার মোটরখানা যখন ছাড়িয়া দিল, তখন যাহারা আসিতে পারিল না, তাহাদের যে ব্যাকুলতা, সেই দৃশ্য আজও মনে হইলে, একটা বেদনামিশ্রিত আনন্দ অনুভব করি। কত অল্প দিনে, মার জন্য ইহাদের এই ব্যাকুলতা! মা সকলকে নিয়া কলিকাতা আসিলেন।

ঢাকায় শ্রীশ্রীমা।

২।১ দিনের মধ্যেই দীনবন্ধুবাবু প্রভৃতি সকলকে নিয়া ঢাকায় পৌছিলেন। কলিকাতায় সকলকে কাঁদাইয়া আবার ঢাকায় আসিলেন, তথায় সকলকে আনন্দ দিতে লাগিলেন। সম্ভবতঃ তখন মাঘ মাস। মা রমণার আশ্রমেই আছেন।

এই সময়েই অর্থাৎ উৎসবের কিছুদিন পূর্ব্বে একদিন মার জন্য একটি নূতন মশারি তৈয়ার করিয়া আনিয়াছি। সকাল বেলা আমি গিয়াছি,

জ্যোতিষদাদাও আছেন, মা হঠাৎ নিজের কুটিরে গিয়া নূতন মশারি ফেলিয়া দিতে বলিলেন। ফেলিয়া দেওয়ার পর, মা সেই মশারির মধ্যে গিয়া বসিলেন এবং আমাকে ও জ্যোতিষ দাদাকে তাহার ভিতর যাইতে বলিলেন। আমরা গেলাম। তখন মা আমাদের দুই জনকে নিজের কোলে শোয়াইয়া রাখিলেন। বলিলেন, "তোমরা ভাই-বোন"। দরজা বন্ধ করিয়া নিয়াছিলেন। খানিক পরে উঠিয়া গেলেন। কত ভাবে কত লীলা করিয়াছেন, সীমা নাই।

জ্যোতিষদাদা ও আমি, ভাই-বোন।

আমি ও বাবা সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমেই মার আদেশে আছি। প্রতিদিন ভোরে উঠিয়া আমি মার কাছে আসি। জ্যোতিষদাদা মাকে নিয়া ভোরে বেড়াইয়া আসেন। আমি আসিলে কিছু পরেই তিনি বাসায় চলিয়া যান। বাবা শ্রীশ্রীমার আদেশমত সিদ্ধেশ্বরী আসনের কাছেই বেশী সময় বসিয়া থাকেন। ভোরে উঠিয়াই পুকুরে স্নান করিয়া বসেন, দুপুরে উঠিয়া একটু জল খাইয়া আবার বসেন; প্রায় ৬টার সময় রমণার আশ্রমে গিয়া, মার প্রসাদ যাহা থাকে, তাহাই গ্রহণ করেন। পরে রাত্রি ৯টা কি ১০টা পর্য্যন্ত মার কাছে থাকিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়াই সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে আসেন। আবার কাজ করিতে বসেন; রাত্রি ১২টা, ১টা পর্য্যন্ত বসিয়াই থাকেন।

বাবার বিচিত্র দর্শন।

একদিন এই বসা অবস্থায় বাবা পরিষ্কার দেখিতেছেন, শ্রীশ্রীমা যেন (রমণার আশ্রমে) নিজের কুটির হইতে উঠিয়া বাহিরে গেলেন, আবার শুইয়া পড়িলেন। রাত্রি প্রায় ১২টায় ইহা দেখেন। সেই দিন মা সন্ধ্যা হইতেই ভাব অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। বাবা পর দিন আসিয়া ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ঠিকই মা রাত্রি

১২টার সময় একবার উঠিয়া বাহিরে গিয়াছিলেন, পরে আসিয়া আবার শুইয়া পড়িয়াছিলেন। বাবা একদিন বলিতেছেন, "মাকে দেখিবার পর হইতে কোন স্থানে প্রণাম করিতে গেলেই আমি অনুভব করিতাম, মায়ের পা-তুখানিতেই যেন আমার মস্তক স্পর্শ হইল"।

বাবা কোন কোন দিন সারা রাত্রিই বসিয়া থাকেন। ভোর বেলায় আসিয়া বিছানায় একটু বিশ্রাম করিয়া, আবার উঠিয়া পড়েন।

বাবার সাধন-পথে ক্রমোন্নতি।

শ্রীশ্রীমার নির্দ্দেশমত শ্বাসের ক্রিয়াদি করিতেছেন। মা সকলকে এক ভাবেই উপদেশ করেন না। যিনি যেমন অধিকারী, তাঁহাকে সেই ভাবেই উপদেশ দেন।

জ্যোতিষদাদা খুব বিচারের পক্ষপাতী। শাহবাগ হইতেই দেখিতেছি, যখন মায়ের নিকট কেহ নাই দেখেন, তিনি আসিয়া মার চরণে

জ্যোতিষদাদার উত্তরোত্তর অধিক মাতৃ-সঙ্গ।

উপস্থিত হন। তাঁহার সঙ্গে মা সেই ভাবেই নানা কথা বলেন। অনেকদিন তিনি সকলে চলিয়া যাইবার পর, রাত্রি ১১টা কি ১২টায় মার কাছে আসিয়া রাত্রি কাটাইয়া যাইতেন। কোন দিন হয়ত রাত্রিতে মার সিদ্ধেশ্বরী যাওয়ার খেয়াল হইত (তখন আমরা সিদ্ধেশ্বরী থাকিতাম না, ঘর তালা বন্ধ থাকিত), তখনই ভোলানাথকে নিয়া গাড়ী করিয়া সিদ্ধেশ্বরী চলিয়া যাইতেন। সেই সময় কোন কোন দিন জ্যোতিষদাদাকেও বাসা হইতে নিয়া যাইতেন। কখনও মার সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হইত, কখনও বা মা হয়ত গিয়া পড়িয়াই আছেন, তিনি পায়ের কাছে বসিয়া রাত্রি কাটাইয়া আসিতেন। এই ভাবে এক এক জনকে অধিকারী হিসাবে

শিক্ষা দিতেছেন। কাহারও খবর কেহ বড় জানে না। মা বলেন, "যার যার কথা তার তার কাছেই রাখিও।"

সিদ্ধেশ্বরীর আশ্রম ও রমণার আশ্রমের স্থান সম্বন্ধে মা বলিয়াছেন, "এই স্থানগুলি সাধনের পক্ষে খুব উপযোগী"। কিন্তু স্থানগুলি সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত বিশেষ বিবরণ কিছুই বলেন নাই। মা যখন এই স্থানগুলি নিতে বলিয়াছিলেন, তখন পর্য্যন্ত এই সব স্থানের কোন খবরই কাহারও জানা ছিল না। পরে জানা গেল, এই সব স্থানে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী কঠোর তপস্যা করিয়া গিয়াছেন। রমণার ৺কালী মন্দির অনেক পরে হইয়াছে; পূর্ব্বে এই আশ্রমের স্থানটাতেই ৺দুর্গাবাড়ী ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব ইতিহাস ছাড়াও মা প্রসঙ্গক্রমে নিজেই বলিয়াছেন, এখানে অনেক তপস্বী কঠোর তপস্যা করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকজনকে মা (সূক্ষ্ম শরীরে) দেখিয়াছেন।

সিদ্ধেশ্বরী ও রমণা আশ্রমের স্থানের কথা।

ইতিমধ্যে ঢাকার গেণ্ডারিয়ার অবনী দত্ত মহাশয়ের পত্নী মার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। তিনি সংসারে থাকিয়াই বেশ সাধন ভজন করিতেছিলেন। তাঁহার খুব গুরুভক্তি। মার কথা শুনিয়া মাকে দেখিতে আসিয়াছেন। প্রথম দেখিয়াই খুব ভাল লাগিয়াছে। তাই তিনি আর বড় আসিতেন না, পাছে মার আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে গুরু হইতে মার উপরই ভালবাসা বেশী হইয়া যায়। কিন্তু আবার থাকিতেও পারিতেন না। বাসায় মার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেন। বাধ্য হইয়া আশ্রমে আসিতে হইত। এই সব কথা নিয়া মার সঙ্গে খুব আনন্দ হইত।

অবনী দত্ত মহাশয়ের স্ত্রীর কথা।

এক বার তাঁহার গুরুদেব ঢাকায় আসিলে, তিনি মার কথা সব তাঁহাকে বলিলেন। মার উপর যে টান হইয়াছে, তাহাও বলিলেন। মার কাছে যাইবেন কিনা, গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। গুরু বলিলেন, "সবই ত এক, তোমার যাইতে ইচ্ছা হয়, যাইও"। অনুমতি পাইবার পর তিনি সর্ব্বদাই আসিতেন। নিজের সুন্দর অবস্থার কথা মাকে বলিতেন। তাঁর একটি মাত্র ছেলে। দেশের কাজে জেলখানায় আবদ্ধ। একটি মাত্র মেয়ে; বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মা জ্যোতিষদাদাকে তাঁর 'ধর্ম্মপুত্র' করিয়া দিলেন। অটলদাদাকে বেবী দিদির 'ধর্ম্মপুত্র' করিয়া দিয়াছেন। বলিয়া দিয়াছেন, তোমরা পরস্পর পরস্পরের কার্য্যের সহায়তা করিবে।

নূতন নূতন ভক্ত সমাগম।

অনেক নূতন নূতন লোকও মার চরণে আসিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যতীনবাবু, গণেশবাবু, অমূল্যবাবু, শচীনবাবু, প্রভাতবাবু প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় প্রত্যহই সপরিবারে মার চরণ দর্শন করিতে আসেন। উকিলদের মধ্যেও অনেকেই আসেন। প্রমথবাবু, অবনীবাবু, রাধিকাবাবু প্রভৃতি সকলে প্রায় রোজই আসেন। দিন দিনই লোক বাড়িতেছে। মা ঢাকাতে আজকাল বেশী থাকেন না। তাই আশ্রমে মা আসিলেই লোকের খুব ভিড় হইয়া পড়ে। কেহ কেহ, প্রায় সকলে চলিয়া গেলে, রাত্রিতে মার কাছে নিরিবিলিতে গিয়া কিছু সময় কাটাইয়া আসেন। গণেশবাবু ও তাঁহার স্ত্রী বৈকালে আসিয়া একবার মাকে দেখিয়া যাইতেন; আবার একটু বেশী রাত্রিতে মার কাছে আসিয়া বসিতেন। তখন মার সঙ্গে একান্তে কথা বলিবার সুযোগ পাইতেন। দীনবন্ধুবাবু সপরিবারে ঢাকায় আসিয়া ২।৪ দিন থাকিয়া চলিয়া গেলেন।

মাঘ মাসে অতুল ঠাকুর মহাশয় আশ্রমে ৺সরস্বতী পূজা করিলেন। বিনয়বাবু তাঁহার মৃতা কন্যা "উমা"র স্মৃতিরক্ষার্থে যে নূতন কীর্ত্তনের ঘর করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই পূজা হইল। পরে ফাল্গুন মাসে সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে অতুল ঠাকুর মহাশয় ৺শিবরাত্রির দিন ৺শিবপূজা করিলেন। সারা রাত্রি বসিয়া প্রহরে প্রহরে পূজা করিলেন। বেবী দিদি, সত্যবাবুর স্ত্রী প্রভৃতিও সারা রাত্রি সেখানে পূজা করিলেন। খুব আনন্দ চলিতেছে।

১৩৩৮ সনের দোলপূর্ণিমার দিন রাজেন্দ্র কুশারী মহাশয়ের স্ত্রীর আগ্রহে মা সব স্ত্রীলোকদের নিয়া দোল খেলিলেন। সেদিন মহা আনন্দ। সকলে মার গায়ে রং দিতেছেন। মাও মধ্যে মধ্যে সকলের গায়ে পিচ্‌কারী দিয়া রং দিতেছেন। আবিরে এবং রং-এ সকলেই লাল হইয়া গিয়াছেন। দুপুরবেলা মা সকলকে নিয়া পুষ্করিণীতে স্নান করিতে নামিলেন। বহুক্ষণ জলে খেলা হইল।

১৩৩৮ সনে শ্রীশ্রীমায়ের দোল লীলা।

এদিকে ভোগ রান্নাও হইতেছে। মার আদেশে বেলুর মাকে (রাজেন্দ্রবাবুর স্ত্রী), "হোলির রাজা" করা হইল। কারণ, তাঁহার আগ্রহেই এই খেলা হইল। মা সকলকে নিয়া স্নান করিয়া আসিয়া, কীর্ত্তনের ঘরে বসিয়াছেন। চন্দন ঘষিয়া আনিতে বলিলেন। চন্দন আসিলে সকলের কপালে চন্দন দিয়া দিলেন। পরে সকলকে নিয়া খাইতে বসিলেন। সকালবেলা হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত এই দোললীলা উৎসব চলিল। পরে স্ত্রীলোকেরা মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় নিলেন।

চৈত্র মাসে মা রাজসাহী রওনা হইলেন। দীনেশবাবু (মুন্সেফ) তখন ময়মনসিংহ ছিলেন। তিনি হঠাৎ অবশ হইয়া পড়িয়াছেন।

তাঁহার স্ত্রী ও মেয়েদের অনুরোধে মা যাওয়ার সময় ময়মনসিংহ হইয়া যাইবেন স্থির হইয়াছে। এবার মাখন (শ্রীশ্রীমায়ের ছোট ভাই) ও বেলুর মা সঙ্গে চলিল। আমরা মার সহিত ময়মনসিংহ গিয়া ২।৩ দিন থাকিয়া রাজসাহী চলিলাম। মরণীও সঙ্গে ছিল। রাস্তা হইতে মরণী, বাবা ও আমি শ্রীশ্রীমার আদেশে কলিকাতা চলিয়া গেলাম। মা ও ভোলানাথ, মাখন ও বেলুর মাকে নিয়া রাজসাহী গেলেন। ২।৩ দিন তথায় থাকিয়া কলিকাতায় কাকাবাবুর, (ভোলানাথের ভ্রাতা, কামিনীবাবুর) বাসায় আসিলেন।

ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ ও রাজসাহী হইয়া কলিকাতায় গমন। (১৩৩৮, চৈত্র)

১৩৩৯ সনের ১লা বৈশাখ কলিকাতায় পিসিমার বাড়ী সেখানেও মা ভোগে গেলেন। সেখানেও অনেক আনন্দ হইল। একটি মুসলমান ভদ্রলোক মাকে কয়লা খাওয়াইয়া দিলেন। মার গলার একছড়া মালা ১লা বৈশাখ শ্রীশ্রীমা বাবাকে দিলেন। বাবা আজও তাহা যত্নের সহিত রাখিয়া দিয়াছেন। এদিকে শ্রীরামপুর হইতে গোবর্দ্ধনের মা, কলিকাতায় মা আসিয়াছেন খবর পাইয়া উপস্থিত; কিন্তু মা কোথায় আছেন জানেন না। ভক্তদের বাড়ী বাড়ী রৌদ্রের মধ্যে খুঁজিতে খুঁজিতে রাস্তায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন। পরে অনেক কষ্টে সুরেশবাবুর বাড়ীতে আসিয়া মার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। মা তখনও পিসিমার বাসা হইতে ফিরেন নাই। এই সুরেশ বাবু ও তাঁর স্ত্রী মার খুব ভক্ত। দুই জনে মার কাছে গিয়া নীরবে দূরে বসিয়া, শুধু মার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকেন। তাঁদের

কলিকাতায় অবস্থান এবং শ্রীরামপুরের গোবর্দ্ধন ও তাহার মাতার কথা। (১৩৩৯, বৈশাখ)

কোন প্রশ্ন কি কোন প্রার্থনা নাই ; দেখিয়াই তৃপ্ত। মধ্যে মধ্যে নিজেদের বাসায় নিয়া ভোগ দেন।

একদিন ঘটনা হইল, সুরেশবাবুর বাসায় মার যাওয়ার কথা ছিল। তাঁর স্ত্রী সেই আশায় সকালবেলা হইতে সব পরিষ্কার করিয়া মার জন্য ভোগ রাঁধিয়া নিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে আর যাওয়া হয় নাই। মা কাকাবাবুর বাসায় বসিয়া আছেন ; অসম্ভব ভীড়। হঠাৎ সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে, মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবাকে বল, একখানা গাড়ী নিয়া আসিয়া আমাকে একবার সুরেশবাবুর বাসায় নিয়া যায়, তারা হয়ত আমার জন্য বসিয়া আছে"। বাবা তখনই একখানা মোটরে মাকে নিয়া সুরেশবাবুর বাসায় গেলেন। গিয়া দেখি, সত্যিই তাঁহারা খান নাই; বসিয়া আছেন। তাঁহার স্ত্রীর বিশ্বাস, "মা একবার নিশ্চয়ই আসিবেন, মা আসিলে তাঁকে কিছু মুখে দিয়া প্রসাদ পাইব" —এই ভরসায় বসিয়া আছেন। অন্তর্য্যামিনী মা গিয়া উপস্থিত ; মাকে পাইয়া কি আনন্দ! মাকে একটু খাওয়াইয়া দিলেন, পরে সকলেই প্রসাদ পাইলেন।

শ্রীশ্রীমা অন্তর্য্যামিনী।

এদিকে গোবর্দ্ধনের মাও অনেক চেষ্টার পর মার দর্শন পাইলেন। এই গোবর্দ্ধনের মার সঙ্গে মার যখন প্রথম দেখা হয়, সেও এক সুন্দর ঘটনা। একবার কি একটা ষ্টেশনে ওয়েটিংরুমে মা গিয়া ঢুকিয়া দেখেন, বসিবার জায়গা নাই। সেই ঘরে গোবর্দ্ধনের মাও বসিয়াছিলেন। মা গিয়া দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া গোবর্দ্ধনের মা বলিলেন, "বস না"। মা তাঁহার দিকেই গিয়া বলিলেন, "কোথায় বসিব ? জায়গা ত নাই"। তিনি মার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "জায়গা নেই ? তবে আমার

গোবর্দ্ধনের মায়ের সহিত শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম পরিচয়ের বিবরণ।

কোলেই বস"। মা অমনি দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ গিয়া তাঁহার কোলের মধ্যে বসিয়া পড়িলেন। তিনিও জড়াইয়া কোলে নিলেন। সকলেই এই ঘটনা দেখিয়া মাকে "পাগল" স্থির করিল। কারণ, মাথা খারাপ না হইলে কি কোন ভদ্রমহিলা গিয়া এইভাবে কোনও অপরিচিতা ভদ্রমহিলার কোলে বসিতে পারেন? একটু পরেই গাড়ী আসিল। মা এবং গোবর্দ্ধনের মা গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। অল্প সময় দুই জনে একত্রে ছিলেন। পরে গোবর্দ্ধনের মা-ই প্রথম নামিয়া গেলেন। মা হাওড়া নামিলেন।

ঘটনাচক্রে গোবর্দ্ধনের মা কতকগুলি চাবি গাড়ীতে ফেলিয়া গেলেন। মার সঙ্গে বীরেন দাদা প্রভৃতি ছিলেন। তাঁহারা সেই চাবিগুলি গাড়ী হইতে নিয়া গেলেন। কিন্তু মা গোবর্দ্ধনের মার কোন ঠিকানা জিজ্ঞাসা করেন নাই। শ্রীরামপুরে থাকেন, এই পর্য্যন্ত জানেন। পরে এই চাবির জন্যই দুই পক্ষ খোঁজ করিতে করিতে মার সঙ্গে আবার গোবর্দ্ধনের মার দেখা হইল। তখন তিনি মার খবর পাইয়া মাকে নিজ বাড়ীতে শ্রীরামপুরে নিয়া গেলেন। তাঁর ছেলে গোবর্দ্ধনেরও তখন অল্প বয়স, সেও মার খুব অনুগত হইয়া পড়িল। সেই হইতে মা কলিকাতা গেলে অনেক সময়ই গোবর্দ্ধনদের বাড়ী শ্রীরামপুরে যান; আমরাও মার সঙ্গে গিয়াছি। প্রথম দেখা হওয়ার সময় আমরা মার সঙ্গে ছিলাম না।

চাবির খোঁজ উপলক্ষে দ্বিতীয়বার দর্শন, এবং তখন হইতে ঐ বাটীতে যাতায়াতের সূত্রপাত।

একবার মাকে পূজা করিবার জন্য গোবর্দ্ধন অনেক জায়গায় পদ্মফুলের খোঁজ করিল, কিন্তু পাইল না। পরে মা যখন চলিয়া আসেন, মাকে তুলিয়া দিতে তাহারা ষ্টেশনে আসিয়াছে, বাসায় চাবি বন্ধ করিয়া আসিয়াছে। ষ্টেশন হইতে বাসায়

অজানাভাবে প্রাপ্ত পদ্মফুল দ্বারা শ্রীশ্রী-মায়ের উদ্দেশ্যে পূজা।

গিয়া দেখে, জানালা দিয়া কে অনেকগুলি পদ্মফুল ঘরে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। এই ঘটনায় তাহারা অবাক্ হইয়া গেল। ঐ পদ্মফুল দিয়া মার উদ্দেশ্যে পূজা করিল।

মা এবার কলিকাতায় কাকাবাবুর বাসাতেই আছেন। প্রত্যেকবার কলিকাতায় মা গেলেই দিন-রাত্রির মধ্যে আর মার বিশ্রাম হয় না। এই সব আলোচনা করিয়া এবার পিসামহাশয়, কাকাবাবু প্রভৃতি স্থির করিয়াছেন, দিনে ১২টার পর কয়েক ঘণ্টা এবং রাত্রি ৯টার পর ভোর পর্য্যন্ত মার কাছে কেহ থাকিতে পারিবেন না; মাকে বিশ্রাম করিতে দিতে হইবে। নতুবা এভাবে শরীর টিকিবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। ঢাকায়ও ২।১ বার জ্যোতিষদাদা এইভাবে নিয়ম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। লোকের আগ্রহ দেখিয়া তাঁহাদের বাধা দিয়া রাখা সম্ভব হয় নাই। মাও নিয়মে বদ্ধ থাকিবার নন, কাজেই কোন নিয়মই চলে নাই। এবারও ঐরূপ নিয়ম হইল। দিনে ১২টার পরই কাকাবাবু সকলকে মুখে বলিতে পারা যায় না বলিয়া, ঘড়ি দেখাইয়া দিলেন। মার শরীরের জন্যই এই ব্যবস্থা; কাজেই কাহারও কিছু বলিবার নাই।

শ্রীশ্রীমা নিয়মানু-বর্ত্তিতার বাহিরে।

সকলে "যাই যাই" করিয়া প্রায় ১২টার মধ্যেই সেইদিন বিদায় নিয়াছে। তারপর বিশ্রাম করিবার জন্য মাকে একটি ঘরে শোওয়াইয়া আমরা ২।৪ জন কাছে বসিয়া বাতাস করিতেছি। বাহিরে ভয়ানক রৌদ্র। বৈশাখ মাস; খুব গরমও পড়িয়াছে। কাকাবাবু, ভোলানাথ প্রভৃতিও অপর ঘরে গিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। কিন্তু মা উঠিয়া বসিয়াছেন। একটু পরেই দরজা খুলিয়া কাকাবাবুদের ঘরে গিয়া হাজির। তাঁহাকে উঠাইয়া নিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন।

কাকাবাবু বলিতেছেন, "এ কি হইল! সকলকে কত চেষ্টায় সরাইয়া দিয়া আপনার বিশ্রামের ব্যবস্থা করিলাম, আপনি উঠিয়া রৌদ্রে বাহির হইলেন? সকলে আসিয়া আমাকে কি বলিবে?" কিন্তু এসব কথা কে শোনে? মা হাসিয়া বলিলেন, "আমার যে মাথা খারাপ, তা ত জানেন না? আপনাদেরও বিশ্রাম করিতে দিতেছি না"? এই বলিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে বাহির হইলেন। এক দোকানে গিয়া কিছু ভিক্ষা চাহিতেছেন। তাহারা হয়ত কিছু দিল। তাহা নিয়া আবার অপর এক জায়গায় দিয়া আসিলেন। এইভাবে লীলা করিতেছেন। আমরা কয়েকজন মাত্র সঙ্গে ছিলাম। যতীশদাদা (গুহ) মাকে ছাড়িয়া সুস্থির থাকিতে না পারিয়া, আবার কাকাবাবুর বাসায় উপস্থিত হইয়াছেন। বৈকালে ৪টার পর হইতে মার সঙ্গে দেখা হইবে, নিয়ম করা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা দুপুরেই আসিয়া দেখেন, মা ঘরে নাই। রাস্তায় রাস্তায় মা বাহির হইয়াছেন খবর পাইয়া তাঁহারাও সঙ্গ নিলেন।

দিবসের নিয়ম ভঙ্গ।

এইভাবে আনন্দ করিতে করিতে ক্ষিতীশদাদার শ্বশুর, পশুপতি-বাবুর বাসায় গিয়া মা উপস্থিত হইলেন। এদিকে পশুপতিবাবুর স্ত্রীর খুব অসুখ। তিনি আসিয়া মাকে দর্শন পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। শুইয়া শুইয়া শুধু প্রার্থনা করিতেছিলেন, "মাগো! তুমি যদি আন্তর্য্যামিনী মা হও, আসিয়া দেখা দিও"। এর মধ্যে দুপুর বেলায় হাঁটিতে হাঁটিতে মা গিয়া তাঁর কাছে উপস্থিত। তিনি ত মাকে দেখা মাত্রই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তখনই লুটাইয়া প্রণাম করিলেন। পশুপতিবাবু অনেকক্ষণ এই কথা নিয়া আলোচনা করিলেন। সকলেই অবাক্। মা কখনও এইভাবে দুপুরে রাস্তায় বাহির হন না। আজই

ভক্তের আকুল প্রার্থনা —শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা।

বাহির হইয়া এ বাসায় আসিয়াছেন। কিছুক্ষণ ঐ বাসায় থাকিলেন। পরে কোথা হইতে (ঠিক মনে নাই) মাকে নিতে মোটর আসিল। মা অন্য এক বাসায় চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পর কাকাবাবুর বাসায় ফিরিলেন। দিনের নিয়ম ত এই ভাবে ভাঙ্গিয়া দিলেন। রাত্রিতেও ৯টার পরই সকলকে উঠাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু মা সেইদিনও সারা রাত যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের পর্য্যন্ত ঘুমাইতে দিলেন না। পিসিমাকে নিয়া, কাকাবাবুকে নিয়া পরে কাকীমাকে নিয়া, দুষ্টামি করিয়া সারা রাত কাটাইয়া দিলেন। পর দিন ভক্তেরা আসিয়া শুনিল, মার বিশ্রাম এইভাবে হইয়াছে।

রাত্রির নিয়ম ভঙ্গ।

এইভাবে মা সব নিয়ম ভাঙ্গিয়া দিতেন। কখনও কোন নিয়মের গণ্ডিতে মা বদ্ধ থাকিতে পারিতেন না। ঢাকার আশ্রম হইবার পরে বলিতেন, "তোমরা ভাবিয়াছ, এই প্রাচীরঘেরা জায়গাটুকুর মধ্যে আমাকে আটকাইয়া রাখিবে। আশ্রম করিয়াছ, তোমরা সকলে সৎভাবে এখানে আসিয়া মিলিত হইবে। আমি ত কোথায় থাকি, কোথায় যাই, কিছুই ঠিক নাই"। বাস্তবিকই দেখা যাইতেছে, যতই আশ্রম হইতেছে, মা বাহিরে বাহিরেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

কলিকাতায় অনেকদিন থাকার পর পুনরায় রাজসাহী যাইবার কথা হইল। মা বলিলেন, "এবার আসিবার সময় রাজসাহীতে গিরিজাবাবু একদিন তাহার বাসায় থাকিয়া আসিবার জন্য খুব অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু থাকা হয় নাই। তাই আবার রাজসাহী যাইয়া একদিন তাহার বাসায় থাকিয়া পরে ঢাকা যাওয়া হইবে"। তাই হইল। মা আবার রাজসাহী

কলিকাতা হইতে রাজসাহী হইয়া ঢাকায় গমন।

গেলেন। পরে সকলকে নিয়া ঢাকা আসিলেন। এবারও আমরা রাজসাহী যাই নাই। কলিকাতা হইতে পোড়াদহ আসিয়া মার সহিত একত্র হইয়া ঢাকায় আসিলাম।

এই রাজসাহীতে পূর্ব্বে একবার মা আমাদের নিয়া গিয়াছেন, অটল দাদার বাসাতেই আছি। এক বাড়ীতে রাত্রিতে কীর্ত্তন হইবে, মাকে নিয়া গেলেন। আমরাও সঙ্গে গেলাম, কিন্তু অটলদাদা গেলেন না। মা ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, অটলদাদা খাওয়া দাওয়া করিয়া ঘুমাইয়া আছেন। মা আসিলে উঠিলেন। মা তাকে বলিলেন, "তুমি ত বেশ লোক? আমরা কীর্ত্তনে গেলাম, তুমি গেলে না; এখন আমরা না খাইতেই তুমি খাইয়া শুইয়া আছ"। তিনি বলিলেন, "আমি খাইলেই ত তোমারও খাওয়া হয়; ছেলের পেট ঠাণ্ডা থাকিলেই মার পেট ভরা থাকে"। মা বলিলেন, "তাই নাকি? বেশ, এ কথা যেন মনে থাকে"। পরে মাকে যখন জল খাইতে দেওয়া হইল, মা তখন থালাখানা অটল দাদাকে দিতে বলিয়া বলিলেন, "অটল খাইলেই যখন আমার খাওয়া হয়, তখন অটলকেই ইহা খাইতে দেও"। অটলদাদাও হাসিয়া তাহা খাইলেন। মা শুইলেন না; বলিলেন, "অটল শুইলেই ত আমার শোওয়া হইবে"। অটলদাদাও আবদারের ভাবে বলিলেন, "বেশ, তুমি বসে থাক, আমি ঘুমুতে যাই"। এই বলিয়া গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

রাজসাহীতে অটল দাদার বাসায় পূর্ব্বের একটি ঘটনা।

পর দিন সকালে উঠিয়া মা বলিলেন, "অটল বাসায় থাকিলেই ত আমার থাকা হইবে, চল আমরা অন্য জায়গায় যাই"। এই বলিয়া আমাদের নিয়া হাঁটিয়াই রওনা হইলেন। অটলদাদার স্ত্রীও আমাদের

সঙ্গে চলিলেন। মা সকলকে নিয়া নদীর ধারে একটি ছোট মন্দিরে গিয়া বসিলেন। বলিলেন, "এইখানেই রান্না কর"। তাহাই হইল। ভোলানাথ ও বাবা, বাজার করিয়া সব নিয়া আসিলেন। আমি ও অটলদাদার স্ত্রী নদীর ধারে পাথরের মধ্যেই রান্না করিলাম। মিষ্টান্ন রান্না হইয়াছে। আমি একটা ছোট হাঁড়ির মধ্যে কিছু ঢালিয়া নদীর জলের মধ্যেই বসাইয়া রাখিলাম, এবং মাকে খিচুড়ি খাওয়াইতে আরম্ভ করিলাম, মনে করিলাম, ইতিমধ্যেই মিষ্টান্ন ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। খিচুড়ি খাওয়ান হইয়া গেল; আমি ঐ হাঁড়িটি হইতে কিছু মিষ্টান্ন একটা গ্লাসে নিয়া মার মুখে ঢালিয়া দিলাম। (মা তখন গ্লাসে মুখ দিয়া জলও খাইতেন না, ঢালিয়া দিতে হইত)। যেই ঢালিয়া দিয়াছি, মা তাহা গিলিয়া ফেলিয়াই আমাকে অতি ব্যস্তভাবে বলিলেন "এখন তুমি এই গ্লাস হইতে শীঘ্র একটু মিষ্টান্ন নিজের মুখে ঢালিয়া দেও"। এত ব্যস্ত ও দ্রুতভাবে বলিলেন যে আমি কিছু বিবেচনা করিবার সময় পাইলাম না।

তখনই গ্লাস হইতে মিষ্টান্ন নিজের মুখে ঢালিয়া দিলাম। দিতেই দেখি, এত গরম, যে মুখ পুড়িয়া যাওয়ার মত অবস্থা। আমি আর ভাল করিয়া গিলিতে পারিলাম না। মুখ হইতে মাটিতে ফেলিয়া দিলাম। মা হাসিতে লাগিলেন। তখন বুঝিলাম, আমি ঠাণ্ডা হইয়াছে কিনা, না দেখিয়া মার মুখে দিয়া কত অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছি। আজ তাই মা আমাকে খাওয়াইয়া শিক্ষা দিলেন। বাস্তবিকই সেই হইতে আমার ত শিক্ষা হইলই, অটলদাদার স্ত্রীও বলিতে লাগিলেন, "আমারও শিক্ষা হইল, আমি ত মিষ্টান্ন রাঁধিয়া গরম ভোগই মাকে নিবেদন করি। আজ হইতে না দেখিয়া, ঠাণ্ডা না করিয়া, আর করিব না"। মা বলিলেন, "কখনও দেবতার ভোগ এত গরম দিতে

নাই"। মা এইরূপ কত ভাবেই না আমাদের শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু তবুও শিক্ষা হয় কই ?

সপ্তদশ অধ্যায়

১৩৩৯ সনের বৈশাখ মাসে মা ঢাকায় আসিয়াছেন। কয়েকদিন পরেই মার জন্মোৎসব আরম্ভ হইল। এবার জন্মোৎসবের কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতেই ৺অন্নপূর্ণা, ৺বিশ্বেশ্বর, ৺কালী প্রভৃতির মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন করিতে দেওয়া হইয়াছে। জ্যোতিষ দাদার উপরই এ সব ভার। তিনিই করাইতেছেন। এবার জন্মোৎসবের সময় নূতন মূর্ত্তি তৈয়ার হইয়া আসিয়াছে, তাহা প্রতিষ্ঠা করা হইল। এবারকার মূর্ত্তিতে মার গহনার সোনা গলাইয়া মূর্ত্তিতে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছিল, মূর্ত্তি খুব সুন্দর হইয়াছে। অষ্টধাতুর মূর্ত্তি, ৺বিশ্বনাথ রূপার মূর্ত্তি। মার গায়ের সব পূর্ব্বের গহনা ভাঙ্গিয়া এই সব দেবতার গহনা করা হইয়াছে। ভোলানাথ প্রতিষ্ঠা করিলেন। যজ্ঞাদি বিশেষভাবে করিলেন। ৺কাশী হইতে বাবা শ্বেত পাথরের ৺শিব আনাইয়াছেন, ভিন্ন মন্দিরে ৺শিবও প্রতিষ্ঠা করা হইল।

ঢাকায় ১৩৩৯ সনে জন্মোৎসব।

(১) বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা।

মার আদেশে কুলদা দাদা নিজ কন্যাকেই একদিন কুমারী দেবীরূপে পূজা করিলেন। আর একদিন উৎসবের মধ্যেই বাবা, আমি, যোগেশদাদা, অতুল, কমলাকান্ত ও কানু এই ছয়জন মার আদেশে একটি করিয়া প্রত্যেকে বিভিন্ন কুমারীকে পূজা করিলাম। মা বলিলেন, "এই পথে আসিবার জন্য ইহা দরকার"। পরে মা একদিন কুমারী ভোজন করাইলেন। যজ্ঞ ভোলানাথই করিলেন।

(২) কুমারী পূজা।

কিন্তু আমাদের ৬।৭ জনকে ফল ফুল রোজই আহুতি দিতে আদেশ করিলেন।

এবার জন্ম তারিখ হইতে জন্ম তিথির মধ্যে ২১ দিনের ব্যবধান হইয়াছিল। এই একুশ দিনই অখণ্ডভাবে নাম কীর্ত্তন চলিল। মার আদেশে এই ২১ দিন যজ্ঞে যে চরু পাক হইত, তাহা খাইয়া আমরা ৬।৭ জন রহিলাম। মা ও ভোলানাথ তাহা খাইয়াই থাকিতেন। ভোলানাথ পূজার্চ্চনাতে খুবই পরিশ্রম করিতেন, কিন্তু সামান্য চরু ও ফল খাইয়া বেশ আছেন। বেবীদিদি একদিন কুমারীপূজা করিলেন। কুমারীকে নানা সোনার অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়া দিলেন।

(৩) একুশ দিবস ব্যাপী অখণ্ড নাম কীর্ত্তন।

একদিন মার আদেশমত ৺অন্নপূর্ণাকে ১০৮ রকম ব্যঞ্জনাদি দিয়া ভোগ দেওয়া হইল। ব্রাহ্মণেরাই তাহার জল তুলিল, মশলা বাটিল। খুব শুদ্ধমত যজ্ঞের আগুন দিয়া এই ভোগ পাক হইল। প্রায় ৮।১০ জন স্ত্রীলোক পাক করিলেন। আজিকার এই ভোগের প্রসাদ ব্রহ্মচারীরাও পাইলেন। মা স্ত্রীলোকদের নিয়া আশ্রমের ভিতরের মাঠের মধ্যে খাইতে বসিলেন। খুব আনন্দ করিয়া খাওয়া দাওয়া হইল। এবারও মা দুই রাত্রি মেয়েদের নিয়া নাম করিয়া কাটাইলেন। এইরূপে এক এক দিন এক একটা উৎসব বিশেষভাবে করিয়া আনন্দ করিতেছেন।

(৪) ১০৮ প্রকার ব্যঞ্জনাদি সমন্বিত শ্রীশ্রী৺অন্নপূর্ণা মায়ের ভোগ।

১০৮ পদ ভোগের দিন রাত্রিতে খুব বৃষ্টি হইল। মা বৃষ্টির মধ্যে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলেন মা দুই হাতে বৃষ্টির জল ছিটাইয়া তাঁহাদের ভিজাইয়া দিলেন। বাধ্য

(৫) বৃষ্টির মধ্যে অপূর্ব্ব কীর্ত্তন।

হইয়া তাঁহারাও বৃষ্টিতে নামিয়া পড়িলেন। মা একেবারে জলে কাদায় গড়াগড়ি দিয়া উঠিলেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এই লীলা চলিল।

(৬) 'জটু'ভাইয়ের শ্রীশ্রী-মাকে বিচিত্র আরতি।

পরে মাকে কাপড় ছাড়াইয়া আমরা কাপড় ছাড়িলাম। জটু খুব সুন্দর আরতি করে; এবারও সে মাকে আরতি করিল। মেয়েরা ফুলের সাজে মাকে সাজাইল। আনন্দে, উৎসবে সব মাতিয়া আছে।

মা মন্দিরের কার্য্যাদি সম্বন্ধে যাহা বলিবার ব্রহ্মচারীদের বলিতেছেন; পূজার্চ্চনা সম্বন্ধে ভোলানাথকে যাহা বলিবার বলিতেছেন, সব দিকেই লক্ষ্য আছে। কিন্তু যাহাকে যাহা বলিবার বলিতেছেন, সেই শুনিতেছে অপরে তাহা জানিতেও পারিতেছে না। দরকারী কথাটি বলিয়াই মা সাধারণভাবে সব স্ত্রীলোকদের মধ্যে গিয়া এমন ভাবে পূজা ও যজ্ঞ দেখিতে বসিয়া গিয়াছেন, যেন তিন কিছুই জানেন না। সকলে যেমন দেখিতেছে, তিনিও তেমনি দেখিতেছেন। অথচ প্রত্যেকটি কাজেই তাঁহার কি অদ্ভুত লক্ষ্য? তাঁহার বিধান মতই সব কাজ সুন্দরভাবে হইয়া যাইতেছে। অথচ মার ব্যবহারে বাহির হইতে কাহারও তাহা বুঝিবার উপায় নাই। শিশুর মতই আনন্দ করিতেছেন, ঘুরিতেছেন, ফিরিতেছেন।

(৭) শ্রীশ্রীমায়ের সর্ব্ববিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি ও পরস্পরের অজ্ঞাতসারে ব্যবস্থা নির্দ্দেশ।

শেষ দিন মহোৎসব হইল। এবারও জন্মতিথির পূজা ৺অন্নপূর্ণার উপরই হইল। ভক্তগণ প্রদত্ত সিন্দুরের কৌটা বাক্স ভরা হইয়া অনেক জমিয়াছিল; মার আদেশে তাহা ডালা ভরিয়া স্ত্রীলোকদের

মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া হইল। রেশমী কাপড়গুলি, যাঁহারা ভোগ পাক করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া হইল। লোকে লোকারণ্য। মা, মাঠে সকলকে নিয়া ঘুরিতেছেন, কথনও বা বসিতেছেন। দিন রাত্রি প্রায় এইভাবে কাটিয়া যাইতেছে।

(৮) শেষ দিন মহোৎসব। সিন্দুরের কৌটা ও রেশমী সাড়ী বিতরণ।

সম্ভবতঃ উৎসবের মধ্যেই ভূপতিদাদার মেয়ের বিবাহের দিন পড়িল। বিবাহের পূর্ব্বদিন মাকে তাঁহার বাসায় নিয়া গেলেন, আমরাও সঙ্গে গেলাম। মা ফিরিয়া আশ্রমে আসিতেই মেয়েদের মধ্যে একজন হঠাৎ আনন্দে উলুধ্বনি দিয়া উঠিলেন। মা অমনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "একি? উলুধ্বনি হইল যে? তবে বোধহয় তোদের দৃষ্টিতে আশ্রমে কোন শুভ কার্য্য হইবে, কি বল?" আমি এ'কথার অর্থ কিছুই বুঝিলাম না।

পরদিনই ভূপতিদাদার মেয়ের বিবাহ। এদিকে আশ্রমে পর দিন সন্ধ্যা হইতেই কি একটা পালা-কীর্ত্তন হইতেছিল। বিবাহের লগ্ন একটু রাত্রিতে। মা সারাদিনই প্রায় মন্দিরের মধ্যে সিংহাসনের পিছনে মেঝের উপরে পড়িয়া আছেন। সন্ধ্যার সময় উঠিয়া নিজের কুটীরে গিয়া ভোলানাথকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দুই জনের ভিতর অনেকক্ষণ কথা হইল। কিছু পরেই দেখি, কুলদা দাদা সেই বারান্দায় গেলেন। তাঁহার স্ত্রীও বাড়ী হইতে আসিয়া সেখানে গেলেন। মা তাঁহাদের দুই জনকে নিয়া পঞ্চবটীতে গিয়া বসিতে বলিলেন। কিছু পরেই মা ভোলানাথকে নিয়া তথায় গেলেন। ব্যাপার কিছুই বুঝিতেছি না। এদিকে কীর্ত্তন শেষ হইয়া গেল। অনেকেই বিদায় নিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন। যাঁহারা রহিলেন, মা তাঁহাদের সকলকে পঞ্চবটী যাইতে বলিলেন। সকলে

উপস্থিত হইল। এদিকে 'মরণীকে' * বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইয়া নিয়া আসা হইল। সকলের সম্মুখে শুভ লগ্নে মরণীকে কুলদা দাদার পুত্রবধূরূপে বাগ্দত্তা করা হইল। কুলদা দাদার ছেলে চিনুও তথায় উপস্থিত ছিল। মা বলিলেন, "মরণীর এখন মাত্র ৮ বৎসর বয়স। উপযুক্ত বয়সে সব মঙ্গলমত থাকিলে, চিনুর হাতেই মরণীকে দান করা হইবে"। কুলদা দাদাও তাঁহার স্ত্রীর পুত্রবধূরূপে মরণীকে কোলে নিলেন। পঞ্চবটীর অশোক গাছের নীচে বসিয়াই এ কাজ করাইলেন। ভোলানাথ মরণীকে খুবই স্নেহ করিতেন। হঠাৎ এই ব্যাপারে তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। মা ধীর, স্থির। একটু হাসিয়া বলিতেছেন, "কাঁদিবার কি আছে? যাহার যাহা হইবার হইবেই; ইহাতে ব্যস্ত হইবার কিছুই নাই"। তখনই তিন দিনের জন্য মরণীকে, চিনু ও তাহার মায়ের সহিত তাহাদের বাসায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তিন দিন পরে মরণী আবার আশ্রমে আসিয়া মটরী পিসিমার কাছেই রহিল। উৎসব শেষ হইয়া গেল।

(৯) 'চিনু'র সহিত 'মরণী'র ভবিষ্যৎ বিবাহের বাগ্দান।

একদিন সকাল বেলা গাড়ী করিয়া বিনয়দাদার (বন্দ্যোপাধ্যায়) বাসায় মা চলিলেন। সঙ্গে ভোলানাথ, আমি, জ্যোতিষদাদা ও মনোরমাদিদি চলিলাম। মা কখনও নাকি বিনয়দাদার বাসায় যান নাই, এইসব কথা হইতেছে। বিনয়দাদার বাসায় মা কিছুক্ষণ ছিলেন। আসিবার সময়,

* মরণীকে ছোট বেলা হইতেই নিরামিষ খাওয়ান হইত এবং কাহারও পাতের জিনিষ খাইতে দিত না। ছোট বেলা হইতেই উহাকে ৺শিবপূজা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। রোজই ৺শিবপূজা করিত। ছোট বেলাতেই মরণী সুন্দর কীর্ত্তন করিতে পারিত। এইরূপে খুব শুদ্ধভাবে উহাকে পালন করা হইয়াছিল।

তাঁহার মা কিছু ভাল ডাল ও তরকারি মাকে ভোগ দিবার জন্য দিয়া দিলেন। আমি কাপড়ের আঁচলে বাঁধিয়া নিলাম। এদিকে কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই মার নির্দ্দেশ মত কমলাকান্ত এবং অতুল সপ্তাহের মধ্যে একদিন ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়া চাল, ডাল যাহা পাইত, নিয়া আসিত। সেই কথা মনে পড়ায় আমি হাসিয়া বলিলাম, "আজ দেখি আমরা ভিক্ষায় কি পাই ?" বিনয়দাদার বাসা হইতে কুলদা-দাদার বাসায় গেলাম। গিয়াই আমি তাঁর স্ত্রীকে হাসিয়া বলিলাম, "আজ আমরা ভিক্ষায় বাহির হইয়াছি, কিছু ভিক্ষা দিন"। বলিয়া আঁচল পাতিতেই তিনিও চাল, তরকারি ও কিছু পয়সা দিলেন। পরে পিলখানায় প্রতাপবাবুর বাসায় গেলাম। সেখানেও ভিক্ষা চাহিলাম। তাঁহারা অনেক তরকারি দেওয়ায় আমার আঁচলে ধরিতেছে না দেখিয়া, মা ভোলানাথ ও জ্যোতিষদাদাকে বলিলেন, তোমরাও কাপড় খুলিয়া ভিক্ষা নেও, ও একা কত নিবে ?" তখন তাঁহারাও কাপড়ে ভিক্ষার জিনিষ বাঁধিয়া নিলেন। এইভাবে রায়বাহাদুর, ভূদেব-বাবু, সুরেনবাবু প্রভৃতি অনেকের বাসায়ই মা সেদিন গেলেন। ক্রমে ভিক্ষার জিনিষ নিবার জন্য আর একখানি গাড়ী করা হইল। এদিকে সকলকেই মা দুপুরে আশ্রমে গিয়া প্রসাদ নিতে বলিলেন। এইভাবে ভিক্ষার সব জিনিষ নিয়া আমরা আশ্রমে আসিলাম।

শ্রীশ্রীমায়ের সমভিব্যাহারে ভক্তগৃহে আমার ভিক্ষা গ্রহণ।

রাস্তা হইতেই জ্যোতিষদাদা কি কার্য্যোপলক্ষে বাসায় চলিয়া গেলেন। মা তাঁহাকেও কিছু ভিক্ষার চাল, ডাল দিয়া দিতে বলিলেন, এবং আজই রাঁধিয়া খাইতে তাঁহাকে বলিলেন। মার আদেশে তিনি অনেকদিন যাবতই স্বপাক খাইতেছেন। অবশ্য জ্যোতিষদাদার স্ত্রী এই সব পছন্দ করিতেন না। এই সব কারণে তিনি মার উপর চটিয়া গিয়াছিলেন।

আশ্রমে আসা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। জ্যোতিষদাদার সহিত বাক্যালাপই বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। করুণাময়ী মা সন্তানের মঙ্গলের জন্য দুই রাত্রি গিয়া জ্যোতিষদাদার বাসায় থাকিয়া তাঁর স্ত্রীকে বুঝাইলেন। কিন্তু কিছুই ফল হইল না। জ্যোতিষদাদাও নিজে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, সেই পথেই চলিতে লাগিলেন। তাঁর স্ত্রীরও অসন্তোষ দিন দিন বাড়িয়া চলিল। পরে তিনি মার -অনেক নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিন্দা ও স্তুতিতে সমজ্ঞান, মা আমার গঙ্গাজলের মত সব জিনিষই সমানভাবে ভাসাইয়া নিয়া চলিলেন, আনন্দে সবই গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এ জন্য তাঁর এতটুকুও বিরক্তি প্রকাশ পাইত না। বরং জ্যোতিষদাদার স্ত্রীকে উৎসবে আনিবার জন্য মা বাবাকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু মার এই অনুগ্রহ তিনি বুঝিলেন না। কি কারণে কি হয়, মা বুঝিতে পারেন বলিয়া তাঁর উপর মার অসন্তুষ্টির কোনই কারণ ছিল না।

জ্যোতিষদাদার স্ত্রীর কথা।

মা আশ্রমে আসিয়াই আমাকে কিছু পূজার্চ্চনা করিবার জন্য সিদ্ধেশ্বরীতে পাঠাইয়া দিলেন। সকলেই আসিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইয়া আনন্দ করিতেছেন। ভিক্ষার দ্রব্যাদি পাক হইল। এদিকে সেদিন মনোরমাদিদির ইচ্ছা হইল, মাকে একটু রাঁধিয়া ভোগ দিবেন। মার অনুমতি নিয়া, তিনিও এক দিকে লবণ না দিয়া তরকারি (ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতির হাতের তরকারি মার ভোগে দেওয়া হইত না) ও লুচি করিয়া, মার ভোগ দিলেন। মার ভোগ হইয়া যাওয়া মাত্রই মা বীরেনদাদাকে নিয়া আমাকে আনিবার জন্য সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের ভোগ ও ভক্তগণের প্রসাদ গ্রহণ।

মা আসিবার সময় তথায় ৺কালীমন্দিরে গিয়া ৺কালী স্পর্শ করিয়া আসিলেন এবং বাহিরে আসিয়া, অশ্বত্থ গাছটিও স্পর্শ করিয়া আমাকে নিয়া রমণা আশ্রমে চলিয়া আসিলেন। মনোরমাদিদির ভোগ তৈয়ার হইয়াছে। তখন তিনি মার কাছে আনিয়া দিলেন। মা নিজের কুটীরেই বসিয়া আছেন। আমিই মাকে খাওয়াইয়া দিলাম। পরে মা বলিতেছেন, "তোমাকেও দিব নাকি?" আমি বলিলাম, "কই আর এখন দেও?" মা একটু লুচি তরকারি আমার হাতে দিলেন। তখন আরও অনেকে হাত পাতিতেই তাঁহাদের হাতেও দিলেন। মনোরমাদিদি মার হাতখানাই চুষিয়া লইলেন। মা উঠিয়া পড়িলেন। পরে আমাকে বলিলেন, "সকলকে নিয়া খাইতে বসিয়া যাও"। বেলা আর বেশী ছিল না। আমরা সকলে প্রসাদ নিয়া উঠিলাম। মা সকলকে নিয়া মাঠে গেলেন।

উৎসব অল্পদিন মাত্র শেষ হইয়া গিয়াছে, তখনও ভিড় চলিতেছে।

বেবীদিদির প্রদত্ত ভোগ শ্রীশ্রীমায়ের নিজহস্তে বিতরণ।

উৎসবের মধ্যেই বেবীদিদি একদিন ১-৮ পদের ভোগ দিলেন। সেইদিন মা সন্ধ্যাবেলায় একটা বড় পাত্রে করিয়া সব তরকারি দিয়া প্রসাদ মাখিয়া লইলেন, এবং সকলের হাতে হাতে নিজে দিতে লাগিলেন। সেইদিন জাতিভেদ রহিল না। মাও বলিলেন, "আজ যজ্ঞের আগুনে এই ভোগ পাক হইয়াছে, আজ শ্রীক্ষেত্র"।

উৎসবের মধ্যেই সিদ্ধেশ্বরীর আশ্রমে যে বেদী তৈয়ার করা হইয়াছিল, তাহার উপরে একটি কালো পাথরের ৺শিবলিঙ্গ স্থাপিত করা হইল।

সিদ্ধেশ্বরীর বেদীতে ৺শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা।

এই ৺শিবটি কৃষ্ণদাদা আনাইলেন। ভোলানাথই সব প্রতিষ্ঠা করিলেন। একটা লক্ষ্য করিলাম, মা প্রতিষ্ঠার সব বলিয়া দিলেন; সেইখানেই

দাঁড়াইয়া রহিলেন; যখন সব কার্য্যাদি হইয়া গেল, ৺শিব প্রতিষ্ঠা হইবে, সেই সময়ই মা হঠাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আবার প্রতিষ্ঠার পর যখন ব্রাহ্মণদের নিয়া ভোলানাথ ৺শিবলিঙ্গ স্নান করাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন আবার মা নিজে আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। ইহার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করায় মা বলিলেন, "কি জানি কেন থাকিতে পারিলাম না, সব কথা ত প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না। ইহার কারণও বলিতে পারিতেছি না"।

রমণার আশ্রমে যে ৺শিব মন্দির হইয়াছে, মার ইচ্ছামত তাহার উপরে একটি প্রকাণ্ড সর্প তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাপটি যে ভাবে জড়াইয়া জড়াইয়া উঠিবে, তাহাও মা বলিয়া দিয়াছেন। এক দিন উৎসবের কিছু পূর্ব্বে, মা সিদ্ধেশ্বরী গিয়া আশ্রমে শুইয়া আছেন। অমূল্যবাবু ও গণেশবাবু তথায় মার দর্শনে গিয়া উপস্থিত। আমি মার কাছে বসিয়াছিলাম। বাবা বেদীর নিকট বসিয়া নিজের সাধন ভজন করিতেছিলেন। অমূল্যবাবু ও গণেশ-বাবুর সহিত মা পূর্ব্বের অনেক কথা বলিতেছেন। সাপের গল্পও হইল। হঠাৎ অমূল্যবাবু বলিয়া উঠিলেন, "মা, সাপটির এই জায়গাতেই বোধ হয় কোন মহাপুরুষ ছিলেন, তাই বুঝি ৺শিবমন্দিরের মাথায় সাপের মূর্ত্তি দিয়াছ"? মা হাসিয়া বলিলেন, "তুমি আবার এসব কি কথা বলিতেছ"? এই বলিয়া একটু হাসিয়া যেন অমূল্যবাবুর কথা সমর্থন করিয়াই চুপ করিয়া গেলেন। একটু পরেই এক দল মেয়েলোক মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। মা শুনিয়া বলিতেছেন, "কে কাহাকে দর্শন করে? নিজেই নিজেকে দর্শন করিতে আসিয়াছে"। দুপুর বেলা ওখানে কাটাইয়া বৈকালে মা রমণার আশ্রমে

রমণা আশ্রমের ৺শিব মন্দিরের উপরে নির্ম্মিত সর্পের কথা।

আসিলেন। অনেক সময় এইভাবে সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে যাইয়া পড়িয়া থাকিতেন।

১৩৩৯ সনের উৎসবের পরে, পূর্ব্বোক্ত ভাবে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা ভোগের পর, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সকলে প্রসাদ পাইয়াছিলেন। (উৎসবের মধ্যেই কানুকে অতুলঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে 'সাধনসমর' আশ্রমে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল)। মা সন্ধ্যার পরে আসিয়া নিজের কুটীরের বারান্দায় বসিলেন। পরে গিয়া মন্দিরের বারান্দায় বসিলেন। ধীরে ধীরে সকলেই প্রায় বিদায় নিয়া বাসায় চলিয়া গিয়াছেন। আমরা আশ্রমবাসী কয়জন এবং বাহিরের ২।৪ জন মাত্র আছেন। রাত্রি প্রায় ১১॥টা পর্য্যন্ত বীরেনদাদা, নন্দু ও দীনেশবাবুর স্ত্রী মার সঙ্গে মন্দিরের বারান্দায় বসিয়াছিলেন। পরে মা হঠাৎ উঠিয়া আসিলেন। তাঁহারাও সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। মা বাহিরে দাঁড়াইয়া অস্পষ্টভাবে বলিলেন, "এখন যাই"। বীরেনদাদার কেমন হঠাৎ এ কথায় খট্‌কা লাগিল। তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, এখন বিছানায় গিয়া শুইয়া থাক"। মা কিছুই বলিলেন না। পরে তাঁহারা প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

গভীর রাত্রিতে শ্রীশ্রীমায়ের ঢাকা ত্যাগের আয়োজন এবং উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে যথাযোগ্য উপদেশ।

সুরেনবাবু ও গিরিজাবাবু আশ্রমে আছেন। মনোরমাদিদিও সেইদিন আশ্রমেই থাকিবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন। উৎসবের সময় গিরিনদাদা কলিকাতা হইতে ভ্রাতৃবধুকে নিয়া আসিয়াছেন; তিনিও আশ্রমে আছেন। মা এবার অনেককেই উৎসবে ঢাকা আসিতে বলিয়া আসিয়াছিলেন। তাই কলিকাতা হইতে যতীশদাদারা সপরিবারে গিয়াছিলেন। পিসিমা, নবতরুদাদা, জ্ঞানদাদা, প্রভৃতি অনেকেই গিয়াছিলেন। সকলেই

উৎসবান্তে কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছেন। সকলকে নিয়া একদিন সিদ্ধেশ্বরী গিয়াও মা আনন্দ করিয়া আসিয়াছেন। গিরীনদাদাকে একবার উৎসবের মধ্যে কথায় কথায় মা স্বপাক খাইতে বলিয়া দিলেন। কলিকাতার সকলেই বিদায় নিয়া চলিয়া গিয়াছেন। শুধু গিরীনদাদা আছেন।

সকলে চলিয়া গেলে, মা মন্দিরের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন, এবং আমাকে বলিলেন, "ভোলানাথকে ডাকিয়া নিয়া আস ত"। ভোলানাথ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। এত দিনের উৎসবের পরিশ্রমে সকলেই শ্রান্ত, ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মার আদেশে ভোলানাথকে ডাকিয়া নিয়া গেলাম। মা ভোলানাথকে নিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পর ভোলানাথ বাহির হইয়া আসিয়া জুতা পরিয়া তৈয়ার হইতেছেন। ইতিমধ্যে যোগেশদাদাকে জ্যোতিষদাদার বাসায় পাঠাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। মা গিয়া পঞ্চবটীর বেদীর উপর বসিয়াছেন। কুলদাদাদা, অতুল, কমলাকান্ত প্রভৃতি ব্রহ্মচারীদের ডাকিয়া নিয়া মা কি কথা বলিলেন।

পঞ্চবটীর পাশেই সাধন ভজন করিবার জন্য বাবা একটি কুটীর তুলিয়াছিলেন। উৎসবের মধ্যে বাবা সেই ঘরেই থাকিতেন। আমি ও বাবা এবং আরও ২।১ জন তথায় বসিয়া আছি। হঠাৎ শুনিলাম, মা পঞ্চবটী হইতে ডাকিতেছেন, "খুকুনী"। ডাক কানে যাইতেই দৌড়িয়া গেলাম। দেখিলাম, মা একাই চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। আমি কাছে যাওয়ার পর বলিতে লাগিলেন, "দেখ, ধৈর্য্যই সাধনার প্রধান অঙ্গ। ধৈর্য্য ধরা চাই"।

শ্রীশ্রীমায়ের আমাকে সান্ত্বনা দান।

প্রথম হইতেই মার ব্যবহারে আমাদের কেমন আশঙ্কা হইতেছিল, মা বাহির হইবেন। এই কথায় আরও সংশয় বাড়িল। আমি ব্যস্ত

হইয়া উঠিলাম; নিকটে আর কেহ নাই। মা বলিলেন, "ব্যস্ত হইও না, আমি কতবার বাহির হইয়াছি। তোমরা এইরূপ ব্যস্ত হও বলিয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। আমাকে নিজের ভাবে চলিতে দাও। তোমরা বাধা দিলে আমি পারি না। দেখ, প্রথম দিন যখন তোমাকে দেখিয়াছিলাম, আমি বলিয়াছিলাম, তুমি এত দিন কোথায় ছিলে? তারপর এই যে সকলেই প্রায় বলে, আমার তোমার চেহারায় মিল আছে, অনেকে মনে করে তুমি আমার ছোট বোন, এইসব কথার কি কোন অর্থ নাই মনে কর? এসব কথার অর্থ আছে"। এই বলিয়া চুপ করিলেন। কিন্তু আমার কাছে তখন এসব কোন কথাই ভাল লাগিতেছে না। আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। আমি বেশ বুঝিতেছি, মা বাহির হইয়া যাইবেন, যদিও মা কিছুই স্পষ্টভাবে বলিতেছেন না—আমি কাঁদিয়া বসিয়া পড়িলাম।

মা মনোরমাদিদিকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার কি কথা আছে বলিয়াছিলে, বল"। তিনি আমাকে সরিয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু মা জানেন, আমি তখন কাঁদিতেছি, কোন কথাই আমার কানে যাইবে না। তাই বলিলেন, "ও থাক, তুমি বল"। তিনি তাঁর কথা বলার পর গিরীনদাদা গিয়া বসিলেন। তখনও কেহ কিছু জানেন না। বাবা ত নিজের কুটীরেই বসিয়া আছেন। একটু পরেই সুরেনবাবু (বন্দ্যোপাধ্যায়) মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় নিতে আসিলে, মা বলিলেন, "তোমরা যাইতেছ? আমি আজই বাহিরে যাইতেছি"। এতক্ষণে আমি স্পষ্টভাবে শুনিলাম, মা আজই যাইবেন। সুরেনবাবু বলিলেন, "কোথায় যাইবে? কবে ফিরিবে"? মা বলিলেন, "কিছুই ঠিক নাই"। মা বাবাকে ডাকিতে বলিলেন। বাবা আসিলে বলিলেন, "আমি আজ বাহির হইতেছি"। বাবা হঠাৎ এই খবরে বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হইলেন না।

কারণ, তাঁহারও কয়েকদিন যাবতই মা বাহির হইবেন বলিয়া নিশ্চিত ধারণা হইয়াছিল। তিনিও বলিলেন, "কবে ফিরিবে"? মা বলিলেন, "ঠিক নাই"। প্রত্যেক বারেই মা বাহির হইবার সময় সাধারণতঃ বলিতেন, 'আমি একটু ঘুরিয়া আসি। তোমরা যখন আনিবে, আবার আসিব"। কিন্তু এবার আর সে সব কথা নাই।

এইসব কথা হইতে না হইতেই জ্যোতিষদাদাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই মা বলিলেন, "তোমার এখনই আমাদের সহিত বাহির হইতে হইবে"। এই বলিয়া পরে জ্যোতিষদাদাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিতেছেন "কি পারিবে না? যাইতেই হইবে"। তিনি বলিলেন, "যাইব। বাসায় না গেলে, টাকা পয়সার বন্দোবস্ত কি করিয়া হইবে"? মা বলিলেন, "আর বাসায় যাওয়ার দরকার নাই এখান হইতেই বন্দোবস্ত করিয়া নেও"। তিনি চুপ করিয়া মন্দিরের দিকে চলিয়া গেলেন। সকলেই নীরবে মার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। গিরীনদাদা বলিলেন, "আমি আজই তোমার সঙ্গে বাহির হইয়া কলিকাতার দিকে চলিয়া যাইব"? মা বলিলেন, "আজ নয়, কাল যাইও"।

শ্রীশ্রীমায়ের আমাকে পৈতা দান এবং ভোলানাথ ও জ্যোতিষদাদা সহ ঢাকা ত্যাগ। (১৩৩৯, ১৯শে, জ্যৈষ্ঠ)

সকলেই দাঁড়াইয়া আছেন। আমি মায়ের নিকট বসিয়া মাথা গুঁজিয়া কাঁদিতেছি। একটু দূরেই মনোরমাদিদিও বসিয়া আছেন। সকলের অলক্ষ্যে মা নিজের গলা হইতে সোনার পৈতাটি আমার গলায় পরাইয়া দিলেন। কিছুদিন হইতেই জ্যোতিষদাদাকে সূতার পৈতা পরাইয়া মা সোনার পৈতাটি নিজের গলায় রাখিয়াছিলেন এবং চুপি চুপি আমায় বলিলেন, "গলায় রাখিও"। আমি সব বুঝিলাম।

মনোরমাদিদি নিকটেই বসিয়াছিলেন, তিনিও কিছু দেখিলেন না বা শুনিলেন না। মার যাহা ইচ্ছা, তাহাই পূর্ণ হয়।

একটু পরেই যাওয়ার সময় হইল। মা উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটু সরিয়া গিয়া এই পৈতার সম্বন্ধে যাহা বলিবার আমাকে বলিয়া রওনা হইলেন। আমরা ষ্টেশনে যাইতে চাহিলাম, কিন্তু মা নিষেধ করিলেন। একখানি গাড়ী পর্য্যন্ত আনিতে দিলেন না; হাঁটিয়াই রওনা হইলেন। ১৩২৯ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে মা বাহির হইলেন। রওনা হইবার পূর্ব্বে দাদামহাশয় ও দিদিমাকে খবর দেওয়া হইল। দিদিমা আসিলেন। কিন্তু হঠাৎ এত রাত্রে মার রওনা হইবার কথায় দুঃখে, অভিমানে দাদামহাশয় আসিলেন না। মা দিদিমাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "বাবা আসিলেন না, পরে দুঃখ করিবেন। আমি ত আর এখন কোন বাসায় যাইব না। তাই আর এখন বাবার সঙ্গে দেখা হইল না"। এই বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে যোগেশদাদা, মথুরবাবু, সুরেন-বাবু ও গিরিজাবাবু ষ্টেশনে গেলেন। আমরা রাস্তা পর্য্যন্ত গিয়া মার আদেশে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। তখনকার মনের অবস্থা ব্যক্ত করিবার ভাষা আমার নাই। মা প্রায় একবস্ত্রেই বাহির হইলেন। ১৩৩৯ সনের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, মা ঢাকা হইতে রওনা হইয়া গেলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

অনেকদিন মার আর খবর পাওয়া যাইতেছে না। এ'বার শুধু মা, ভোলানাথ ও জ্যোতিষদাদা বাহির হইয়াছেন। এই উৎসব উপলক্ষে কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় ও ডাক্তার উপেন্দ্রবাবু গিয়াছিলেন। উপেন্দ্রবাবু কয়েকদিন পর মার খোঁজ করিতে করিতে হিমালয় পর্ব্বতের নানা স্থানে ঘুরিলেন; পরে দেরাদুনে গিয়া হঠাৎ খবর পাইলেন, মা দেরাদুন সহর হইতে ৬।৭ মাইল দূরে রায়পুর নামক একটা স্থানে আছেন। তিনি তখনই তথায় রওনা হইলেন। গিয়া দেখেন, একটি ৺শিবমন্দির আছে; তাহার সংলগ্ন একটি ঘরের বারান্দায় মা, ভোলানাথ ও জ্যোতিষদাদা আছেন। তিনি সঙ্গে থাকিতে চাহিলেন। কিন্তু মা তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। উপেনবাবুর চিঠিতেই আমরা মার খবর পাইলাম। পরে জ্যোতিষ-দাদার চিঠি পাওয়া গেল। জ্যোতিষদাদার ছুটি ফুরাইয়া যাওয়ায়, কমলাকান্তকে তথায় নিয়া যাওয়া হইল। কমলাকান্তকে তথায় রাখিয়া জ্যোতিষদাদা ঢাকা চলিয়া আসিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের রায়পুরে (দেরাদুন অন্তর্গত) অবস্থান।

এই সময়ে একটি ঘটনা হইয়াছিল। জ্যোতিষদাদা রওনা হইয়া আসিবার সময়, মা তাঁহাকে ৺কাশীতে নামিয়া ৺গঙ্গায় স্নান করিয়া ৺বিশ্বনাথ দর্শন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তিনি যখন দ্বিপ্রহরে ৺গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছেন, তখন ঘাটে প্রায় কেহই ছিল না। তিনি হঠাৎ একটা ঘাটে নামিতেই, ৺গঙ্গায় পড়িয়া যান। প্রায় ডুবিয়া যাইতেছেন, এর মধ্যে একটি লোক ঘাট হইতে নামিয়া,

ঐ সময়ের একটি অলৌকিক ঘটনা।

তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন এবং একটু মৃদুভাবে কি বলিলেন। তিনি উঠিয়া ৺বিশ্বনাথ ও ৺অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া, সেই দিনই ঢাকা রওনা হইয়া গেলেন। পরে রায়পুর গিয়া শুনিলেন, সেই-দিন সেই সময়ে মা শুইয়াছিলেন, তারপর উঠিলে কমলাকান্ত গিয়া দেখে, মার সমস্ত কাপড়-সেমিজ ভিজিয়া গিয়াছে। এমন ভিজিয়াছে, যেন স্নান করিয়া উঠিলেন। পরে তাহা ছাড়িয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বে একবার যক্ষ্মারোগে, সমস্ত ডাক্তারেরা যখন আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল, তখন মার কৃপাতেই জ্যোতিষদাদার জীবন রক্ষা হইয়াছিল। এই দ্বিতীয়বার মা জ্যোতিষদাদার জীবন রক্ষা করিলেন।

মা আমাদের সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমেই থাকিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। আমি ও বাবা সিদ্ধেশ্বরীতেই আছি। জ্যোতিষদাদা মার নিকট হইতে আসিয়াই আমাদের সহিত দেখা করিয়া মার সব খবরাদি দিলেন। মা ঢাকা হইতে বাহির হইয়া একেবারে দেরাদুনের দিকে চলিয়া যান। কোথায় যাইবেন, কিছুরই নিশ্চয়তা নাই। হঠাৎ একজনের মুখে খবর পাওয়া গেল "রায়পুর" বলিয়া একটা স্থান আছে। তথায় মন্দিরাদিতে থাকিবার জায়গা আছে।

দেরাদুন হইয়া 'রায়পুর' বাসের ইতিহাস।

এই খবর পাইয়া মা রায়পুর রওনা হইয়া গেলেন। ভোলানাথ বসিয়া নিজের কাজ করেন; মা আপন মনে বসিয়া থাকেন, কি ঘুরিয়া বেড়ান। কথা বলিবার কেহই নাই। কখনও একটু তরকারি জলে সিদ্ধ করিয়া খান; কখনও তাহা না পাওয়া গেলে ২।১ খানা রুটিও খান, এই অবস্থা। ঢাকাতেও মা অনেক সময় শুধু জল তরকারি সিদ্ধ করিয়া তাহাই খাইয়া অনেকদিন ছিলেন।

মা চলিয়া যাওয়ার পরে যখন সকলের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইল,

তখন দেখা গেল, যাহাকে যাহা বলিবার মা সব বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে মা এত শীঘ্রই চলিয়া যাইবেন। চলিয়া যাওয়ার ২।১ দিন পূর্ব্বে মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে বাবাকে একান্তে কৌপীন পরিবার কথা বলিয়া গিয়াছেন। মা চলিয়া যাওয়ার পর হইতেই বাবা গৃহস্থের ঘরে যাওয়াও বন্ধ করিলেন। কৌপীন পরিয়াই বসিয়া থাকিতেন। বাহির হইবার সময় একখানা কাপড় পরিতেন। জুতা অনেকদিন যাবতই ব্যবহার করেন না। জামাও কমই ব্যবহার করিতেন। মা এইভাবে ধীরে ধীরে সব ছাড়াইতেছেন।

রায়পুর গমনের প্রাক্কালে ঢাকাতে শ্রীশ্রীমায়ের বিভিন্ন ভক্তগণের প্রতি বিভিন্ন উপদেশ প্রদান।

বাবা ও আমি সিদ্ধেশ্বরীর আশ্রমঘরে থাকিতাম। মা'ই বলিয়া গিয়াছেন, "এবার তোমরা সঙ্গে যাইবে না। এক জায়গায় স্থিরভাবে বসিয়া কাজ করা দরকার"। কিন্তু মার জন্য মনটা বড়ই অস্থির হইত। মাকে পাইবার পর আমরা সব সময়তেই মার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। ঢাকাতে মা কোন বাসায় গেলেও আমাকে সঙ্গে নিয়া যাইতেন। ২।৩ বার যদিও আমাকে ফেলিয়া ঢাকা হইতে বাহির হইয়াছেন, কিন্তু এইভাবে কখনও বাহির হন নাই। কবে ফিরিবেন কিছুই ঠিক নাই।

জ্যোতিষদাদার মুখে শুনিলাম, মা প্রায় এক বস্ত্রেই থাকেন। জ্যোতিষদাদা রায়পুর থাকা কালে ৺কাশী হইতে নেপালদাদাও মার কাছে গিয়াছিলেন। কিন্তু মা তাঁহাকেও পরদিনই পাঠাইয়া দিয়াছেন। কাহাকেও সেখানে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

শ্রাবণ কি ভাদ্র মাসেই রায়পুরে ভোলানাথের অসুখ হইল। পরে মারও জ্বর হইল। কমলাকান্ত তথায় আছে। আশ্বিন মাসে

পুনরায় জ্যোতিষদাদা কয়েকদিনের ছুটিতে রায়পুর গেলেন। দেরাদুন হইতে ডাক্তার নিয়া ভোলানাথকে দেখাইলেন।

রায়পুর বাসকালীন নির্ভীক জীবন।

ছুটি ফুরাইয়া যাওয়ায়, জ্যোতিষদাদা ঢাকায় ফিরিয়া আসিলেন। মা ঐ ভাবেই আছেন। অসুখ করিয়াছে; চুলগুলি জটা বাঁধিয়া যাওয়ায় কাটাইয়া দিয়াছেন। আলোর পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত করিতে দেন নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সকলে নিজের কম্বলে স্থান নিতেন। পাহাড়ের মধ্যে পুরাণো দালান, সাপ ও অন্যান্য জীবের ভয় যথেষ্ট আছে। কিন্তু আশ্চর্য্য, তাহার প্রতিরোধের কোনই বন্দোবস্ত নাই।

৬।৭ মাস তথায় থাকিয়া ৺তারাপীঠের পূর্ব্ব আদেশ মত, কমলাকান্তকে নিয়া মা ও ভোলানাথ, কার্ত্তিক কি অগ্রহায়ণ মাসে ৺তারাপীঠে

রায়পুর হইতে ৺তারাপীঠ এবং তথা হইতে নলহাটি গমন।

আসিলেন। কিন্তু কাহাকেও খবর দেওয়া হইল না। কারণ, সকলেই তাহা হইলে ৺তারাপীঠে গিয়া উপস্থিত হইবেন। মা ৺তারাপীঠে আসিয়াছেন, এ খবর গুপ্ত রহিল না। কিন্তু মার নিষেধ, তাই কলিকাতা হইতেও কেহ যাইতে পরিতেছে না। নন্দু মার নিষেধ না মানিয়া ঢাকা হইতে ৺তারাপীঠে গিয়া উপস্থিত হইল। মা ও ভোলানাথ প্রায় এক কি দেড়মাস ৺তারাপীঠে রহিলেন। ইতিমধ্যে বড়দিনের বন্ধে মনোরমাদিদিকে নিয়া জ্যোতিষদাদা ৺তারাপীঠে গেলেন। উপেন্দ্রবাবুও (ডাক্তার) মার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য পণ্ডিচারী হইতে কলিকাতা আসিয়া কয়েকদিনের জন্য ৺তারাপীঠে গেলেন। পরে মার আদেশ মত আবার পণ্ডিচারী চলিয়া গেলেন। পৌষ মাসে বড়দিনের বন্ধের মধ্যে মা ও ভোলানাথ কমলাকান্ত, নন্দু, জ্যোতিষদাদা এবং মনোরমাদিদিকে নিয়া নলহাটি (পীঠস্থানে) গেলেন।

নন্দু ও ভোলানাথ মাকে অনেক বলিয়া কহিয়া সকলের তথায় যাওয়ার অনুমতি আনিল। আমাদের টেলিগ্রাম করিল এবং কলিকাতায় ভক্তদের বাড়ী বাড়ী যাইয়া মার অনুমতির সংবাদ দিল। তখন সকলেই মহানন্দে কলিকাতা হইতে নলহাটি রওনা হইলেন। আমি ও বাবা ঢাকা হইতে নলহাটি গেলাম। পরে দাদামহাশয় এবং দিদিমাও তথায় গিয়াছিলেন। সেখানেও মন্দির সংলগ্ন একটি পুরান দালানে মা ছিলেন। আমরা সন্ধ্যার পরে গিয়া মার কাছে পৌঁছিলাম। তার পূর্ব্বেই কলিকাতা হইতে যতীশদাদারা সপরিবারে গিয়াছেন। বেবীদিদি ও গিরীনদাদা সপরিবারে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি লাভে নানাস্থানের ভক্তগণের নলহাটিতে মায়ের নিকট গমন ও বান।

গিয়া দেখিলাম, মা ছাদে একখানা কম্বল গায় দিয়া বসিয়া আছেন। চুল কাটা, খুবই রুগ্ন চেহারা। সকলে মার চারিদিকে বসিয়া আছেন। মা মৃদুস্বরে, ধীরে ধীরে কথা বলিতেছেন। বেশী জোরে কথা বলিতে পারিতেছেন না। ভোলানাথও ঘরে বসিয়া আছেন। তিনি বাহির হইবার কিছুদিন পর হইতেই বাক্‌সংযম করিয়া আছেন। জ্যোতিষদাদা বড়দিনের ছুটি ফুরাইয়া যাওয়ায় ঢাকা ফিরিয়া গিয়াছেন। মনোরমাদিদি টেলিগ্রামেই স্বামীর আদেশ নিয়া ৺কাশীতে সাধন ভজনের সুবিধার জন্য চলিয়া গিয়াছেন। এই হইতেই তিনি বাড়ী-ছাড়া হইলেন। মা বাহির হইয়া যাওয়ার পর, আষাঢ় কি শ্রাবণ মাস হইতেই, তিনিও বাক্‌সংযম করিয়া আছেন। মা প্রায় ১৪।১৫ দিন নলহাটি রহিলেন। নানা স্থান হইতেই ভক্তেরা তথায় গিয়া উপস্থিত হওয়ায় ভিড় লাগিয়াই আছে।

আবার মা রায়পুরের দিকেই যাইবেন। আমাদের ঢাকাতেই ফিরিয়া

যাইতে বলিতেছেন। কি করি? মার আদেশ পালন করিতেই হইবে। রওনা হইবার পূর্ব্বে মা আমাকে একান্তে নিয়া পূজার্চ্চনাদি এবং ৺গায়ত্রী সন্ধ্যার সম্বন্ধে যাহা যাহা করিতে হইবে বলিয়া দিলেন। বাবার নিকট হইতেই সব শিখিয়া নিতে আদেশ দিলেন। অমাবস্যা পূর্ণিমায় বাবার ও আমার যজ্ঞ করিবারও আদেশ হইল। রমণার আশ্রম হইতেই যজ্ঞাগ্নি আনিয়া যজ্ঞ করিতে হইবে। বাবাকে আরও বলিলেন, "এই সিদ্ধেশ্বরী স্থানটি সাধনার খুব উপযোগী; স্থানটি খুবই ভাল। এবং পূর্ব্বে আর কেহ এখানে এইভাবে বসিয়া কাজ করে নাই। তুমিই প্রথম বসিয়া কাজ করিতেছ। স্থানটি জাগাইয়া তোলা চাই। আমি ত ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না। বোধ হয়, তোমারই এই কাজ ছিল, তাই তোমাকেই ওখানে বসাইয়া আসা হইয়াছে"—ইত্যাদি ইত্যাদি। মা সকলকে নিয়া অনেকদিন আনন্দ করিলেন। নলহাটিতে একদিন আমার সঙ্গে বসিয়া খাইলেন। তথায় খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত বড় সুবিধার ছিল না। কিন্তু সে দিকে কাহারও খেয়াল ছিল না। মাকে নিয়াই সকলে আনন্দে আছেন।

আমার ও বাবার প্রতি বিশেষ উপদেশ।

রায়পুরে এ'কয় মাস মাছ খাওয়া হয় নাই। ৺তারাপীঠ হইতে মাছের ভোগ হইতেছে। ভোলানাথ খুব শক্তিমতাবলম্বী। কাজেই তিনি বাংলার দিকে আসিলেই মাছ এবং প্রসাদী মাংস খাইতেন। মারও কিছু নিষেধ ছিল না সত্য কিন্তু পূর্ব্বেই লিখিয়াছি মা সকলের অনুরোধে কয়েক বৎসর যাবৎই মাছ সামান্যই মুখে দিতেন। এখন দেখিলাম, মাছ প্রায় মুখেই দেন না। কোন কোন দিন, ভোলানাথ বলিলে একটু খাইতেন। ব্রহ্মচারীদেরও মা ঢাকার আশ্রমে

শ্রীশ্রীমা নিরামিষ আহারের পক্ষপাতিনী।

মাছ মাংস খাওয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছে। অবশ্য ভোলানাথের আদেশে ৺কালীর কাছে একটা মাছের ভোগ দেওয়া হইত। কিন্তু সেই প্রসাদ বিলাইয়া দেওয়া হইত। নিরামিষ ভোগের প্রসাদই ব্রহ্মচারীরা কয়জন নিতেন। আমিও ৩.৪ বৎসর মার আদেশে মার প্রসাদী মাছের প্রসাদ নিয়াছিলাম। পরে মার কাছে অনুমতি নিয়াই তাহা বন্ধ করিয়া দিলাম। বাবারও নিরামিষই খাওয়ার আদেশ হইয়াছিল। মরণীকে মা ছোট বেলা হইতেই মাছ মাংস বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কাজেই দেখা যায়, মা নিরামিষ আহারেরই পক্ষপাতী। দেখিলাম ঢাকা, কলিকাতাতে মাকে যেমন বড় বড় পাড়ওয়ালা সাড়ী পরাইত, এখন মার পরণে সেই রকম সাড়ী নাই; ছোট লালপেড়ে সাধারণ কাপড়ই পরেন। কয়েকদিনের মধ্যেই নলহাটির লোকেরাও মার কাছে আসিতে লাগিল। কীর্ত্তনাদি আরম্ভ হইল। কিন্তু মা সেই সময়তেই নলহাটি ছাড়িলেন।

নলহাটি ত্যাগ ও রায়পুরে পুনর্গমন এবং ভক্তগণের প্রতি উপদেশ। (মাঘ, ১৩৩৯।)

নলহাটি হইতে সকলকে নিয়া মা হাওড়া ষ্টেশনে আসিলেন। পরে ষ্টেশন হইতেই দেরাদুন রওনা হইয়া গেলেন। দেরাদুন হইতে রায়পুর চলিয়া গেলেন। সঙ্গে শুধু ভোলানাথ ও কমলাকান্ত। আমাদের ঢাকা সিদ্ধেশ্বরীতেই থাকিবার আদেশ করিয়া গেলেন। অবশ্য, ইচ্ছা হইলে ৺কাশী এবং ৺বিন্ধ্যাচল যাইতে পারি, ইহাও বলিয়া গেলেন। কিন্তু মা যেখানে ফেলিয়া গিয়াছেন, বাবা সেখানেই পড়িয়া রহিলেন, অন্য কোথায়ও গেলেন না। মা চলিয়া যাওয়ার পরই, আমরা সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে চলিয়া গেলাম। এবং মার আদেশ মত পূজা সন্ধ্যাদি করিতে লাগিলাম। রমণার আশ্রমে ৺অন্নপূর্ণার মন্দিরের পূজার ভার যোগেশদাদার উপর। ৺শিবপূজা, ৺চণ্ডীপাঠ, ৺গীতাপাঠ

ইত্যাদি কুলদা দাদা করেন। ৺পাদপীঠ পূজা, ভোগ ও পাঠ ইত্যাদি অতুল করে। সিদ্ধেশ্বরী ৺শিবপূজা বাবাকে করিতে বলিয়া গিয়াছেন। পরে আমিও কিছুদিন করিলাম। রমণা আশ্রমে রোজই যজ্ঞ হইতেছে এবং চরু পাক হয়। প্রতিদিন আশ্রমবাসীদের এক এক জনের উপর এক এক দিন সেই চরু খাইবার আদেশ দিয়া গিয়াছেন। যে দিন যিনি চরু খাইবেন, সেই দিন তিনি ফল ও কাঁচা দুধ ছাড়া আর কিছুই খাইতে পারিবেন না এই মার আদেশ। ঢাকা থাকিতে মা নিজেও সপ্তাহের মধ্যে একদিন চরু খাইয়া এই নিয়ম পালন করিয়া করিয়া গিয়াছেন। বাবা প্রতি শনিবারে চরু প্রসাদ নিতে রমণার আশ্রমে যান। তা' ছাড়া আমরা দুই জনে সিদ্ধেশ্বরীর আশ্রম ঘরটির মধ্যেই দিন রাত্রি থাকিতাম। কোথায়ও বাহির হইতাম না। মার আদেশেই বাবা প্রতি মাসে দুইদিন ২৪ ঘণ্টাই আসনে বসিয়া থাকিতেন। শ্বাসের ক্রিয়াও নিয়ম মত বাবাকে করাইতেছেন। তাহাতে বাবার শরীর বেশ সুস্থ আছে এবং বসিতেও খুব পারেন। মা কখনও এ সব বিষয় কোন বই-এ পড়েন নাই, বা কোন সাধুর মুখেও এইসব শ্বাসে ক্রিয়ার কথা শোনেন নাই। অথচ সবই যেন মার জানা আছে। পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে, সাধনা সম্বন্ধে যখনই যে কথা উঠিয়াছে, মা সব কথারই পরিষ্কার উত্তর দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। পুঁথিগত বিদ্যা ছিল না; তাই ভাবায় পারিপাট্য ছিল না—নিজের ভিতর সবই উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই সাধারণ ভাষায়, উপলব্ধির কথা সব বলিয়া যাইতেছেন। সকলে শুনিয়া মুগ্ধ হইত।

১৩৩৯ সনের মাঘ মাসে নলহাটি হইতে মা রায়পুর গিয়াই রহিলেন। মধ্যে মধ্যে এখন ভোলানাথের চিঠি আসিতেছে। সম্ভবতঃ মা যাওয়ার মাসখানেক পরেই অর্থাৎ ১৩৩৯ সনের ফাল্গুন

মাসেই, জ্যোতিষদাদা আবার রায়পুরে গেলেন। এবারও ছুটি নিয়াই গেলেন। কিন্তু সকলেই অনুমান করিলেন, এই ছুটির পরই তিনি পেন্সন নিবেন, এবং মার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবেন। চৈত্রমাস পর্য্যন্ত মা বোধ হয় রায়পুরেই রহিলেন। পরে দেরাদুন হইয়া মুসৌরী গেলেন। রায়পুরেই শ্রীযুক্ত হরিরাম যোশীর সহিত পরিচয় হইল। ইনি আলমোড়ার লোক; দেরাদুনে চাকরি উপলক্ষে থাকেন। পরে ধীরে ধীরে দেরাদুনের আরও কয়েকজনের সহিত পরিচয় হইল। মুসৌরী কিছুদিন থাকিবার পর, ভোলানাথকে ১৩৪০ সনের বৈশাখে, ৺বদ্রিনারায়ণ পাঠাইয়া দিলেন। কমলাকান্তকে সঙ্গে দিয়া দিলেন।

রায়পুর-বাস, দেরাদুন হইয়া মুসৌরী গমন এবং ভোলানাথকে ৺বদ্রিনারায়ণ দর্শনে প্রেরণ। (সন ১৩৪০, বৈশাখ)।

এদিকে ঢাকাতে ১৩৪০ সনের বৈশাখ মাসে নিয়ম মতই মার জন্মোৎসব হইয়া গেল। মার যাওয়ার দিন যে কায়স্থদের (মনোরমা দিদির) ভোগ হইয়াছিল, বেবী দিদির উদ্যোগে (ব্রাহ্মণ ছাড়া) কায়স্থ ও বৈদ্যরা মিলিয়া সেইরূপ ভাবে আলুনী তরকারি ও লুচি দিয়া মার উদ্দেশ্যে ভোগ দিলেন। অখণ্ডভাবে নাম রক্ষা, চরু খাইয়া থাকা প্রভৃতি সবই নিয়মিত ভাবেই হইল।

১৩৪০ সন ঢাকায় শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব।

জ্যোতিষদাদা মার সঙ্গেই রহিলেন। মা তাঁহাকে সঙ্গে নিয়া হাঁটিয়াই একেবারে ৺উত্তরকাশী পর্য্যন্ত গেলেন। মুসৌরী হইতে ৺উত্তরকাশী ৬০।৬৫ মাইল ব্যবধান। পার্ব্বত্য পথ। একদিন মা নাকি ২৫ মাইল হাঁটিয়াছিলেন। পরে তথা হইতে ফিরিয়া, আবার মুসৌরী, এবং তথা হইতে দেরাদুনে আসিলেন।

৺উত্তরকাশী গমন ও তথা হইতে ফিরিয়া নানা তীর্থস্থান পর্য্যটন।

(প্রথমে টপ্‌কেশ্বরে ছিলেন)। এইভাবে মা দেরাদুন, ৺হরিদ্বার, লছমনঝোলা, ৺হৃষিকেশ ঘুড়িয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কাশ্মীরী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী প্রভৃতি নানা দেশের লোক মার কাছে আসা যাওয়া করিতে লাগিল এবং মাকে দেবী জ্ঞানে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে লাগিল।

ভোলানাথ ৺বদ্রিনারায়ণ, ৺কেদারনাথ, ৺যমুনোত্রী হইয়া ৺উত্তরকাশী আসিয়া বসিলেন। হয়ত, পূর্ব্বেই মার সহিত তাঁহার এইরূপ কথা হইয়া থাকিবে। মাও ইতিপূর্ব্বেই ৺উত্তরকাশী হইয়া আসিয়াছেন। অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সহিতও মার পরিচয় হইতেছে। প্রথম প্রথম স্ত্রীলোক বলিয়া, মার কাছে তাঁহারা বড় আসিতেন না। কিন্তু পরে মার কাছে আসিয়া অনেকেই নিজের জীবন-কাহিনী খুলিয়া বলিতেন এবং সাধনার বিষয় অনেক উপদেশ নিতেন।

উক্ত সময়ের বিবরণ। (১৩৪০, বৈশাখ-পৌষ)।

নলহাটি হইতে আসিবার সময় হাওড়া ষ্টেশনে গুজরাটী একটি ছেলে মাকে দর্শন করে। সে দন্ত চিকিৎসক। কয়েকদিন পর সে গিয়া মার কাছে উপস্থিত হয় এবং মার অনেক খবর ঢাকা এবং কলিকাতায় লিখিয়া জানায়। তারপর ভোলানাথ ৺উত্তরকাশী হইতে ফিরিয়া আসিবার পর, ১৩৪০ সনের আশ্বিন মাসে নির্ম্মলবাবু সপরিবারে মার কাছে দেরাদুন গেলেন। তথায় গিয়া মাকে না পাইয়া ৺হরিদ্বার, ৺হৃষীকেশ ঘুরিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে লছমনঝোলায় গিয়া মাকে পাইলেন। মা গঙ্গার ধারে ধর্ম্মশালায় জ্যোতিষদাদাকে নিয়া আছেন। সেখানে মা সেবার কয়েকদিন পূর্ব্বেই গিয়াছেন। নির্ম্মলবাবুরা যাওয়ার পর দিনই মা তাঁহাদের নিয়া ৺হরিদ্বার চলিয়া আসিলেন এবং গঙ্গা-

লছমনঝোলা ও ৺হরিদ্বার বাস।

মন্দিরে মা রহিলেন। নির্ম্মলবাবুদের অন্য এক ধর্ম্মশালায় থাকিতে বলিলেন। পরদিনই ভোরে জ্যোতিষদাদা তাঁহাদের নিকট গিয়া, মার কাছেই ভোগ পাক করিবার জন্য তাঁহাদিগকে ডাকিয়া নিয়া গেলেন।

এইভাবে কয়েকদিন থাকিয়া হঠাৎ মা সকলকে নিয়া দেরাদুন গিয়া উপস্থিত হইলেন। মা দেরাদুন আনন্দচকে ৺মনোহর মন্দিরেই বেশী থাকিতেন। অন্যান্য স্থানেও মধ্যে মধ্যে গিয়া থাকিতেন। দেরাদুনে তখন বহু লোক মার ভক্ত হইয়াছেন। মার আদেশে তাঁহারা কীর্ত্তনাদি করেন, উপবাসাদিও করেন। নির্ম্মলবাবুরা গিয়া দেখিলেন, সেখানে পূর্ব্ব হইতেই মার আদেশে যজ্ঞ ও কীর্ত্তনাদি হইতেছে। মাকে পাইয়া, তাঁহারা মহা আনন্দিত হইলেন। মা ৺দুর্গাপূজার মধ্যে তথায় পৌঁছিলেন। কুমারী পূজা ও কুমারী ভোজনের উৎসবাদি মার আদেশে সকলে মিলিয়া করিলেন। এইভাবে উৎসবাদি করিয়া কয়েকদিন মা সেখানেই রহিলেন।

দেরাদুন-বাস।

৺পূজার পরই জ্যোতিষদাদার জ্বর হইল। সেই জ্বর না ছাড়িতেই (পূর্ণিমার পূর্ব্বে) মা জ্যোতিষদাদা, নির্ম্মলবাবু প্রভৃতিকে নিয়া ৺হরিদ্বার চলিয়া আসিলেন এবং গঙ্গামন্দিরে রহিলেন। দন্ত-চিকিৎসক ছেলেটি সঙ্গেই আছে। লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন মার ভোগাদি দিয়া নির্ম্মলবাবু সপরিবারে ৺কাশী চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের পত্রেই উপরোক্ত সব খবর পাইলাম। আরও পাইলাম, "মা এখন সরু চুলপেড়ে ধুতিই পরেন। গায়ে সেমিজ নাই; ফতুয়ার মত জামা ব্যবহার করেন। মাথায় কাপড় দেন না। চুল একটু বড় হইয়া কাঁধে পড়িয়াছে। পার্ব্বত্য পথে ভয়ানক পাথরে পা কাটিয়া যায় বলিয়া, মাকে সকলে জুতা পরাইয়াছে। গায়ের চাদরও মা অনেকটা পুরুষের মত করিয়াই দেন। রাস্তা দিয়া সর্ব্বদাই এখানে

পুনশ্চ ৺হরিদ্বার-বাস।

ওখানে যান। দেখিলে যুবক ব্রহ্মচারী বলিয়াই মনে হয়। সঙ্গে জিনিষ-পত্র বিশেষ কিছুই নাই—সামান্য ঘটি, কম্বল আর ২।১ খানা কাপড় মাত্র। জ্যোতিষদাদাও জুতা, জামা ছাড়িয়াছেন; ৮ হাতি কাপড় পরেন। কম্বল ও চাদর দিয়াই শরীর রক্ষা করেন। মার থাকিবার কোন ঠিক নাই; হঠাৎ রাত্রি ১০টায় কি ১২টায় এক জায়গা হইতে অন্যত্র চলিয়া যান। ওখানকার অনেক লোকই এখন মার জন্য খুব ব্যস্ত;" ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাবাকে দেরাদুনে আহ্বান। (পৌষ, ১৩৪০)।

আমাদের ডাকিতেছেন না কেন জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "বাবা-ত কোন চিঠিতে আসিবার কথা লিখেন না। বাবা হয়ত নির্ভর করিয়াই বসিয়া আছেন যে, মা যখন ডাকিবেন, তখন যাইব"। এই কথা শুনিয়াই বাবা যাইবার অনুমতি চাহিয়া পত্র লিখিলেন। এতদিন বাবা, 'মা ফেলিয়া গিয়াছেন, আবার যখন কৃপা করিয়া কাছে যাইতে আদেশ দিবেন, তখনই যাইব; নিজের ইচ্ছায় মার ইচ্ছা বাধা করিব না' এইভাব নিয়াই বসিয়াছিলেন। ভিতরে মার জন্য অস্থির থাকিলেও, কখনও যাইবার কথা জিজ্ঞাসাও করেন নাই। এই চিঠি পাইয়া, অনুমতির জন্য লিখিলেন; আরও কি কি কথা ছিল। মা জ্যোতিষদাদাকে দিয়া লিখাইলেন, মার কাছে না গেলে সব কথার মীমাংসা হইবে না; অতএব পত্র পাওয়া মাত্র চলিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন। তখন ১৩৪০ সনের পৌষ মাস। গত পৌষ মাসে নলহাটিতে মার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল; আর এই এক বৎসর মাকে দেখি নাই। পত্র পাইয়া আমরা মহা আনন্দিত হইলাম। ২।১ দিনের মধ্যেই মার কাছে রওনা হইয়া গেলাম। বেবী দিদিও আমাদের সঙ্গে গেলেন। ৺কাশী হইতে মনোরমা দিদিও আমাদের সঙ্গে গেলেন।

মা জ্যোতিষদাদার অসুখে কিছুদিন ৺হরিদ্বারেই ছিলেন, পরে আবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেরাদুন গিয়াছেন। আমরা মাকে দেরাদুনে মনোহর মন্দিরে গিয়া পাইলাম।

মা কিছুদিন যাবৎ তথায়ই আছেন। দেখিলাম, মা অনেকটা শুকাইয়া গিয়াছেন, চিঠিতে যাহা যাহা খবর পাইয়াছিলাম ঠিকই; মার বেশভূষার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন। ধীরে ধীরে এই পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই অল্প দিনেই যথেষ্ট পরিবর্ত্তন। মাকে এখন বিদেশী লোকেরাই প্রায় সব সময় ঘিরিয়া বসিয়া থাকে। বাঙ্গালীও ২।৪ জন আসেন; তাহার মধ্যে মন্মথবাবু, নিমাইবাবু, রমেশবাবু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই কয়জনই সর্ব্বদা আসেন। মা হিন্দিতে কথাবার্ত্তা বলেন।

দেরাদুন-জীবনের বিবরণ।

আনন্দচকের দ্বারকানাথ রয়না ও তাঁহার স্ত্রী, কাশীবাবু এবং তাঁহার স্ত্রী, প্রকাশবাবু ও তাঁহার মা এবং স্ত্রী, ত্রিলোকীবাবু সপরিবারে, আরও ২।১ পরিবার (ইহাদের আত্মীয়) সর্ব্বদাই মার কাছে আসিতেন। ইহারা সকলেই কাশ্মীরী। মা কাশীবাবুর স্ত্রীর নাম "লছমী" এবং দ্বারকাবাবুর স্ত্রীর নাম "মীরা" ও প্রকাশবাবুর মায়ের নাম "কৌশল্যা" রাখিয়াছেন।

সকলকেই প্রায় বেদান্তের আত্মা-পরমাত্মার কথাই বলিতেছেন। ঐ দিকের লোকেরা তাহাই ভাল বোঝে। পুরুষেরাই সকলে মার সেবা করিতেছে। যে যাহা আনিতেছে, নিজেরাই মাকে একটু মুখে দিয়া প্রসাদ নিয়া চলিয়া যাইতেছে। শুনিলাম, মা ও জ্যোতিষদাদা এত দিন মন্দিরের বারান্দায়

জ্যোতিষদাদা শ্রীশ্রীমায়ের "ধর্ম্মপুত্র" এবং ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত।

ছিলেন। শীতের জন্য এখন একটি ছোট কুঠুরিতে স্থান নিয়াছেন। এই কুঠুরিটিও মন্দির সংলগ্ন। মা বাহির হইবার পর হইতে, কোন গৃহস্থের বাড়ী ঢুকিতেছেন না। ধর্ম্মশালায় ও মন্দিরেই থাকেন।

মা রুটী তরকারিই খান; জ্যোতিষদাদাও সেই প্রসাদই পান। কিছুদিন পর্য্যন্ত সপ্তাহে একদিন করিয়া জ্যোতিষদাদার ভিক্ষা করিয়া খাইবার আদেশ ছিল। যেদিন কিছু পাইতেন না, সেই দিন উপবাসী থাকিতে হইত।

মা জ্যোতিষদাদাকে "ধর্ম্মপুত্র" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং শাহাবাগে যে জ্যোতিষদাদাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মার একটা ভাব ভাসিয়া উঠিয়াছিল, পরে রমণার আশ্রমে মা নিজের পৈতা জ্যোতিষদাদাকে দিয়াছিলেন (এ সব কথা পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে) এখন জ্যোতিষ-দাদা সেই জন্য ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। সেখানকার সকলেই মার "ধর্ম্মপুত্র" জ্ঞানে জ্যোতিষদাদাকে "ভাইজী" বলিয়া সম্বোধন করে এবং অনেকেই খুব ভালবাসে। মাও তাঁহার সহিত সন্তানের মতই ব্যবহার করেন। "তুই" বলিয়াই বলেন। মার এই ব্যবহারে তাঁহারও অনেকটা ছেলেমানুষের ভাব আসিতেছে। তিনি যে সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, বিচার বুদ্ধি খুব ছিল, এ সব ভাব অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। মার ছেলের মতই মার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া মার সেবাতেই জীবন কাটাইতেছেন। তিনি ছুটির পর, পেন্সন্ নিয়াছেন; আর সংসারে যাইবার ইচ্ছা নাই। মার আদেশে স্ত্রীকেও সংসার ছাড়িয়া আসিয়া ৺হরিদ্বার কি ৺কাশীতে তাঁহার সঙ্গে থাকিতে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রাজি হন নাই। মাও তাঁকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সে সব উপদেশে কোন ফলই দেখা যায় নাই। স্ত্রী ঢাকা ছাড়িয়া আসিতে রাজি হইলেন না। একমাত্র পুত্র "রামানন্দ"কে নিয়া

তিনি ঢাকাতেই আছেন। জ্যোতিষদাদার স্ত্রী ও পুত্র ভগবান ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা নিয়াছেন। তাঁহারাও গুরুর উপদেশে সাধন ভজন করেন।

উনবিংশ অধ্যায়

মা দেরাদুনে যেখানে যেখানে থাকিতেন, আমাদিগকে তাহা দেখাইয়া আনিলেন। মার আদেশে দেরাদুনে যজ্ঞের আগুন দিন রাত্রি রক্ষা হইতেছে। মা তাহাও একদিন আমাদের দেখাইয়া আনিলেন। আরও দেখিলাম, মনোহর মন্দিরেই মার স্মৃতিরক্ষার্থ একটি যজ্ঞমন্দির উঠিতেছে। শুনিলাম, একবার মা ৺হৃষিকেশ কি লছমনঝোলা গিয়াছেন। দেরাদুন হইতেও কয়েকটি ভক্ত গিয়া তথায় উপস্থিত। ৺জন্মাষ্টমীতে মার কাছে থাকিবেন বলিয়া, সেই তিথির ২।১ দিন পূর্ব্বেই তাঁহারা মার কাছে গিয়াছেন। এদিকে ৺জন্মাষ্টমীর পূর্ব্ব দিন হঠাৎ মা সকলকে নিয়া, মনোহর মন্দিরে আসেন। মনোহরলালের একটি মন্দিরে ৺রাধাকৃষ্ণ এবং অপর একটি মন্দিরে ৺শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। প্রতি বৎসর ৺জন্মাষ্টমীতেই এই মন্দিরে খুব উৎসব হয়। এবারও সব যোগাড় হইয়াছে। মার আদেশে সেইদিন যজ্ঞেরও বন্দোবস্ত করা হইল। কোথাও জায়গা ঠিক হইল না। পরে ঐ দুই মন্দিরের মধ্যস্থানে যেখানে মা শুইতেন, সেইখানকারই ২।৪ খানা পাথর উঠাইয়া কুণ্ড করা হইল এবং এই কুণ্ডে যজ্ঞ করা হইল।

মনোহর মন্দিরে ৺জন্মাষ্টমীর দিনে যজ্ঞ।

এই স্থানটির সম্বন্ধেও একটি ঘটনা আছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে মা একদিন বারান্দায় শুইয়া আছেন; এমন সময়ে একটি কালো, ছোট সাপ ঐ বারান্দায় আসে। জ্যোতিষদাদা চমকিয়া সরিয়া গেলেন। মা বসিয়া বসিয়া দেখিতেছেন। সাপটি আসিয়া এক জায়গায় বসিল। কিছুক্ষণ পর, কোথায় চলিয়া গেল, দেখা গেল না। জ্যোতিষদাদা

ভাল করিয়া খুঁজিবার জন্য লোক ডাকিতে চাহিয়াছিলেন। মা নিষেধ করিলেন। ৺জন্মাষ্টমীর যজ্ঞস্থান আর কোথাও না হইয়া যেখানে হইল, সাপটি আসিয়া ঠিক সেখানেই বসিয়াছিল। মা'ই এই গল্প করিলেন। এর ভিতর কি রহস্য, মা'ই জানেন।

৺জন্মাষ্টমীর দিন যজ্ঞ হইয়া যাওয়ার পরই, মা রাজপুর রোডের কাছে জাখম-মন্দিরে চলিয়া গেলেন। পর দিন সকালে মা ঐ মন্দিরেই বসিয়া আছেন। বৃষ্টি হইতেছে। কিছুক্ষণ পর হাঁটিয়াই মনোহর মন্দিরে রওনা হইলেন। হরিরাম প্রভৃতি গাড়ী করিয়া মার কাছেই যাইতেছিল। পথে তাহাদের সহিত দেখা হইল। মা সেই গাড়ী করিয়াই মনোহর মন্দিরে আসিয়া দেখেন, যজ্ঞস্থান পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তখনই মা বলিলেন, "এই যজ্ঞের একটু বিভূতি রাখিয়া দেও।" মার মুখেই এই ঘটনা শুনিয়াছি।

ঐ মন্দিরের নিকট শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিমন্দির স্থাপনের ইতিহাস।

মা বলিতেছেন, "দেখ রাস্তায় যদি গাড়ী না পাওয়া যাইত, তবে হাঁটিয়া আসিতে আসিতে যজ্ঞকুণ্ডের সব বিভূতি ফেলিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিত। কিন্তু যাহা হইবার, এই ভাবেই হয়।" পরে ঐ বিভূতি নিয়া একটা জায়গায় মাটির মধ্যে রাখা হইল। তাহার উপরই মন্দির উঠিতেছে। সেই স্থানেই যজ্ঞকুণ্ড করা হইবে এবং প্রতিবৎসর ৺জন্মাষ্টমীর দিন ঐ কুণ্ডে যজ্ঞ হইবে। অপর সময়তেও কেহ ইচ্ছা করিলে ঐ কুণ্ডেই যজ্ঞ করিতে পারিবেন। তাহারা ঐ মন্দিরের গায়ে লিখিয়াছে, "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর শুভাগমন উপলক্ষে" এবং মন্দিরের মধ্যে মার ছবি (বড় করিয়া) টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছে।

এই যজ্ঞের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী কমলা নেহেরু, মার কাছে যাওয়া আসা করিতে থাকেন

এবং মার খুব অনুরক্ত হইয়া পড়েন। তিনি একবার দেরাদুন আসিয়া, মা ৺জন্মাষ্টমীতে যজ্ঞ করাইয়াছেন এবং সকলেই তাহাতে ফল ফুল আহুতি দিয়াছেন ইত্যাদি খবর শুনিয়া, মাকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন, "মাতাজী আমাকে কেন তখন উপস্থিত করিলেন না? আমি কিছু দেখিতে পারিলাম না।" মা বলিলেন, "বেশ ত ভাল কাজ যখন ইচ্ছা হয় করিতে পারা যায়; তুমিও একদিন কর।" তিনি তাহাতে খুব উৎসাহিত হইয়া যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীমা ও শ্রীমতী কমলা নেহেরু। অম্বিকা মন্দিরে শ্রীমতী নেহেরুর যজ্ঞ।

মা তাঁহাকে নিয়া রাজপুরের রাস্তায় পাহাড়ের উপরে "অম্বিকা মন্দিরে" গেলেন এবং তথায়ই তিনি মার আদেশ মত যজ্ঞাদি করিলেন। সেই যজ্ঞোপলক্ষে দেরাদুন হইতে বহু স্ত্রীলোক পুরুষ তথায় একত্র হইলেন। খুব সমারোহের সহিত যজ্ঞ হইয়া গেল। মার আদেশে সেইখানেই ৩ দিন যজ্ঞাগ্নি রক্ষা করা হইল। পরে সেই যজ্ঞাগ্নি মনোহর মন্দিরে আনিয়া রাখা হইল। দুই বেলাই তাহাতে আহুতি দেওয়া হইতে লাগিল। পরে সেই অগ্নি আলমোড়ার একটি ভক্ত (ভৈরবজী) মার আদেশে নিজের বাড়ীতে নিয়া, সেই অগ্নিরক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই সব ঘটনা শুনিলাম।

দেখিলাম, কাশ্মীরী, পাঞ্জাবী সব স্ত্রীলোকেরা মাকে মালা দিয়া সাজাইয়া, কর্পূরাদি দ্বারা আরতি করেন। মা সেখানে কাহারও নাম 'গোপালজী', কাহারও নাম 'বালগোবিন্দ', কাহারও নাম 'লছমীরাণী', কাহারও নাম 'মীরা' রাখিয়াছেন।

কাশ্মীরী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি মহিলাগণ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীমায়ের অর্চ্চনা ও তাঁহার উপদেশ।

"এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি" বেদান্তের এই

বাণীই প্রচার করিতেছেন। বুঝাইতেন, "দেখ, আমরা কিন্তু একের মধ্যেই আছি। এক পা এক পা করিয়া হাঁটিতে হয়, এক গ্রাস এক গ্রাস করিয়া খাইতে হয়, এক একটি করিয়া অক্ষর লিখিতে হয় ইত্যাদি।

জ্যোতিষদাদা ঢাকাতে "মা" "মা" নামে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াই গিয়াছিলেন। সেখানেও "মা" "মা" নামে কীর্ত্তন হয়। শুনিলাম, আমরা যাওয়ার কিছুদিন পূর্ব্বেই শঙ্করানন্দ স্বামী ও মনোরমা দিদি আসিয়া মার সঙ্গে লছমনঝোলা কিছু দিন থাকিয়া গিয়াছিলেন। মীরজাপুর হইতে কুলদা দাদাও গিয়াছিলেন।

আমরা প্রায় মাসখানেক থাকিবার পর, মা আমাদের ফিরিয়া আসিবার কথা বলিলেন। সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, "তোমাদের যে দূরে রাখিতেছি, তাহাও মঙ্গলের জন্য। পরে বুঝিতে পারিবে।"

আসিবার কিছু দিন পূর্ব্বে, পৌষসংক্রান্তির দিন মা, বাবার, আমার এবং মনোরমারদিদির বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করাইয়া, হরিদ্রা বর্ণের বস্ত্র পরিতে আদেশ দিলেন। বাবার জামা একেবারেই ছাড়াইয়া দিলেন। আমাকে কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই মার চুলপেড়ে ধূতি ও ফতুয়া পরাইয়াছিলেন। এখন তাহাই হরিদ্রা বর্ণের করিয়া দিলেন মাত্র। এইভাবে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন এবং আরও যাহা যাহা নিয়মাদি পালন করিতে হইবে, বলিয়া দিলেন।

বাবার, মনোরমাদিদির ও আমার নাম ও বেশ পরিবর্ত্তন করাইয়া আমাদিগকে দেরাদুন হইতে বিদায়। (মাঘ, ১৩৪০)।

আমার নাম দিলেন, "গুরুপ্রিয়া।" মনোরমাদিদির নাম দিলেন, "কৃষ্ণপ্রিয়া।" বাবার নাম দিলেন, "অখণ্ডস্বরূপ।" আমাদের ৺বিন্ধ্যাচল আশ্রমে থাকিবার আদেশ দিলেন এবং আমাকে ব্রহ্মচারিণী ভাবেই থাকিতে বলিলেন।

৺বিন্ধ্যাচলে একটি যজ্ঞমন্দির করিবার জন্য বাবাকে বলিয়া দিলেন। কি ভাবে করিতে হইবে, সব বলিয়া দিলেন। ইহাও বলিলেন, "তুমি প্রস্তুত করিয়া রাখ, যখন কাজ আরম্ভ হইবার হয়, হইবে।" এই সব কথাই মা একান্তে নিয়া বাবাকে ও আমাকে বলিলেন। বলিয়াছি, মা যাহাকে দিয়া যাহা করাইতেন, শুধু তাহার কাছেই তাহা প্রকাশ করিতেন। এই জন্য মার ঘটনা সব জানিবার উপায় নাই। মাঘ মাসেই মা আমাদের বিদায় করিয়া দিলেন।* ভোলানাথ উত্তর কাশীতেই আছেন। সঙ্গে কমলাকান্ত ব্রহ্মচারীই আছে।

আসিবার সময় মা আর একটি কথা বলিয়া দিলেন, "কাশীতে পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করিও, মেয়েদের পৈতার বিধান শাস্ত্রে আছে কি না"? কত বছর পূর্ব্ব হইতেই মেয়েদের পৈতার বিষয় মার খেয়াল উঠিয়াছে; নিজেও নিয়াছিলেন, এখন আর মার গলায় পৈতা ছিল না। ঢাকা হইতে আসিবার সময় যে আমার গলায় দিয়া আসিলেন, আর পৈতা পরেন নাই। পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে, সব নিয়মই মার শরীরের মধ্যে হইয়া যাইত; কিন্তু কিছু স্থায়ী হইত না। আমরা ৺কাশীতে আসিয়া পণ্ডিতদের বাড়ী বাড়ী গিয়া পৈতার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সকলেই বলিলেন, "পূর্ব্বকালে ছিল, ইহা পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান কালের জন্য আমরা মত দিতে পারি না"।

স্ত্রীলোকের পৈতা গ্রহণের কথা এবং পরে ১৩৪২ সনের মাঘ মাসে ৺তারা-পীঠে আমার ও মরণীর উপনয়ন।

---

*এই বিষয়েও একটি বিশেষ কথা এই যে, আমাদের আসিবার একটা দিন ঠিক হইল পরদিনই আমরা রওনা হইব। মা তখন পর্য্যন্ত যজ্ঞমন্দির করিবার কথা কিছুই বলেন নাই। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই দিন আসা হইল

এ বিষয় মহামহোপাধ্যায়, পণ্ডিত-প্রবর, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ, এম, এ, মহাশয়ই সকলের চেয়ে বেশী খবর দিতে পারিবেন ভাবিয়া, তাঁহার কাছে যাওয়া হইল। মাও তাঁহার কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি খোঁজ করিয়া জানিলেন, মেয়েদের পৈতা যে পূর্ব্বকালে প্রচলন ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলিলেন, "মা যদি ইচ্ছা করেন, তবে এখনও দিতে পারেন। মার ইচ্ছাই শাস্ত্র; অন্য মতের প্রয়োজন হয় না"। মাকে সব লিখিয়া জানান হইল। মা বলিলেন, "আর খবর নেওয়ার দরকার নাই। আমার একটা খেয়াল উঠিয়াছে, তাহা শাস্ত্রে আছে কি না, সকলের এই সন্দেহ মনে উঠিতে পারে, তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমি সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে ইহা চালাইতে চাহিতেছি না; অধিকারী ভেদ হওয়া দরকার"। পরে শুনিলাম, একালেও কেহ কেহ মেয়েদের পৈতা দিয়াছেন। আমাদের পক্ষে মার কথাই যথেষ্ট। তবে মা যাহা করিতে বলিয়াছিলেন, করা হইল। এ কথার আর কোন উচ্চবাচ্য এখন হইল না। পরে ১৯৩৬ সনের মাঘ মাসে ৺তারাপীঠে গিয়া ইহা কার্য্যে পরিণত করিলেন। সেখানেই আমার ও মরণীর পৈতা দেওয়াইলেন।

না। দুইদিন পর রওনা হইয়া যাইব, স্থির হইল। সেই সময় আসিবার পূর্ব্বদিন মা একান্তে নিয়া বাবাকে ও আমাকে যজ্ঞমন্দিরের কথা বিশেষভাবে বলিলেন, মাপ ইত্যাদি সব বলিয়া দিলেন। একথা এখন গোপন রাখিতে বলিলেন। তাই বলা হয়, পূর্ব্বে মার কোন সঙ্কল্প থাকে না; উপস্থিত মত এক একটা কারণে মার ভিতর দিয়া এক একটা ঘটনা হইয়া যায়।

বিংশ অধ্যায়

আমরা ৺বিন্ধ্যাচলেই গিয়া রহিলাম। মাও দেরাদুন হইতে বাহির হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সিমলা পাহাড়ের নিকটে "সোলন" গিয়াছেন। তখন ১৩৪০ সনের চৈত্র মাস। হঠাৎ বাবার নিকট জ্যোতিষদাদার এক চিঠি আসিল, "মা চৈত্র মাসের.............তারিখের মধ্যে (তারিখটি ঠিক আমার মনে নাই) আপনাকে ৺হরিদ্বারে আসিতে আদেশ দিলেন। মাও সেই সময় তথায় উপস্থিত হইবেন। আসিবার সময় শঙ্করানন্দ স্বামী ও মনোরমা মাকে ৺কাশী হইতে নিয়া আসিবেন"।

শ্রীশ্রীমায়ের 'সোলন' গমন, (১৩৪০, চৈত্র) এবং বাবার সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বাভাস ও তৎপরে ৺হরিদ্বারে তাহার আয়োজন।

এই সংবাদ পাইয়া আমরা ৺কাশী হইয়া ৺হরিদ্বার রওনা হইয়া গেলাম। সঙ্গে শঙ্করানন্দ স্বামী ও মনোরমা দত্ত গেলেন। আমরা জ্যোতিষ-দাদার লিখিত মত ৺হরিদ্বারের একটা ধর্ম্মশালায় গিয়া দেখি, মা দুইদিন পূর্ব্বেই তথায় পৌছিয়াছেন। ৺হরিদ্বারে আমাদের ট্রেন খুব ভোরে পৌছিয়াছে। আমরা যখন ধর্ম্মশালায় গেলাম, তখন মা শুইয়াছিলেন। আমরা গিয়া মার চরণ ধূলা লইলাম। মা শুইয়া শুইয়াই কথা বলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর মা উঠিয়া বসিলেন। ৺গঙ্গার উপরই এই ধর্ম্মশালাটি; বেশ সুন্দর। দুপুর বেলা রান্না খাওয়া হইল।

সন্ধ্যার পর ৺গঙ্গার ধারে একটা বাঁধান জায়গায় মা বাবাকে ও আমাকে ডাকিয়া নিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "জানই ত আমি

নিজে ইচ্ছা করিয়া কাহাকেও কিছু বলি না। যখন গতবার পৌষ মাসে তোমাদের দেরাদুন ডাকিয়াছিলাম, তখনই আমার খেয়াল হইয়াছিল, তোমার (বাবার) সন্ন্যাস নেওয়ার কথা। কিন্তু তখন বোধ হয়, সময় হয় নাই। তাই তখন আর সে সব কথা উঠিল না। শুধু বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করাইয়া সন্ন্যাসের ভাব নিয়া তোমাকে (বাবাকেই সব বলিতেছিলেন) থাকার কথা বলা হইয়াছিল।

তারপর ঘুড়িতে ঘুরিতে "সোলন" গেলাম। সেখানে একটা গুহার মধ্যে আমাদের কিছু দিন থাকার বন্দোবস্ত করা হইল। কিন্তু যে দিন পৌঁছিলাম তার পর দিনই আমি পড়িয়া আছি, তোমাকে সন্ন্যাসীর বেশে দেখিলাম। তখনই মনে হইল, সময় হইয়াছে। জ্যোতিষকে দিয়া তখনই তোমাকে ৺হরিদ্বার আসিবার জন্য চিঠি লিখাইলাম। ভোলানাথকে চিঠি লিখাইয়াছিলাম।

"চৈত্র সংক্রান্তির দিন তোমার সন্ন্যাস মন্ত্র নেওয়া হইবে। হয়ত তোমার ভিতরে সন্ন্যাসের সংস্কার আছে। তোমাদের চিঠি লিখাইয়া আমিও সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসিলাম। "সোলনে" কিছু দিন থাকিবার সব বন্দোবস্ত করিয়াছিল। হঠাৎ কেন এ সব করিয়া চলিয়া আসিলাম, জ্যোতিষও জানে না। আমি কি করিব? আমিও নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না; যাহা হইবার হইয়া যায়।" এই সব বলিয়া বলিতেছেন, "হরিদ্বার, লছমনঝোলা, হৃষিকেশ এই সব জায়গার মধ্যেই সন্ন্যাস মন্ত্র দিবার উপযুক্ত লোক আছে। খোঁজ করিলেই পাওয়া যাইবে। কালই শঙ্করানন্দকে সেই খোঁজে পাঠান দরকার।"

বাবা সব শুনিলেন। মা বলিতেছেন, কাজেই সন্ন্যাস মন্ত্র নিতে কোন আপত্তি করিলেন না। কিন্তু বলিলেন, "মা, আমি জানি, আমার যাহা কিছু করিবার তুমিই করিবে। এখন অপরের নিকট

হইতে আবার সন্ন্যাস নিতে হইবে, আবার অপর এক জনকে গুরু করিতে হইবে, ইহা আমি ভাবিতেও পারিতেছি না।" মা বলিলেন, "জানই ত, আমি নিজের হাতে কিছু করিতে পারি না।" বাবা বলিলেন, "মা, যখন প্রথম দেখা হয়, তখনই বলিয়াছিলাম, আমার যাহা কিছু দরকার, তুমি করিয়া নিও। আমি কিছুই জানি না। শুধু দাঁড় টানিতে বল, দাঁড় টানিয়া যাইব। আজ কেন অপরের নিকট ফেলিয়া দিতেছ? তুমি যাহা পারিবে না, আমার তাহা দরকার নাই।" এই বলিয়া বাবা চুপ করিয়া রহিলেন।

মা বলিলেন, "বেশ, তাহা হইলে আর কিছু চেষ্টা করিবার দরকার নাই; আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, বলিলাম।" এই কথা বলিয়া মা চুপ করিলেন। কিন্তু দেখিলাম, মা যেন একটু গম্ভীর হইয়া পড়িলেন। যে আনন্দ ভাবটা নিয়া প্রথম কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই ভাবটার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে, মার ভিতরের কিছুই পরিবর্ত্তন না হইলেও, বাহিরে শরীর দিয়া একটা পরিবর্ত্তন দেখা যাইত। মা বলিতেন, "তাহার দরকার আছে।" আর সত্যই দেখিতাম, ইহাতেই অনেক সময় অনেক কাজে সুসম্পন্ন হইত। আজও বাহিক পরিবর্ত্তন দেখিলাম। এই কথাবার্ত্তায় সন্ধ্যা হইয়া গেল।

একটু বেশী রাত্রিতে মা একা একা হাঁটিতেছেন। বাবা সন্ধ্যা হইতেই বোধ হয় এ বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। মাকে একা দেখিয়া বাবা তখন মার কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, আমার মনে যে ভাব উঠিয়াছিল, তাহাই তোমাকে বলিয়াছি। এখন তোমার যাহা আদেশ তাহাই আমি পালন করিতে প্রস্তুত আছি।" মা এই কথা শুনিয়া খুব

বাবার সন্ন্যাস-গ্রহণ (চৈত্র-সংক্রান্তি, ১৩২০)। নাম হইল "অখণ্ডানন্দ গিরি"

আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "বেশ, তাহা হইলে কালই শঙ্করানন্দ উপযুক্ত লোকের খোঁজ করিতে আরম্ভ করুক। সংক্রান্তির আর ৫।৭ দিন মাত্র বাকি আছে।" এই বলিয়া আরও বলিলেন, "দেখ, আর এক গুরুর কাছে দিতেছি, ইহা কেন মনে করিতেছ? আমি ত নিজের হাত দিয়া কিছুই করি না। তোমার যাহা কিছু হইবে, আমার কাছেই যেন হয়, এই প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাই আমি আসিয়াছি। সবই ত এক। এক ছাড়া দুই কোথায়? আর সন্ন্যাসী গুরুর সহিত গুরু শিষ্যের কোন বন্ধন বা সম্বন্ধ হয় না। কাজেই অপর গুরু হইতেছে, ইহা মনে করিও না।" এই সব নানা কথা বলিয়া বাবাকে শান্ত করিলেন।

কিন্তু বাবার মনে এই চিন্তা খুবই তোলপাড় করিতেছিল। পর দিনই মা শঙ্করানন্দ স্বামীকে একটি ভাল লোকের খোঁজে যাইতে আদেশ দিলেন। তিনি দেখিয়া দেখিয়া কন্‌খলের "মঙ্গলানন্দ গিরি" মহারাজকেই উপযুক্ত লোক মনে করিয়া খবর দিলেন। পরে মা, জ্যোতিষদাদা ও বাবাকে কন্‌খলে "মঙ্গলানন্দ গিরি"র নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারাও তাঁহাকে দেখিয়া আসিলেন। বাবা শ্রীশ্রীমাকে বলিলেন, "মা, আমরা কি দেখিব? তুমি দেখিয়া যাহা কর করিবে"। ঘটনাচক্রে সেই দিনই ঐ ধর্ম্মশালা আমাদের ছাড়িতে হইল। মা আমাদের নিয়া কন্‌খলে "মঙ্গলানন্দ গিরি"র আশ্রমে চলিয়া গেলেন। সেইখানেই আমাদের থাকিবার জায়গা হইল। মাও দেখিয়া, "মঙ্গলানন্দ গিরি"কে সন্ন্যাস-মন্ত্র দিবার উপযুক্ত লোকই মনে করিলেন।

"মঙ্গলানন্দ গিরি" মহারাজের বয়স প্রায় ৮০ বৎসর। তিনি চিরকুমার; পূর্ব্বাশ্রমের বাড়ী ৺মথুরায় ছিল। প্রায় ৪০ বৎসর যাবত এই আশ্রমে আছেন। ইহা তাঁহার গুরুর আশ্রম। আমরা ৫।৭ দিন

তথায় থাকিলাম। সন্ন্যাসের সব বন্দোবস্ত করা হইল। পরে, ১৩৪০ সনের চৈত্র সংক্রান্তির দিন, বিধিমত বাবার সন্ন্যাস নেওয়া হইল। সন্ন্যাস নেওয়ার পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী হইতে হয়। মুণ্ডন করিয়া ব্রহ্মচারী করিয়া দেওয়া হয়। বাবাকে ব্রহ্মচারী করা হইল। সেই দিন শ্রীশ্রীমা, বাবাকে ২৪ ঘণ্টা বসিয়া ৺গায়ত্রী জপ করাইলেন। পরে নিজের শ্রাদ্ধাদি নিজে করিয়া, রাত্রিশেষে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হয়। গিরি মহারাজ ঘরে কাহাকেও যাইতে দিলেন না। মা বাবার চোখের সামনেই জানালার কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কোন গৃহস্থ সেই দিন সেখানে ছিল না। মার কাছে অনেক ভক্ত থাকেন, কিন্তু আশ্চর্য্য সেই দিন কেহই ছিল না। মা এই কথার উল্লেখ করিলেন। মার পূর্ব্বে দেওয়া নাম অনুসারেই বাবার নাম হইল "অখণ্ডানন্দ গিরি"। সন্ন্যাস নিলেই, নামের সহিত 'আনন্দ' যোগ করা হয়।

যখন ভোর হইয়া আসে, তখন বাবা সন্ন্যাস-মন্ত্র নিয়া সন্ন্যাসীর বেশ পরিয়া আসিয়া, মার চরণে লুটাইয়া প্রণাম করিলেন। মাও আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তুমি অখণ্ডভাবে সংসার করিয়া আসিয়াছ, এখনও এই কাজ অখণ্ডভাবেই হউক"।

কত বছর পূর্ব্ব হইতেই, মা ধীরে ধীরে বাবাকে এই পথে অগ্রসর করাইতেছিলেন। জামা-জুতা ছাড়া যিনি কখনও থাকিতেন না, থাকিলেই অসুখ করিত; খাওয়া-দাওয়ার কত নিয়ম করিয়া সারা জীবন কাটাইয়াছিলেন; ৬০ বছর বয়সে (শ্রীশ্রীমার সহিত প্রথম দেখা, বাবার ৬০ বৎসর বয়সে) তাঁহার সব পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল এবং মার কৃপায় এই বৃদ্ধ বয়সেও সব সহ্য হইতে লাগিল। পরে মা কমণ্ডলু কৌপীনও দিয়াছিলেন। এই ভাবে ধীরে ধীরে সব করাইয়াছেন। নিজে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া কত বন্ধন কাটাইয়াছেন। পরে কৃপা করিয়া

গৃহ হইতে বাহির করাইয়া, কয়েক বছর আশ্রমে রাখিলেন। আজ প্রায় ৬৮।৬৯ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী করিয়া দিলেন। মার শিক্ষার রীতি কত সুন্দর! খেলায় খেলায় তিনি কত কাজই না করিয়া ফেলেন। একটা বিশেষ শক্তির সাহায্য না পাইলে জীবনের এইভাবে পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব নয়।

ওদিকে জ্যোতিষদাদা যক্ষ্মারোগ হইতে উঠিয়াছেন। এই দুরন্ত শীতের মধ্যে জামা নাই, জুতা নাই, সব সহ্য করিতে পারিতেছেন। তাঁহারও

শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় জ্যোতিষদাদার আশ্চর্য্য স্বাস্থ্যোন্নতি।

এত কালের অভ্যাস, এই বৃদ্ধ বয়সে, রুগ্ন শরীরে কি এই পরিবর্ত্তন সহ্য করা সম্ভব হইত? যদি শক্তিময়ী মা নিজে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া শক্তিসঞ্চার না করিতেন, তবে এই-ভাবে কখনই জীবনরক্ষা হইত না। তিনি যখন চাকুরি-জীবনে প্রচুর সুখস্বচ্ছন্দতার মধ্যে থাকিতেন, তাহা অপেক্ষা এখনই তাঁহার শরীর বেশী ভাল হইয়াছে।

মনোরমা দিদিও চৈত্রসংক্রান্তির দিন সারা রাত্রি বসিয়া জপ করিলেন।

মনোরমা দিদির সন্ন্যাস গ্রহণ। (১লা বৈশাখ, ১৩৪১ সন)।

১৩৪১ সনের ১লা বৈশাখ সকাল বেলা মঙ্গলানন্দ গিরির কাছে তিনিও সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। স্ত্রীলোক হইলেও, মনোরমা দিদির একাগ্রতা দেখিয়া গিরি মহারাজ সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে আপত্তি করিলেন না।

এইভাবে কন্‌খলে সব কাজ হইয়া যাইবার পরও মা কয়েকদিন

বিরাজমোহিনী দিদির কথা।

কন্‌খলে থাকিলেন। ৺বিন্ধ্যাচল হইতে বিরাজমোহিনী দিদি সেখানে গেলেন। ইনি (কলিকাতার) মার ভক্ত জ্ঞান ব্রহ্মচারীদের

আত্মীয়া। কিছুদিন যাবৎ আসিয়া ৺বিন্ধ্যাচল আশ্রমে আছেন। ইনি বিধবা। ২টি মেয়ে ছিল; বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এখন এই ভাবেই ভজন করিয়া জীবন যাপন করিবার ইচ্ছা।

ভগবান্ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের এক শিষ্য, বিকাশবাবু মাকে দর্শন করিতে কন্‌খলে গিয়াছেন। বীরেনদাদা আগ্রা হইতে গিয়াছেন। নন্দু ঢাকা হইতে আসিয়াছে। ঢাকা হইতে প্রমথবাবুর (উকিল) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও মেয়ে তীর্থ দর্শন করিতে করিতে কন্‌খলে আসিয়াছেন। মাকে তাঁহারা একখানা বড় চওড়া পাড়ের শাড়ী পরাইয়াছেন। মা এখন চুলপেড়ে ধুতিই পড়িতেন। বাঙ্গালীরা তাহা পছন্দ করিবে কেন? মার ত কিছুতেই আপত্তি নাই। ঐ শাড়ী পড়িয়াই সারাদিন রহিলেন। পরে খুলিয়া দিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয়, কয়েকদিন পরেই, কমলা নেহেরু জ্যোতিষদাদার কাছে এক পত্র লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "ভাইজী, আপনি আমাকে মার খবর সর্ব্বদা দেন না। কিন্তু আমার প্রাণটা সর্ব্বদাই মার সঙ্গ পাইবার জন্য ব্যস্ত থাকে। আমি মাকে এখান হইতেও মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই। কয়েকদিন হয়, দেখিতেছি, মা একখানা বড় লালপেড়ে শাড়ী পড়িয়া বসিয়া আছেন"। এই পত্র পড়িয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। মাকে দেখিবার পর হইতে তিনি যতবার দেরা-দুনের দিকে আসিতেন, মার খোঁজ করিয়া, মুসৌরী, ৺হৃষিকেশ কি লছমনঝোলায় মার সঙ্গে দেখা না করিয়া ফিরিতেন না। এর পরই মা মুসৌরীতে গিয়া প্রায় দেড় মাস ছিলেন। ভোলানাথও তথায় আসিয়াছিলেন। তখন শ্রীমতী কমলা নেহেরু মুসৌরীতে মাকে দর্শন করিতে গিয়া এক রাত্রি মার কাছেই ছিলেন। সম্ভবত মার সঙ্গে তাঁহার সেই শেষ দেখা।

দূর হইতে কমলা নেহেরুর আশ্চর্য্য দর্শন।

মা প্রায় ১৯।২০ দিন কন্‌খলে রহিলেন। আমাকে ও অখণ্ডানন্দ স্বামিজীকে ৺বদ্রিনারায়ণ যাইতে আদেশ করিলেন। মা যাইবেন না; কাজেই আমরা যাইতে রাজি হইতেছি না। কিন্তু মা বলিলেন, "আমি বলিতেছি, তোমরা যাও।" কি করি, অগত্যা বাধ্য হইয়া রাজি হইলাম। শঙ্করানন্দজী ও বিরাজমোহিনী দিদিও আমাদের সঙ্গে চলিলেন। ভোলানাথের চিঠি আসিয়াছে, তিনি অসুস্থ। কাজেই মা মুসৌরী চলিলেন। সেখানে গিয়া ভোলানাথের যাহা হয় ব্যবস্থা করিবেন, স্থির হইল।

আমাদিগকে ৺বদ্রিনারায়ণ যাইতে আদেশ এবং মায়ের মুসৌরী গমন। (১৩৪১, বৈশাখ)।

মা লছমনঝোলায় গেলেন। সকলেই সঙ্গে গেলেন। লছমনঝোলায় মা আগে যে ধর্ম্মশালায় ছিলেন, সেখানেই গেলেন। যে দিন লছমনঝোলা পৌঁছিলেন, তার পরদিনই মা জ্যোতিষদাদাকে নিয়া ১৩৪১ সনের বৈশাখ মাসে মুসৌরী রওনা হইলেন। আমরা ৺হৃষিকেশ পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে আসিলাম। পরে মা রওনা হইয়া গেলে, লছমনঝোলা ফিরিয়া ৺বদ্রিনারায়ণ যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম।

১৯শে বৈশাখ আমরা ৺বদ্রিনারায়ণ রওনা হইলাম। কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও ৺দেবপ্রয়াগ, ৺শ্রীনগর প্রভৃতি স্থানে সাধন ভজন করিতে গিয়াছিলেন। মার কন্‌খলে আসিবার খবর পাইয়া, তিনিও কন্‌খলে আসিয়া মার সঙ্গে সঙ্গে লছমনঝোলা আসিয়াছিলেন। এখন মার সঙ্গেই ৺হরিদ্বার চলিলেন। তিনি সেখানেই থাকিবেন। মা মুসৌরী গিয়া, ভোলানাথকেও তথায় আনাইলেন। সেখানেই তাঁহার চিকিৎসা হইতে লাগিল।

আমাদের ৺বদ্রিনারায়ণ যাত্রা (১৯শে বৈশাখ, ১৩৪১) ও প্রত্যাবর্ত্তন (আষাঢ়, ১৩৪১)। কন্‌খলে আসিয়া নির্ম্মলবাবুর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তি।

আমরা ৺বদ্রিনাথ, ৺কেদারনাথ ঘুরিয়া লছমনঝোলা, ৺হৃষীকেশ হইয়া, কন্‌খল মঙ্গলানন্দ গিরি মহারাজের আশ্রমে আষাঢ় মাসে ফিরিলাম। মার কাছে যাইবার অনুমতি চাহিলাম। মা কিছু দিন কন্‌খলে থাকিয়াই বিশ্রাম করিতে বলিলেন। মার আদেশমত কন্‌খলেই রহিলাম।

এদিকে খবর পাইলাম নির্ম্মলবাবু সপরিবারে মার কাছে মুসৌরী গিয়াছেন। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত শচীকান্ত ঘোষও এই সময় মার কাছে গিয়াছিলেন। তিনি এই প্রথম মাকে দেখেন। ইনি কলিকাতার অ্যাসিষ্টাণ্ট ইনকাম্-ট্যাক্স কমিশনার। কয়েক দিনের মধ্যেই টেলিগ্রামে জানিলাম, নির্ম্মলবাবু মুসৌরীতে মারা গিয়াছেন। নেপালদাদা, বাচ্চু, তরু (নির্ম্মলবাবুর ছেলে মেয়ে) ও তাদের মাকে নিয়া কন্‌খলেই আসিলেন। সেই আশ্রমেই নির্ম্মলবাবুর শ্রাদ্ধাদি হইয়া গেল। পরে তাঁহারা সকলে ৺কাশী চলিয়া গেলেন।

মা গিরিডি হইয়া একবার ৺কাশী আসিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তখন চৈত্র মাস। একদিন রাত্রে কথা হইল, সারারাত্রি কীর্ত্তন হইবে। শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহনবাবুও মার আগমন উপলক্ষে ৺কাশীতে নির্ম্মলবাবুর বাসায়ই ছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী, বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের অসুখ থাকায়, রাত্রিতে নির্ম্মলবাবুর বাসায় থাকিতে পারেন নাই।

নির্ম্মলবাবুর সম্বন্ধে দুই একটি কথা।

রাত্রিতে ভোলানাথ, মা এবং অন্যান্য অনেকে শুইয়া আছেন। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র ডাক্তারের স্ত্রী ও শ্রীযুক্ত নির্ম্মলবাবুর স্ত্রী বসিয়া নামরক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা নাম করিতে করিতে ঝিমাইতেছিলেন।

রাত্রি যখন ২॥ কি ৩টা, তখন কুঞ্জবাবুর স্ত্রী আর বাসায় থাকিতে পারিলেন না। মার জন্য তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি

দোতলা হইতে নীচে নামিয়া দেখিলেন, চাকর-চাকরাণীরা তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। তিনি তাহাদের ঘুম ভাঙ্গান উচিত মনে করিলেন না; অথচ মার কাছে যাইবার জন্য প্রাণ তাঁহার অস্থির। মার আকর্ষণী শক্তিতে স্থির থাকিতে না পারিয়া তিনি এমন কাজ করিলেন, যাহা পূর্ব্বে বা পরে ধারণায়ও আনিতে পারেন নাই। তিনি আল্‌না হইতে ছেলেদের একটা কোট গায়ে দিলেন। চাদর দিয়া মাথায় একটা পাগড়ী বাঁধিলেন এবং হাতে একটা লাঠি নিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। অলিগলির ভিতর দিয়া নির্ম্মলবাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কুঞ্জবাবু ৺কাশীতে একজন সম্ভ্রান্ত লোক। তাঁহার স্ত্রীকে গাড়ী ছাড়া কখনও ৺গঙ্গায়ও যাইতে দিতেন না। সত্য কথা বলিতে গেলে, কুঞ্জবাবুর স্ত্রী বাড়ীর বাহিরই বড় হইতেন না। কিন্তু আজ মায়ের আকর্ষণে সে সকল ভাব কোথায় চলিয়া গিয়াছে! তিনি নির্ম্মলবাবুর বাড়ী পৌঁছিয়াই বাহির হইতে বলিলেন, "আজ না নাম করিয়া রাত্রি জাগিবার কথা ছিল? নাম ত শুনিতেছি না।" তাঁহার ডাকে নির্ম্মল-বাবুর স্ত্রীর ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল। তিনি চমকিয়া উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। মাও মৃদু হাসিয়া উঠিয়া বসিলেন। কুঞ্জবাবুর স্ত্রীর পোষাক দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া গেল। তিনি মার চরণে লুটাইয়া প্রণাম করিলেন ও সব অবস্থা জানাইলেন।

একটু পরেই মা ঘর হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণের বাগিচার সম্মুখে গিয়া পাইচারি করিতে লাগিলেন। মায়ের ভাবে একটু অস্বাভাবিকতা দেখিয়া নির্ম্মলবাবুর স্ত্রী ও কুঞ্জবাবুর স্ত্রী, মায়ের একেবারে নিকটে না গিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়াই নাম করিতেছেন।

নির্ম্মলবাবুও শুইয়াছিলেন; এই সময় হঠাৎ বারান্দার দিকের দরজা খুলিয়া তিনিও বাহির হইলেন। দরজাতেই মাকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে

প্রণিপাত করিয়া দাঁড়াইতেই, কেমন ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি মায়ের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, হেলিয়া দুলিয়া দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া নাম করিতে লাগিলেন, "হৃদি রাধে বল।"

তাঁহার বয়স তখন ৫৭।৫৮ বৎসর। তিনি থিয়সফিকেল সোসাইটীর অতি গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার এইরূপ ভাববিহ্বলতা প্রকাশ হইতে পারে ইহা তাঁহার আত্মীয়স্বজন কেন, যাঁহারাই তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা কখনও ধারণা করিতে পারেন নাই। কিন্তু আজ তিনি যেন ভাবে বিভোর। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া বাড়ীময় একটা সাড়া পরিয়া গেল। বাড়ীর সকলেই জাগিয়া উঠিলেন। সকলে মিলিয়া খুব কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মা স্থির ভাবে দাঁড়াইয়াছেন; আর নির্ম্মলবাবু একভাবে "হৃদি রাধে বল" বলিতে বলিতে নাচিয়া নাচিয়া মাকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে ভোর হইয়া গেল। দরজা খোলা পাইয়া বাহিরের অনেক লোকও কীর্ত্তন শুনিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাতে যোগদান করিল। মার শরীরও দুলিতে লাগিল। মা পড়িয়া যান, এই ভয়ে ২।৩ জন গিয়া মার পশ্চাতে দাঁড়াইল। প্রায় ২/২॥ ঘণ্টা এইরূপভাবে কাটিয়া গেল। তার পর নির্ম্মলবাবু একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার সাষ্টাঙ্গে মার চরণে প্রণিপাত করিতেই মা ঢলিয়া পড়িয়া গেলেন। নির্ম্মলবাবুও শুইয়া কিছুক্ষণ গড়াগড়ি দিয়া উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু মা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। বেলা অনেক হইয়া গেল; রৌদ্র আসিয়া পড়ায় মাকে সকলে ধরাধরি করিয়া ঘরে নিয়া আসিল। বেলা প্রায় ১২টা অবধি মা এইভাবে পড়িয়া রহিলেন। পরে মা উঠিয়া বসিলেন। বাড়ীর সকলেরই সেদিন যেন কেমন একটা ভাব।

ভোগের কোন বন্দোবস্তই তখন পর্য্যন্ত হয় নাই। ১২টার পর

তাড়াতাড়ি করিয়া ভোগের যোগাড়ও করা হইল। নির্ম্মলবাবুর ভাবটা সেদিন একটু অন্য রকমই রহিয়া গেল। এর মধ্যে নির্ম্মলবাবুর স্ত্রী ও হরিদাস নির্ম্মলবাবুকে এই ভাববিহ্বলতার জন্য ঠাট্টা করিতে লাগিল। কারণ, তিনি সকলকেই এই ভাব-বিহ্বলতার জন্য ঠাট্টা করিতেন। তাঁহার এই ভাব কেহ কখনও দেখে নাই। আজ সময় পাইয়া তাঁহাকে সকলে ঠাট্টা করিতে লাগিল। মা তখন তাঁহাদের এভাবে ঠাট্টা করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

এর কিছু দিন পর হইতে নির্ম্মলবাবু, তাঁহার স্ত্রী-কন্যাকে বলিতেন, "মা, আমার ভিতরের নর্দ্দমা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।" বাস্তবিকই এর পর হইতে মার কথায় প্রায়ই তাঁহার চোখে জল গড়াইয়া পড়িত। অথচ তাঁহার একমাত্র জামাতার মৃত্যুতে অথবা ২৫।২৬ বৎসরের জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যুতেও কেহ তাঁহার চোখে এক ফোঁটা জল দেখে নাই। মা যেন তাঁহার প্রাণটা একেবারে গলাইয়া দিয়াছিলেন। মার এরূপ শক্তির পরিচয় আরও পাওয়া গিয়াছে।

আরও একবার নির্ম্মলবাবুর এ' ভাব দেখা গিয়াছিল; তখন মা দেরাদুন ছিলেন। নির্ম্মলবাবু সপরিবারে ৺পূজার বন্ধে মার কাছে গিয়াছিলেন। সে সময় একবার উহাদের নিয়া মা টপকেশ্বর গিয়াছিলেন। সেখানেও নামে নির্ম্মলবাবুর আবার এমনই ভাবের একটু লক্ষণ দেখিয়াছি; মা নাম বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

আমরাও কিছু দিন গিয়া 'মহানন্দ মিশনে' রহিলাম। কয়েক দিনের মধ্যেই "তরুর অবস্থা খারাপ" এই মর্ম্মে মার কাছে ও আমাদের কাছে তার আসিল। শঙ্করানন্দ স্বামী এই তার পাইয়া ৺কাশী চলিয়া গেলেন। তিনি ঐ পরিবারের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত। এই বিপদের উপর আবার বিপদের খবর পাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

মুসৌরী হইতে শ্রীশ্রীমায়ের দেরাদুন আগমন ও আমাদিগের তথায় আহ্বান।

মার আদেশ না পাইলে, বাবা কোথায়ও যাইবেন না। তাই আমরা কনখলেই রহিলাম। ২।৩ দিন পর মুসৌরী হইতে জ্যোতিষদাদার টেলিগ্রাম আসিল, মা দেরাদুনে যাইতেছেন। আমাদিগকে মার সহিত সেখানেই দেখা করিবার আদেশ করিয়াছেন, টেলিগ্রাম পাইয়াই আমরা দেরাদুন মনোহর মন্দিরে গিয়া শুনি, মা সেই দিনই মুসৌরী হইতে আসিয়া তথায় এক বার গিয়াছিলেন ; পরে মিলিটারী কলেজেই থাকিবেন বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমরাও তথায় চলিয়া গেলাম।

ইতিপূর্ব্বেও মা তথায় ২।১ বার ছিলেন। আমরা গতবার যখন দেরাদুনে আসিয়াছিলাম, মা এই স্থান আমাদের দেখাইয়া নিয়া গিয়াছিলেন। কাজেই জায়গাটা জানা ছিল। রাত্রি প্রায় ৯টায় আমরা তথায় পৌছিলাম। গিয়া দেখি মা ও জ্যোতিষদাদা শুইয়া আছেন। আমরা যাওয়ায় উঠিলেন। ২।৪টি কথা হওয়ার পরই রাত্রি অনেক হওয়ায়, সকলে শুইয়া পড়িলেন। আষাঢ় মাসেই ভোলানাথ মুসৌরী চলিয়া গিয়াছেন ও মা দেরাদুন আসিয়াছেন। পর দিনও আমরা মার কাছেই রহিলাম। তার পরদিন রাত্রির গাড়ীতে আমাদের ৺বিন্ধ্যাচল থাকিবার আদেশ দিয়া পাঠাইয়া দিলেন এবং ৺কাশী হইয়া তরুকে দেখিয়া যাইতে বলিয়া দিলেন। শুনিলাম মা ২।৪ দিন যাবৎ একদিন পর একদিন খাওয়া আরম্ভ করিয়াছেন। হরিরাম যোশী আসিয়া আমাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেলেন।

আমরা ৺কাশী আসিয়া তরুকে দেখিয়া ২।১ দিন অপেক্ষা করিয়াই ৺বিন্ধ্যাচল চলিয়া গেলাম। তরু বাল বিধবা। মার আদেশে কাজকর্ম্ম করিয়া সে বেশ উন্নতি করিয়াছিল। তাহার বেশ একটা আনন্দ আসিয়াছিল। মা তাহাকে খুব স্নেহ করিতেন। সে সর্ব্বদাই পূজা জপ নিয়াই থাকিত এবং মার প্রতি তার খুব

৺কাশীধামে "তরুর মৃত্যু"। আমাদের ৺বিন্ধ্যাচল আগমন (শ্রাবণ, ১৩৪১)

অনুরাগ ছিল। মুসৌরীতে পিতার মৃত্যুর পরই সেই শোকে এবং নানা রোগে সে শয্যাগত হইয়া পড়ে। পিতার মৃত্যুর ৬।৭ মাস পরেই প্রায় ২৫ বৎসর বয়সে ৺কাশীতে তাহার দেহত্যাগ হয়। বোধহয়, শ্রাবণ মাসে আমরা ৺বিন্ধ্যাচল আসিলাম।

শ্রীশ্রীমায়ের ৺হৃষীকেশ, সোলন এবং বৈদ্যনাথ ভ্রমণ।

এর পরই শুনিলাম, মা দেরাদুন হইতে ৺হৃষীকেশ গিয়া গঙ্গার ধারে একটি কুটীরে প্রায় ২॥ মাস ছিলেন। তথা হইতে সোলন গিয়াছিলেন। পরে একবার পাঞ্জাবের দিকে বৈদ্যনাথও গিয়াছিলেন। সেখানে তারানন্দ স্বামীর ওখানে ছিলেন। এই ৺হৃষীকেশ অবস্থানকালে, ভূপতিদাদা একবার ঢাকা হইতে গিয়া মার কাছে কিছুদিন থাকিয়া আসিয়াছেন। ক্ষিতীশদাদাও সপরিবারে কলিকাতা হইতে মার দর্শনে তথায় গিয়াছিলেন।

৺বিন্ধ্যাচলের যজ্ঞশালাটি সেবার তৈরী হয় নাই, এবার তাহাই তৈয়ার করা হইল। পরে মা আমাদের একবার ঢাকা যাইতে আদেশ দিলেন। অখণ্ডানন্দজীকে বলিলেন, "যাহারা এখানে আসা যাওয়া করে, তাহার মধ্যে তুমিই প্রথম সন্ন্যাসী হইয়াছ। এর পর আর যাহাদের ভাগ্যে থাকিবে, হইবে। আর কেমন যোগা-যোগ দেখ, রমণার আশ্রমেও প্রথম গিয়া সম্প্রদায়ের সাধুরাই থাকিতেন। তুমিও গিরি সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছ। তোমার কিছু দিন রমণার আশ্রমে গিয়া থাকা দরকার"। সেখানে গিয়া কি ভাবে কোথায় বসিয়া কাজ করিতে হইবে, তাহাও বলিয়া দিলেন। আর কন্‌খলে যে এই মঙ্গলানন্দ গিরি মহারাজের সহিত রমণার আশ্রমের যোগাযোগ আছে

৺বিন্ধ্যাচল হইতে অখণ্ডানন্দ স্বামীজীর ও আমার ঢাকায় রমণা আশ্রমে অবস্থান (মাঘ বা ফাল্গুন ১৩৪১)

তিনি পূর্ব্বজন্মে ঐ স্থানেই ছিলেন, মা কথাচ্ছলে এই ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা সম্ভবতঃ মাঘ মাসে কি ফাল্গুন মাসে মার আদেশে ঢাকা গিয়া রমণার আশ্রমে রহিলাম।

উত্তরকাশীতে ভোলানাথের গমন ও তথায় মন্দির নির্ম্মাণ।

ওদিকে ভোলানাথ মুসৌরী হইতে পুনরায় উত্তরকাশী চলিয়া গিয়াছেন। কমলাকান্ত ঢাকা চলিয়া আসিয়াছে। ঢাকা হইতে অতুল ব্রহ্মচারী তথায় গিয়াছে। সেখানে ভোলানাথ একটি মন্দির তৈয়ার করিতেছেন। মার ওদিককার ভক্তরাই মন্দির নির্ম্মাণে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

একবিংশ অধ্যায়

ঢাকাতে ১৩৪২ সনের বৈশাখ মাসে মার জন্মোৎসব হইল। আমরাও উপস্থিত ছিলাম। শুনিলাম, কলিকাতায় যতীশ গুহ মহাশয়দের বাড়ীতেও শচীবাবু প্রভৃতি মিলিয়া মার জন্মোৎসব করিয়াছেন। কলিকাতায় এই শচীকান্ত ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে মা গিয়াছেন; তাঁহার মোটরে মা ঘুরিয়াছেন, কিন্তু তিনি মার সহিত দেখা করেন নাই। মা যখন মুসৌরীতে ছিলেন, তখন হঠাৎ মার কাছে যাইতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি ছুটি নিয়া মার কাছে কিছুদিন গিয়া রহিলেন এবং তখনই মার প্রতি খুব অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। নিজের জীবনের সব ঘটনাও মার কাছে বলিলেন। ইনি অল্পবয়সেই বিপত্নীক হইয়া আর বিবাহ করেন নাই। দেরাদুনেও মার জন্মোৎসব হইল।

১৩৪২, বৈশাখ। শ্রীশ্রী-মায়ের জন্মোৎসব, (ঢাকায়, কলিকাতায় এবং দেরাদুনে)। শচীনবাবুর কথা।

১৩৪২ সনের আষাঢ় মাসের শেষভাগেই উত্তরকাশীর মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যিনি যাইতে চাহেন, সকলকে একত্র করিয়া নিয়া যাইবার জন্য, অখণ্ডানন্দ-জীর কাছে চিঠি আসিল। আমরা চিঠি পাইয়াই রওনা হইলাম। আমাদের সহিত প্রভাতবাবু ও খগেন্দ্র চলিল। কলিকাতা গিয়া শুনিলাম, তথা হইতে যতীশদাদাদের পরিবারস্থ প্রায় সকলেই যাইতেছেন। শচীদাদা, জ্ঞানদাদা, নবতরুদাদা প্রভৃতি অনেকেই যাইবেন। আমরা ৺কাশীতে গিয়া কলিকাতার দলবলের

উত্তরকাশীতে নবনির্ম্মিত মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিপুল ভক্তবাহিনী সহ মায়ের তথায় যাত্রা (আষাঢ়, ১৩৪২)

জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। তাঁহারা ৺কাশী পৌঁছিতেই একত্র হইয়া সকলেই দেরাদুন চলিলাম।

ষ্টেশনে হরিরামবাবু প্রভৃতি ছিলেন। তাঁহাদের মুখে মা মুসৌরী রওনা হইয়াছেন শুনিয়া সকলেই মুসৌরী রওনা হইয়া গেলাম। পথেই মার সঙ্গে দেখা হইল। মার সঙ্গে একটি পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক (মহারতন) আসিয়াছেন। শুনিলাম, ইনি দেরাদুনের ডেপুটী বাবুর স্ত্রী; মাকে মুসৌরী পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছেন। ডাক্তার ভার্গব মার সঙ্গে আসিয়াছেন। ইহারা মুসৌরী হইতেই ফিরিয়া যাইবেন। গোপালজী (পণ্ডিত দ্বারকানাথ রয়না, ইনি দেরাদুনের উকিল, কাশ্মীরের লোক), মার সঙ্গেই উত্তরকাশী যাইবেন। ওদিকের আরও কয়েকজন মার সঙ্গে চলিলেন। কলিকাতা হইতেও বহুলোক আসিয়াছে। কাজেই ডাণ্ডি, কাণ্ডি, খচ্চর, সঙ্গে নেওয়া হইল। চট্টগ্রাম হইতে শশীবাবু, বঙ্কিমবাবু আসিয়াছেন। মুসৌরীতে এক দিন থাকিয়াই মা উত্তরকাশী রওনা হইলেন। নূতন মন্দিরে যে সব দেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং পূজার বাসনপত্র সব, নেপাল দাদা ৺কাশীতে পাঠাইয়াছেন তাহাও এই সঙ্গে চলিল। পার্ব্বত্যপথে এই বিপুল বাহিনীসহ মা উত্তরকাশী যাত্রা করিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গলাভে সকলের আনন্দে পার্ব্বত্যপথ বাহন এবং উত্তরকাশীতে উপস্থিতি।

যাইতে সকলেরই বেশ কষ্ট হইল। কারণ, অনেকেই কখনও এরূপভাবে চলেন নাই। মা সঙ্গে আছেন, এই এক আনন্দে সকলে এত কষ্ট সত্ত্বেও আনন্দ করিতে করিতেই চলিয়াছেন। ক্রমেই পথকষ্ট সকলের অনেকটা সহ্য হইয়া উঠিল। মা একটু অগ্রসর হইয়াই আবার সকলের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতেন। পিছনের সকলে আসিয়া পৌঁছিলে, আবার চলিতেন। কখনও ডাণ্ডিতে কখনও হাঁটিয়াই, চলিয়া-

ছেন। পথে পথে শশীবাবু নানাভাবে মার ফটো নিতেছেন। দলের ভিতর বাচ্চা হইতে বৃদ্ধা সবই আছে। ৫।৬ দিনে আমরা মার সহিত উত্তরকাশী গিয়া পৌঁছিলাম।

মন্দির প্রতিষ্ঠার তখনও কয়েকদিন বাকি আছে। মন্দিরের কাজ হইতেছে, ভোলানাথই দেখিতেছেন। গত জন্মোৎসবের মধ্যে, যোগেশ দাদাকে হঠাৎ টেলিগ্রাম করিয়া মার কাছে দেরাতুন নেওয়া হয়। পরে তাঁহাকে উত্তরকাশী পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনিও উত্তর-কাশীতেই আছেন। প্রায় দুই বৎসর যাবত তিনিও মার আদেশে বাক্‌সংযম করিয়া আছেন। যোগেশদাদাকে আনিবার পর হইতে, কুলদাদাদার উপরেই ঢাকার অন্নপূর্ণার মন্দিরের পূজার ভার দেওয়া হইয়াছে।

উত্তরকাশীতে সমারো-হের সহিত মন্দির প্রতিষ্ঠা।
(১৩৪২, আষাঢ়)

মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন আসিল। সমারোহের সহিত মন্দিরে দেবতাদি প্রতিষ্ঠা করা হইল। কালী, শিবলিঙ্গ, লক্ষ্মী, নারায়ণ ও গণেশ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইল। সাধুদের ভাণ্ডারা দেওয়া হইল। আমরা যে ধর্ম্মশালায়, সেইটি একেবারে গঙ্গার উপরে। গঙ্গার স্রোতের এত শব্দ হইত যে কাহারও কথা শোনা যাইত না।

ভোলানাথ যে স্থানটিতে থাকিতেন, তাহাও গঙ্গার ধারেই। উহা সাধুদের থাকিবার একটি ছোট দালান। দুই বৎসর যাবত ভোলা-নাথ ঐখানেই আছেন। গরমের দিনেও গঙ্গার জলে হাত দেওয়া যায় না, এত ঠাণ্ডা। তিনি শীতের দিনেও ঐখানেই কাটাইয়াছেন। দিন-রাত্রিই নিজের কাজে থাকিতেন। খাওয়া-দাওয়ারও খুবই সংযম করিয়াছেন। ওখানকার অনেকেই

উত্তরকাশী হইতে ভোলানাথের গঙ্গোত্রী গমন।

তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার পরই তিনি অতুল ও কুলগুরুর পুত্রকে নিয়া গঙ্গোত্রী চলিয়া গেলেন। (মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কুলগুরুর পুত্র গিয়াছিলেন এবং কলিকাতা হইতে যতীশ-দাদাদের পুরোহিত লক্ষ্মী ঠাকুর মহাশয় গিয়াছিলেন)।

মা আমাদের নিয়া আরও কয়েকদিন উত্তরকাশীতে অপেক্ষা করিয়া মুসৌরী রওনা হইলেন। আসিবার পূর্ব্বে একদিন বাঙ্গালী সাধুদের নানা রকম রান্না করিয়া খাওয়াইয়া আসা হইল। যোগেশদাদার উপর মন্দিরের পূজার ভার দিয়া আসিলেন। উপেন্দ্রবাবুও (ডাক্তার) সঙ্গে গিয়াছিলেন। তিনি তথায়ই রহিয়া গেলেন। ঢাকার নিশিবাবুর স্ত্রী মারা যাওয়ায়, কয়েক বৎসর পর তিনি ৺কাশী গিয়াছিলেন। পরে মা তাঁহাকে দেরাদুনে ডাকিয়া পাঠান। তথা হইতে তাঁহাকে সাধনা করিবার জন্য রায়পুর শিব-মন্দিরে রাখিয়াছিলেন। তিনি মার সঙ্গে ৺উত্তরকাশী গিয়াছিলেন এবং মার সঙ্গেই ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় রায়পুরই গিয়া থাকেন। মার মুখে শুনিলাম, বিকাশবাবুও সন্ন্যাস নিয়া "অসীমানন্দ" নাম নিয়াছেন; তিনিও মার আদেশে রায়পুরেই আছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের নেতৃত্বে উত্তরকাশী হইতে সকলের প্রত্যাবর্ত্তন।

মা সকলকে নিয়া ৩।৪ দিনেই মুসৌরী পৌঁছিলেন। পথে এবার কাহারও বড় কষ্ট বোধ হয় নাই, কারণ কতকটা কষ্ট সহ্য হইয়া গিয়াছিল এবং নামিতে কষ্ট কমই হয়। সকলে খুব আনন্দ করিতে করিতে মার সঙ্গে পথে চলিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে যতীশদাদা, ক্ষিতীশদাদা প্রভৃতি সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ডাণ্ডি আগে

ফিরিবার সময় দারুণ পার্ব্বত্য পথ সত্ত্বেও শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গলাভে সকলের অপূর্ব্ব আনন্দ।

আগে চলিয়াছে। পাহাড় ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহাদের কীর্তনের ধ্বনি আসিয়া পৌঁছিতেছে। মা মধ্যে মধ্যে বেশী অগ্রসর হইয়া পড়িলেই, পিছনের সকলের জন্য ডাণ্ডি থামাইয়া বসিয়া থাকিতেন। সকলে দূর হইতেই মা বসিয়া আছেন দেখিয়া, আনন্দে "মা আনন্দময়ীর জয়" ধ্বনি করিয়া উঠিত।

রাস্তায় খাওয়া দাওয়ার খুবই কষ্ট। কাহারও পা ফুলিয়া উঠিয়াছে, কাহারও মাথা খারাপ লাগিতেছে। কিন্তু তবুও আনন্দের সীমা নাই। কলিকাতার দলের অনেকেই কখনও পাহাড় দেখে নাই—এইভাবে চলা ত দূরের কথা। তবুও মার সঙ্গে চলিয়াছে, এই আনন্দেই সকলের মন বিভোর হইয়া আছে।

মা রাস্তায় কোথাও কাঁচা আম কি কুমড়ার ডাঁটা দেখিলেই, কাহাকেও দিয়া সংগ্রহ করিয়া লইয়া চলিলেন। পরে চটিতে গিয়া আমাকে বলিলেন, "পাক করিয়া সকলকে দাও।" যে অবস্থায় খাওয়া চলিতেছে, তাহাতে ঐ জিনিষই তখন খাওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি হইতে থাকিত। এত লোক; কাজেই সকলে সামান্যই ভাগে পাইত। এইভাবে আনন্দ করিতে করিতে যাওয়া হইতেছে।

পথে, এক চটিতে গিয়া আর জায়গা পাওয়া গেল না। শুনা গেল, এক বিবাহের বরযাত্রী আসিয়াছে। শেষে পরিচয় হইল, সোলন রাজার পক্ষের বর এবং কন্যাপক্ষ দেরাদুনের এক উকিল। উভয় পক্ষই মার বিশেষ অনুগত। তাহারা আসিয়া মার চরণধূলা লইল এবং সোলনের রাজার চিঠি জ্যোতিষদাদাকে দিল। তিনি উত্তরকাশীর মন্দিরে বিশেষ সেবার ভার কয়েক মাসের জন্য নিবার প্রার্থনা জানাইয়াছেন। তখনই ভোলানাথকে উত্তরকাশীতে চিঠি লিখিয়া দেওয়া হইল, তিনি যেন এই সেবার ভাল বন্দোবস্ত করিয়া আসেন। গঙ্গোত্রী হইতে ফিরিয়াই ভোলানাথ মুসৌরী চলিয়া আসিবেন এইরূপই স্থির হইয়াছে।

মা সকলকে নিয়া মুসৌরী আসিয়া দুই দিন থাকিয়া সকলকে নিয়া সহরে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। পরে সকলকে নিয়া দেরাদুন আসিয়া মনোহর মন্দিরে উঠিলেন। গোপালজীর ও কিষণজীর বাসা মন্দিরের নিকটেই। তাঁহারা মায়ের সঙ্গে উত্তরকাশী গিয়াছিলেন। তাঁহারা একটু আগেই আসিয়া দেরাদুন পৌঁছিয়া সকলের থাকিবার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। ওখানকার ভক্তেরা এই বাঙ্গালী ভক্তদের খুব আদর অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু মার এই চিড়িয়াখানায় বেশ মজা হইল। সকলে সকলের কথা বুঝিতে পারিতেছে না। দিদিমাকেও আমাদের সঙ্গেই ঢাকা হইতে নিয়া আসিয়াছিলাম। তিনিও উত্তরকাশী গিয়াছিলেন।

মুসৌরী হইয়া দেরাদুনে শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমন।

এবার দেরাদুনে আসিয়া লেডী ডাক্তার মিস্ সারদা শর্ম্মার সহিত পরিচয় হইল। ইনি মথুরাবাসিনী, বিবাহ করেন নাই। বয়স প্রায় ৩৩।৩৪ সৎসর। মেয়েটি খুব ভাল, সচ্চরিত্রা। দেখিলাম, মা ইহাকে খুব স্নেহ করেন। গতবার আমরা আষাঢ় মাসে মিলিটারী কলেজে মাকে দেখিয়া যাইবার ২।১ দিন পরেই, হরিরাম বাবুর সঙ্গে ইনি মার দর্শনে যান। পরে ধীরে ধীরে মার খুবই অনুগত হইয়াছেন। আজ প্রায় এক বৎসর যাবৎ ইনি মার কাছে আসিয়াছেন। শুনিলাম পূর্ব্বে ইনি সাজপোষাক করিতেন; কিন্তু এখন মার আদেশে সব ছড়িয়াছেন। সাধারণ সাদা পোষাকেই থাকেন। মা ইহাকে নারায়ণের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছেন। ইনিও মার কাছে হৃষীকেশ গিয়া (ছুটী নিয়া) কিছুদিন ছিলেন।

দেরাদুনে শ্রীশ্রীমা। মিস্ সারদা শর্ম্মা, নরসিংহ এবং অন্যান্য কয়েকজন ভক্তের কথা। সারদা শর্ম্মার নারায়ণের সহিত বিবাহ।

দেরাদুনের ডাক্তার সারদার বিবাহের কথা মা গল্প করিয়াছিলেন, "সারদা মেয়েটী খুব ভাল, খাঁটি ব্রহ্মচারিণী বলিলে যাহা বুঝায় এ তাহাই। বয়স ৩২।৩৩ হইল কিন্তু একদিনের জন্যও কু-ভাব তাহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। মেয়েটি খুব সরল। আমার সহিত দেখা হওয়ার পূর্ব্বে তাহাকে দেবদেবী বা ধর্ম্মে অনুরক্ত দেখা যায় নাই। কিন্তু অন্যান্য গুণ, সত্যবাদিতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা তাহার খুব ছিল। তাহারা দুই বোন। মা নাই। পিতা জীবিত।

সারদা যখন আমার নিকট আসিত, তখন শান্তি বলিয়া একটি স্ত্রীলোক আমাকে প্রায়ই বলিত, 'মা, ইহাকে তুমি বিবাহ দিবে না?' আমি তখন হাসিয়া বলিলাম, 'বরের চেষ্টায় আছি।' আমি অনেকবার সারদাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, যে সে বিবাহ করিবে কি না? কিন্তু তাহার উত্তরে সারদা বলিত 'মা আমি কি করিয়া বলিব? যদি বলি যে বিবাহ করিব না, পরে সংস্কারবশে যদি বিবাহ হইয়া যায়, তবে ত আমার কথা মিথ্যা হইবে।' আবার কখন কখন সে নিজ হইতে বলিত 'মা, আমার একটি ছেলের সাধ করে, তাহাকে আমি বি, এ; এম, এ; পড়াইব।'

একদিন সারদা ও প্রকাশজীর মেয়ে আমার কাছে আসিয়াছে, তখন শান্তি আবার বলিল, 'মা, তুমি সারদাকে বিবাহ দিবে না?' উহার কথা শুনিয়া আমি সারদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি, তুমি বিবাহ করিবে না? এ' কথায় সারদা বলিয়া উঠিল, 'মা তুমি সব জান; তুমি আমাকে যাহা করিতে বলিবে আমি তাহাই করিব।' আমি বলিলাম, 'আমি যদি তোমাকে একটি মেথর বিবাহ করিতে বলি, তবে তুমি করিবে?' সারদা বলিল, 'তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব।' সারদার বোন্‌কে যখন প্রশ্ন করিলাম, বিবাহ করিবে কি না, সে কোনো উত্তর দিল না।"

"যাক, আমি সেই দিন সারদা ও প্রকাশজীর মেয়েকে দুইটি ফুলের তোড়া দিলাম এবং বলিলাম, আগামীকল্য তোমরা যখন আমার কাছে আসিবে এই ফুলের তোড়া নিয়া আসিও। সারদা যত্ন করিয়া ফুলের তোড়াটী বাসায় নিয়া গেল এবং উহা একটি ঘরে তালা দিয়া রাখিল। প্রকাশজীর মেয়েও তোড়াটী নিয়া যত্ন করিয়াই রাখিয়াছিল কিন্তু সে তালা দেয় নাই।"

"পরদিন সারদা আমার কাছে আসিবার সময় যখন চাবি খুলিয়া তোড়াটী আনিতে গেল, তখন দেখে যে ঘরের সব জিনিষই ঠিক আছে, তালাও বন্ধই ছিল কিন্তু শুধু তোড়াটী নাই। প্রকাশজীর বড় মেয়েরও সেই ব্যাপার হইয়াছিল। কি করিয়া যে তোড়া দুইটী অদৃশ্য হইল তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। সারদা আমার নিকট আসিয়া বিরসবদনে বলিল, যে তোড়াটী হারাইয়া গিয়াছে। আমি কিছু বলিলাম না।"

"সেই দিনই সকালবেলা আনন্দচকের মন্দিরের পূজারী, জীবের সংস্কার সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিল। সারদা তখন সেখানে ছিল, সে খুব মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল। পূজারী বলিতেছিল যে জীবের সংস্কার থাকিতে মুক্তি নাই। ভোগ করিয়া এই সংস্কার শেষ করিবার জন্য তাহার বার বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই সব কথা শুনিয়া সারদা চিন্তা করিতে লাগিল, এ'ত বড় ভয়ানক অবস্থা। যদি আমার বিবাহের সংস্কার থাকে তবে ত জীবন ভরিয়া সাধন ভজন করিলেও ঐ সংস্কার শেষ করিবার জন্য আমার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। সারদা আমার নিকট এ' সব কথা বলিবার জন্য ব্যস্তভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এই দিন সকালে প্রকাশজীর স্ত্রী, শান্তিও আমাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছিল। সে আমাকে বলিল, মা, আমার খুব ইচ্ছা করিতেছে

যে সারদার চুল আচড়াইয়া দেই। আমি বলিলাম, বেশ ত দাও। সে বেশ যত্ন করিয়া সারদার চুল বাঁধিয়া দিল। এবং কপালের মাঝখানে সীঁথি করিয়া দিল। এরূপ সীঁথি এদেশে বিবাহিত স্ত্রীলোকেরাই করিয়া থাকে। এমন সময় প্রকাশজীর মা একটি ফুলের মালা লইয়া আসিলেন। কোন দিনই সে এমন সময় আমার কাছে আসে না। এরূপে বিবাহের সব আয়োজন হইতে লাগিল।"

একটু বেলা হইলে যখন সকলে চলিয়া গেল, তখন সারদা আমাকে একা পাইয়া বলিল, 'মা পূজারী বলিতেছিলেন যে জীবের সংস্কার ভোগ না হইলে নাকি মুক্তি হয় না। আমি যদি সারা জীবন সাধন ভজন করি, তবে আমার বিবাহের সংস্কার থাকিলে কেবল ঐ সংস্কার শেষ করিবার জন্য আমার আবার জন্মগ্রহণ হইবে না কি?' আমি বলিলাম, "তাহা ত হইবেই।" ইহা শুনিয়া সারদার বড় দুঃখ হইল। তাহার দুঃখ দূর করিবার জন্য আমি বলিলাম, "আইস, এই জন্মেই তোমাকে নারায়ণের সঙ্গে বিবাহ দিয়া দেই যাহাতে তোমাকে সংস্কারও করিতে হইবে না, অথচ বিবাহের সংস্কারও চলিয়া যাইবে।"

তারপর মা কি করিলেন তাহা কাহারও কাছে প্রকাশ করেন নাই; সারদা ও মা জানেন। মা, সারদার ৺নারায়ণের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার পরে সারদাকে বলিলেন, "প্রথম যাইয়া শান্তিকে প্রণাম করিয়া আইস, কারণ এই বিবাহে সেই প্রথম উপলক্ষ হইয়াছিল।" সারদা শান্তিকে প্রণাম করিতে তাহাদের বাড়ী গেল, এবং যেই সারদা প্রণাম করিয়াছে, অমনি সে ঘর হইতে সিন্দুর আনিয়া সারদার সীঁথিতে পরাইয়া দিল। মা বলিলেন, কেন সে ইহা করিল, তাহা সেও বলিতে পারিবে না; তখন পর্য্যন্ত সারদার বিবাহের কথা সে খবর পায় নাই। আমি ও সারদা ছাড়া আর কেহই জানিত না।

ইহার পর বিবাহের সংবাদ প্রচার করা হইলে, কেহ কেহ মনে করিল, নারায়ণ নামে একটি ছেলের সহিত বুঝি সারদার বিবাহ হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলিল, এ'যে নারায়ণ, ভগবান। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার কাছে আসিয়া বলিল, 'মা, আমাদিগকে সারদার স্বামী দেখাও'। আমি বলিলাম, "দেখ বাড়ীতে বর আসিলে তোমরা ত তাহাকে গোপন ভাবে দেখিতে কত চেষ্টা কর, সারদার স্বামীকে দেখিতে হইলে সাধন ভজন কর, নিশ্চয়ই দেখা পাইবে। তিনি সারদার স্বামী, তোমাদেরও স্বামী। মানুষ-বরও বিনা চেষ্টায় দেখিতে পাওয়া যায় না, আর ইহাকে দেখিতে হইলে যে একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি।" পরে সারদার বিবাহ উপলক্ষে সকলে মিলিয়া একদিন কীর্ত্তনাদি করিলেন ও ভোজনাদি হইল।

সারদাদের কুমারীপূজা ব্যাপারে মা একদিন বলিতেছেন, "দেরাদুনে একদিন কি কথায় কথায় সারদার ও হরিরামের সহিত একটু তর্ক-বিতর্ক হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী ও শঙ্করানন্দ যোগদান করিয়াছেন। পরদিন আমার সামনেই এই কথাবার্ত্তা হইতেছে। খানিক পর সব চুপ হইয়া গেল। কিন্তু আমার কেমন খেয়াল হইল, হরিরামকে বলা হইল, 'তুমি গিয়া কাল সারদাকে নিয়া আসিবে।' দুইজনের মধ্যে একটু তর্ক করিতে করিতে একটু গোলমাল হইয়াছে, তাই হরিরামকে বলা হইল, তুমিই গিয়া সারদাকে নিয়া আস। সে আমার কথায় তাহাই করিল। লক্ষ্মীও আসিল। তখন আমি মনোহর মন্দিরে থাকি। বলা হইল, 'তোমরা ঐরূপ তর্কবিতর্ক করিয়াছ, তাই কাল তুমি ও সারদা কুমারী পূজা কর। আর লক্ষ্মী ও শঙ্করানন্দ সেই সঙ্গে যোগ দিয়াছিল, তাই লক্ষ্মীও পূজা করিবে; আর শঙ্করানন্দ সকলকে পূজা করাইবেন।' আমার

কথায় কুমারীপূজার যোগাড় করিয়া তিনজনেই পূজা করিবে স্থির হইল।

এদিকে মন্মথ বাবুর ছেলে নরসিংহ কোনদিনও সকালে আসিত না। সেও সেই দিন পূজা দেখিতে আসিবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় বলা হইল, 'ইচ্ছা হইলে আসিও'। পরদিন তিনজনই পূজা করিতে বসিয়াছে। আমার কেমন খেয়াল হইল, সারদা কৃষ্ণভাবাপন্না, আর করান হইতেছে কুমারী পূজা। যাক্ এই পর্য্যন্তই ভাবটা রহিল। তারপর পূজা শেষ হইলে আমি লক্ষ্মীকে বলিলাম, 'দেবীর পূজা করিলে ত লোকে বর পায়। তুমিও এই মেয়েটাকে পাইলে। আমি তোমার মেয়ে'। এই বলিয়া ছোট শিশুর ভাবে তাহার কোলে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। তারপর নরসিংহও আসিয়া উপস্থিত হইতেই আমি তাহার হাত ধরিয়া সারদার কোলের কাছে বসাইয়া বলিলাম, 'এই লও তোমার এম্, এ, পাশ ছেলে'। (সারদা একবার বলিয়াছিল তাহার ছেলে হইলে ছেলেকে এম্, এ, পাশ করাইবে—এইরূপ তাহার ইচ্ছা ছিল। আমার তখনই সেই খেয়ালটি জাগিল)।

"এদিকে এই সব কুমারী নিয়া ফটো তুলিবার খেয়ালটা উহাদের জাগিল। ফটো তোলা হইল। যখন সারদা ও তাহার কুমারীর মধ্যস্থানে আমাকে ফটো উঠাইতে বসান হইল, তখন আমার কেমন একটা অস্বাভাবিক ভাব জাগিল। সারদা কৃষ্ণভাবাপন্না; কুমারী পূজা করান হইতেছে। এই ভাবটা; এবং দ্বিতীয়তঃ, আমি শিশুর মত লক্ষ্মীর কোলে শুইয়াছিলাম, সেই শিশুর ভাবটাও ভিতরে দেখিতে-ছিল। তৃতীয়তঃ, নরসিংহকে ছেলে করিয়া দেওয়া হইতেছে। তাহার শিশুকালের চেহারাটাও ভিতরে খেলিতেছিল। এই তিনটা ভাবেরই খেলা ভিতরে ছিল। এই অবস্থায়ই আমার শরীরে ডান দিক দিয়া

কেমন একটা ভাব খেলিল, একটি ছোট্ট শিশু বাঃ—এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের ভিতর একটা যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল (মা এই কথা যখনই বলিতেন, একটি শিশু বাঃ তখনই মার সমস্ত শরীরে যেন কেমন একটা ভাব খেলিত, সমস্ত শরীর দিয়া যেন এই ভাবটা বুঝাইতে চাহিতেছেন। ভাষায় মার সেইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে পারিব না)। আমার শরীরে একটা অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন আসিল। আমি সেই ভাবের মধ্যেই কুমারীটিকে স্পর্শ করিলাম। আবার ঠিক হইয়া ছবি তুলিতে বসা হইল। কিন্তু সেই অস্বাভাবিক ভাবটা সামলাইবার পূর্ব্বেই ফটো উঠিয়া গেল।"

"পরদিন ফটোগ্রাফার বলিয়া পাঠাইল, 'এই ফটোখানা খারাপ হইয়া গিয়াছে'। আমি বলিলাম, 'যেমন উঠিয়াছে তেমনই আনিতে বল'; ছবি আনিল। প্রথমে কেহ কিছু বুঝিতে পারিতেছে না। পরে ধীরে ধীরে পরিষ্কার দেখা গেল, কুমারী মূর্ত্তিকে আবৃত করিয়া একটি শিশুর মূর্ত্তি উঠিয়াছে।"

মার এই ছবিখানা দেখিলেই বোঝা যায়, কৃষ্ণভাবাপন্ন সারদাকে কুমারী পূজা করাইয়াছেন বলিয়া ভাবিয়াছিলেন। তাই যেন কুমারীকে আবৃত করিয়া শিশু-মূর্ত্তি দাঁড়াইয়াছে। আরও দেখা যায়, মার ডান অঙ্গ দেখাই যায় না, কুমারীকে আবৃত করিয়া শিশু-মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। আর মার ডান অঙ্গই যেন কুমারীর দিকে হেলিয়া আছে। কাজেই মার ডান অঙ্গ দেখাই যায় না। মার যে একটা অস্বাভাবিক ভাব তখনও একটু ছিল তাহা ছবিতে মার হাসিটুকু দেখিয়াই ধরা যায়। কি আশ্চর্য্য ঘটনা, ভাবাবস্থায় নিজের অঙ্গ হইতে মূর্ত্তি প্রকাশ!

মা এই ঘটনা বলিতে বলিতে ইহাও বলিয়াছেন যে, "কোন ভিন্ন স্থান হইতে যে এই মূর্ত্তি আসিয়াছে তাহা কিন্তু নয়", এই বলিয়া চুপ

করিয়া রহিলেন ও এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিলেন না। তারপর বলিলেন, "এই ঘটনার পরদিনই মেয়েটির জ্বর হইল। আমার তখনই খেয়াল হইল, একটা অস্বাভাবিক ঘটনার জন্যই মেয়েটির জ্বর হইয়াছে। খুব জ্বর, কিন্তু আমার খেয়াল হইল, কিছু হইবে না।" আমি বলিলাম, "মা তোমার স্পর্শে মেয়েটির ভিতরই হয়ত কৃষ্ণমূর্ত্তির প্রকাশ পাইয়াছে। তাই মেয়েটি সেই ভাব ধারণ করিতে পারে নাই বলিয়াই মেয়েটির জ্বর হইল"। মা বলিলেন, "একথা তার আত্মীয়-স্বজনরাও অনুমান করিতে পারে নাই"।

যাক, ছবির কথাও কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না। কিছুদিন পর ঢাকা হইতে অমূল্যবাবু গিয়া ছবি দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একদিন বলিলেন, "মা এই ছবিটা নরসিংহের ছেলেবেলার ছবি—নয় মা"? মা হাসিয়া বলিলেন, "আজ পর্য্যন্ত একথাটা আর কেহই বলে নাই" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। সারদার ৺নারায়ণের সহিত বিবাহের কথা (পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি) মোটামুটি বাহিরের গল্প শুনিলাম। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি হইয়াছে, মা ও সারদাই জানেন। সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করা হইল না।

আর মহারতনকেও এবারই দেখিলাম, তিনিও মার খুবই অনুগত দেখিলাম। মা কোথাও গেলেই ইহারা কাঁদিতে আরম্ভ করেন। মা সারদাকে লছমীরাণীর বন্ধু করিয়া দিয়াছেন। প্রকাশবাবুর মা, কৌশল্যা মা (বৃদ্ধা) আসিয়া মাকে কতভাবে আদর করিতে লাগিলেন; খাওয়াইতে লাগিলেন। মা দেরাদুনে পৌঁছিতেই সকলে মাকে মালা-চন্দন দিলেন এবং কর্পূরাদির দ্বারা আরতি করিলেন। মন্মথবাবুর ছেলে নরসিংহকেও এবার প্রথম দেখিলাম। নরসিংহকেও মার খুব অনুগত দেখিলাম। সে এম্, এ, পাশ করিয়া চাকুরীর চেষ্টা করিতেছে। সর্ব্বদাই মায়ের

কাছে আসে। মা তাহাকে সারদার "ধর্ম্মপুত্র" করিয়া দিয়াছেন। মা বলেন এই যে ধর্ম্ম সম্বন্ধ পাতান হইতেছে, ইহাও পূর্ব্বের যোগাযোগ অনুসারেই হইয়া যাইতেছে।

এবার দেখিলাম, অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোকও সপরিবারে মার কাছে আসা যাওয়া করিতেছেন। ছুটী ফুরাইয়া যাওয়ায়, দেরাদুন পৌঁছিয়াই শচীবাবু প্রভৃতি কয়েকজন কলিকাতা রওনা হইয়া গেলেন। ৩।৪ দিন পর মা পূর্ব্ব কথামত ভোলানাথকে আনিতে মুসৌরী গেলেন। সেইদিনই কলিকাতার সকলেই হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমনঝোলা দেখিবার জন্য দেরাদুন রওনা হইয়া গেলেন।

দেরাদুনে শ্রীশ্রীমা ও ভোলানাথ। আনন্দচকে ভোলানাথের যজ্ঞ।

মা ভোলানাথকে নিয়া তার পরদিনই দেরাদুন আসিলেন। দেরাদুনের ভক্তেরা কেহই প্রায় ভোলানাথকে দেখেন নাই। তাই জ্যোতিষদাদা তাঁহাকে ও মাকে নিয়া ভক্তদের বাড়ী বাড়ী গেলেন। সকলেই আনন্দিত হইল। পরে আনন্দচকে যজ্ঞমন্দিরে আসিয়া ভোলানাথ যজ্ঞ করিলেন। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বেই এই যজ্ঞমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় মার ছবি রাখা হইয়াছে। ভক্তেরা সকলেই আসিতেছেন, যাইতেছেন। কেহ কেহ মাকে নিয়মিতভাবে পূজা করিতেছেন। পূর্ব্বে মাকে এইভাবে পূজা করিলেই তিনি কেমন সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন, এখন কিছুই বলেন না। চুপ করিয়া শুইয়া অথবা বসিয়া থাকেন।

৪।৫ দিন দেরাদুন থাকিয়া মা আমাদের নিয়া হরিদ্বার চলিলেন। পূর্ব্বেই কথা ছিল, কলিকাতার দল তথায় মার জন্য অপেক্ষা করিবেন। মার কথামত তাঁহারা মার এক পাঞ্জাবী ভক্ত, নানকী বাঈয়ের

ধর্ম্মশালায় থাকিবেন। মা আমাদের নিয়াও সেই ধর্ম্মশালায়ই গেলেন। সেখানেও কয়েকদিন মা সকলকে নিয়া গঙ্গার ধারে ও রাস্তায় বেড়াইলেন। একদিন পাঞ্জাবী ভক্ত কিষণজী, সকলকে নিয়া হৃষীকেশ ছাড়াইয়া একটা যায়গায় এক সাধুর আশ্রমে নিয়া গেলেন। সেখানে সকলে স্নান করিয়া খাওয়া দাওয়া করিয়া আবার ৺হরিদ্বার চলিয়া আসিলেন। এইভাবে আনন্দ করিয়া কয়েকদিন কাটাইলেন। পরে সকলেই কলিকাতা রওনা হইয়া গেলেন, দিদিমাও সেই সঙ্গেই গেলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের দেরাতুন হইতে ৺হরিদ্বার গমন

জ্ঞানদাদা রহিলেন। তাঁহারা চলিয়া যাইবার ২।১ দিন পরই মা, ভোলানাথ, জ্যোতিষদাদা ও অতুল পাঞ্জাবের দিকে চলিলেন। আমাকে ও অখণ্ডানন্দজীকে কন্‌খলে কিছুদিন থাকিয়া বিন্ধ্যাচল যাইতে আদেশ দিয়া গেলেন। কি জন্য মা পুনঃ পুনঃ এইভাবে আমাদের ছাড়িয়া যাইতেছেন, মা-ই জানেন।

মা রওনা হইয়া গেলে আমরা কন্‌খলে মঙ্গলানন্দগিরি মহারাজের আশ্রমে রহিলাম। জ্ঞানদাদাও মার সঙ্গে গেলেন। কিছুদিন পরই ছুটী ফুরাইয়া যাওয়ায় তিনি কলিকাতা ফিরিয়া গেলেন। জ্যোতিষদাদার পত্রে খবর পাইলাম, মা অমৃতসর, কুলু, জ্বালামুখী এবং পাঞ্জাবের আরও নানাস্থানে ঘুরিয়া বৈদ্যনাথ গিয়াছেন, তথায়ই কিছুদিন থাকিবেন। ভোলানাথ অতুলকে নিয়া জ্বালামুখী গিয়াছেন, তিনি কিছুদিন তথায় বসিয়া সাধনা করিলেন। মা বৈদ্যনাথ গিয়া তারানন্দ স্বামীর ওখানেই আছেন।

৺হরিদ্বার হইতে পাঞ্জাব অভিমুখে যাত্রা। শ্রীশ্রীমায়ের বৈদ্যনাথে অবস্থান এবং ভোলানাথের জ্বালামুখীতে অবস্থান।

এবার উত্তরকাশী হইতে নামিবার পর, সকলেই মাকে বাঙ্গালা দেশের দিকে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছিলেন। মার বিশেষ অমত দেখি নাই, কিন্তু ভোলানাথ রাজি হইলেন না। তিনি আরও কিছুদিন এদিকে থাকিয়া সাধনা করিয়া পরে নামিবেন বলিলেন। তাই আর যাওয়া হইল না। ৺তারাপীঠের আদেশ নাকি তিন বৎসরের জন্য ছিল। তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরই একদিনের জন্য যাওয়া হইয়াছে। এবারও দুই বৎসর উত্তরকাশীতে কাটাইলেন। এবার নামিলে পুনরায় ৺তারাপীঠ যাইবেন, শুনিলাম। আমরা মাস-খানেক কন্‌খলে থাকিয়া বিন্ধ্যাচল চলিয়া গেলাম। আমরা বিন্ধ্যাচলে আসিবার কয়েকদিন পরেই মা ৺হরিদ্বারে আসিলেন।

এদিকে শ্রীমতী ভ্রমর উত্তরকাশী যাওয়ার জন্যই প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে হয় নাই। সে শিশুকাল হইতেই মাকে দেখিতেছে; তার ভাবটাও বেশ ভাল। কিছুদিন হইতেই সে মাকে খুব চিঠিপত্র লিখিত এবং উত্তরে মার নিকট হইতে অনেক উপদেশপূর্ণ চিঠি পাইত। সব সে একত্র করিয়া রাখিত।

শ্রীমতী ভ্রমর ঘোষের কথা এবং ৺শিবের সহিত তাহার বিবাহ।

মা তাহাকে একবার একটী ৺শিবলিঙ্গ দিয়াছিলেন (মা ৺কাশী হইতে কয়েকবারই কয়েকটী ৺শিবলিঙ্গ আনিয়া অনেককে দিয়াছিলেন)। সে সেই ৺শিবলিঙ্গটি পূজা করে। ৺শিবের একটি মন্দিরের মত আলমারী করিয়া রাখিয়াছে। মার আদেশে তাহার নাম দিয়াছে, 'যোগাশ্রম'।

এম, এ, পাশ করিয়া মাকে পাশের সংবাদ লিখিয়াছিল। মা উত্তরে লিখিয়াছিলেন, "এখন এদিককারও এম, এ, পাশ করা চাই।" মা কলিকাতা গেলেই, ভ্রমর অনেক সময়েই মার কাছে বসিয়া

থাকিত; মাকে কীর্ত্তন করিয়া শুনাইত। তাহার কোন বেশভূষা ছিল না; সাদাসিধা ভাবেই চলিত। উত্তরকাশী যাইতে না পারিয়া সে মাকে লিখিয়াছিল, মা এক জায়গায় বসিলেই সে আসিয়া মার কাছে কিছুদিন থাকিবে। মা বৈদ্যনাথ হইতেই তাহাকে ৺হরিদ্বারে মার কাছে আসিবার জন্য পত্র দিলেন। সেই অনুসারে সে ১৩৪২ সালের আশ্বিন মাসে ৺হরিদ্বারে আসিয়া মার সঙ্গেই দেরাদুন গেল।

এদিকে শঙ্করানন্দ স্বামী এবং মনোরমা দিদিও দেরাদুন গেলেন। মা কিছুদিন দেরাদুনেই রহিলেন। ঢাকা হইতে অমূল্যবাবু সপরিবারে মার কাছে দেরাদুনে গিয়া কিছুদিন কাটাইয়া আসিলেন। তাঁহারা পূজার ছুটিতে গিয়াছিলেন। ভোলানাথও জালামুখী হইতে দেরাদুনে গেলেন। চিন্তাহরণ সমাদ্দার মহাশয়ও সপরিবারে দেরাদুনে গিয়া মার কাছে কিছুদিন ছিলেন। মনোরমা দিদি তাঁহাদের সহিতই ৺বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া ৺কাশী চলিয়া আসিলেন। শঙ্করানন্দ স্বামী মার কাছেই রহিলেন; ভ্রমরও মার কাছেই রহিল। পরে শুনিলাম, মা ভ্রমরকে ৺শিবের সহিত বিবাহ দিয়াছেন। বিস্তারিত ঘটনা জানা যায় নাই। মা ভ্রমরকে খুব স্নেহ করেন এবং "বড় মা" বলেন।

শ্রীমতী ভ্রমর ঘোষ—
শ্রীশ্রীমায়ের "বড় মা"।

কিছুদিন দেরাদুনে থাকিবার পর মা সকলকে নিয়া নীচে আসিলেন। ৺তারাপীঠ যাওয়া স্থির করিয়াছেন। কথা হইয়াছে, সেখানে গিয়া কিছু দিন থাকা হইতে পারে। শঙ্করানন্দ স্বামী, অতুল ও নিশিবাবুকে ৺কাশীধাম পাঠাইয়া দিলেন। মার সঙ্গে ভোলানাথ, জ্যোতিষদাদা, ভ্রমর, হরিরাম, লছমী ও সারদা ছিলেন। সারদার নাম মা "সেবা" রাখিয়াছেন।

———

দ্বাবিংশ অধ্যায়

মা দেরাদুন হইতে নামিয়া ভক্তদের আহ্বানে ফয়জাবাদ, এটোয়া, সুলতানপুর, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া ১৩৪২ সনের অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে ৺কাশীতে পৌঁছিলেন।

(১৩৪২ অগ্রহায়ণ) ৺কাশীধামে শ্রীশ্রীমা। পণ্ডিত ভগবান দাস মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ এবং শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর সহিত শ্রীশ্রীমায়ের সম্মিলন।

৺কাশীতে মা পাঁড়ের ধর্ম্মশালায় উঠিলেন। আমাকে ও স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে ৺বিন্ধ্যাচল হইতে ৺কাশী গিয়া ঐ ধর্ম্মশালায় যাইবার জন্য মা পূর্ব্বেই টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। আমরা ৺কাশী গিয়া দুইদিন ঐ ধর্ম্মশালায় থাকার পর, মা ৺কাশী আসিয়া পৌঁছিলেন। ৺নির্ম্মলবাবুর স্ত্রী এবং পুত্র আমাদের সহিত মার অপেক্ষায় ঐ ধর্ম্মশালাই ছিলেন। দেরাদুন হইতে হরিরাম, সারদা ও কাশীবাবুর স্ত্রী (লছমী রাণী) মার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। মা আজ প্রায় ৪ বৎসর যাবৎ গৃহস্থের ঘরে বাস করেন না; ধর্ম্মশালায় বা মন্দিরে থাকেন।

দেখিলাম, মার অবস্থা স্বাভাবিক মত নাই। কথা অস্পষ্ট, মুখ শুষ্ক। শুনিলাম, ফয়জাবাদে স্বাভাবিক ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া পড়িয়াছিল; শরীরও অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক চেষ্টায় মাকে উঠাইয়া আনা হইয়াছে।

৺কাশীধামের বাবু ভগবান দাস মার সঙ্গে দেখা ও আলাপ করিয়া আনন্দিত হইলেন। ৺কাশীতে মা গিয়াছেন খবর পাইয়া বহুলোক মাকে দর্শন করিতে আসিলেন। দিনরাত্রি অসম্ভব ভিড় লাগিয়াই আছে।

গোপীবাবু একদিন মাকে তাঁর গুরু বিশুদ্ধানন্দ স্বামীজীর আশ্রমে নিয়া গেলেন। সঙ্গে আমরা অনেকেই গিয়াছিলাম। মাকে দেখিয়া তিনি খুব আনন্দিত হইলেন এবং মার কথায় ফুল হইতে স্ফটিক করিয়া দেখাইলেন এবং একখানা রুমালে গোলাপ ফুলের গন্ধ বাহির করিলেন।

মা ৺কাশীতে ৫।৬ দিন থাকিলেন। একদিন ৺বিশ্বনাথ দর্শনে গেলেন। ৺কাশী হইতে ভ্রমর কলিকাতা চলিয়া গেল। দেরাদুনের কাশী-বাবুর ছেলে "রজ্জুকে" মা ভ্রমরের ধর্ম্মপুত্র করিয়া দিয়াছেন। তাহার সঙ্গেই ভ্রমর কলিকাতা চলিয়া গেল। মা ৺কাশীতে ৫।৬ দিন থাকিয়া তারাপীঠ রওনা হইলেন। হরিরাম ও লছমী ৺কাশী হইতেই ফিরিয়া গেল।

মা ৺কাশীর ধর্ম্মশালায় সকলকে দিয়া সন্ধ্যাবেলা নাম করাইলেন, নিজেও করিলেন। মাকে গোপীবাবু প্রভৃতি ২।১টি গান করিত বলিলে মা তাঁর স্বাভাবিক মিষ্ট স্বরে নিম্নলিখিত গান দুইটী করিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের গীত কয়েকটি গান।

১। "(আমার) কি জাতি কি নাম, কোথায় বা সে ধাম
স্থির নাহি তার, বলি কি করে।
বলিব কি আর, আমি নহি কার,
কেউ নহে আমার, এ তিন পুরে॥
পিতা মাতা হীনা, কে ছিল জানি না,
কেহ ত বলে না, কোথাও না শুনি।
পতি গুণাধার, কপালে আমার,
শ্মশানে মশানে, কি হল কি জানি॥
সে যাতনা ভুগি, হয়ে গৃহত্যাগী,
সংসার বিরাগী, ফিরি বনে বনে।
আনিল সে বনে, জীবন ধারণে
আছি একাকিনী, প্রীতি সমরে॥"

২। "মা আমারে দয়া করে, শিশুর মতন করে রাখ।
শৈশবের সৌন্দর্য্য ছেড়ে, বড় হ'তে দিও নাকো॥
শাস্ত্র প'ড়ে জ্ঞানী হ'তে, সাধ নাই মা আর মনেতে,
লুকিয়ে থাকব তোর কোলেতে, ডাকতে চাই মা শিশুর ডাক।
ক্ষুধা পেলে কাতর স্বরে, শিশু যেমন মা, মা করে,
ভয় পাইলে নাহি ডরে, পাইলে সে মায়ের লাগ—
এমনি আমার শিশুর ধারা, করে রাখ মা জন্ম ভরা,
শরীর বাড়ুক তায় ক্ষতি নাই, মনটি আমার শিশু রাখ॥"

মা অনেক সময়ই গান করিতে বসিলে ঐ গান দুইটি করেন। আর একটি গানও মা করেন, গানটি এই :—

"আমার হল কি ব্যারাম।
কেবল হেরি রাম, দূর্ব্বাদলশ্যাম, জটাধারী॥
বিমানে ধরাতে, সম্মুখে পশ্চাতে,
দক্ষিণে বামেতে, রাম ধনুকধারী॥

কোথা গেল তেজ, ইন্দ্রিয় নিস্তেজ,
কফ পিত্তবায়ু হইল সতেজ,
যে মকরধ্বজে, নাশিবে সে তেজ,
কালক্রমে সে যে অন্তরে বিসরি॥

সুষুম্না ইড়া, পিঙ্গলা ত্রিশরা,
বেগে বহে তারা, রাখিতে নারি।
কি করি কি করি, কিসে প্রাণ ধরি,
হইল দুর্ব্বল সবলা নাড়ি।

সম্বিত আবল্যে নয়ন মুদিলে,
রাম বলে প্রাণ ওঠে শিহরি।
বটি তার রাম, পথ্য তার রাম,
রাম অনুপানে ভুবনে তরি।
রাম কষ্ট রোগে রাম কাল ভোগে,
রাম বিনে কি আর ঔষধ আছে তারি।
ভাবিলে সে রাম ত্রিদোষ ব্যারাম
কত যে আরাম বলিতে নারি॥"

মায়ের পিতা ৺বিপিন বিহারী ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই বৃদ্ধ বয়সেও খুব সুন্দর গান করিতে পারিতেন। শেষ গানটি মা পিতার কাছেই শিখিয়াছেন। মা সকলকে নিয়া কখনও হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন। আবার, "হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" শুধু এই নামটিই এত মিষ্টস্বরে করিতেন যে শুনিতে শুনিতে সকলেরই মন যেন স্থির হইয়া যাইত। ভ্রমরের সহিতও মা অনেক সময় এই নাম করিতেন। ভ্রমরও খুব সুন্দর কীর্ত্তন করিত। মা, পাঞ্জাবীদের সহিত মিলিয়া আরও কত রকমের নাম কীর্ত্তন করিতেন—সকলই মধুর লাগিত। বাঙ্গালীদের মধ্যে আসিয়া আবার সেইরূপ নামকীর্ত্তন করিতেন এবং করাইতেন। একটু নমুনা দিতেছি :—

১। "ভজরে ভাইয়া, রাম গোবিন্দ হরে,
রাম গোবিন্দ হরে, রাম গোবিন্দ হরে, রাম গোবিন্দ হরে॥
ভজরে বহিনা, রাম গোবিন্দ হরে,
যো মুখ রাম নাহি, সো মুখ ধূল পড়ে,
খোলত গাঁঠরী, ভজরে ভাইয়া, রাম গোবিন্দ হরে॥"

২। "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম,
পতিত পাবন সীতারাম॥
সীতারাম, জয় সীতারাম, জয় রঘুনন্দন, জয় সীতারাম॥
গৌরীশঙ্কর সীতারাম, ব্রজবাসী জয় রাধেশ্যাম।
জয়তু শিবা শিব জানকী রাম।
জয় রঘুনন্দন জয় সীতারাম॥"

৩। "হরিবোল, হরিবোল, হরি হরি বোল,
কেশব, মাধব, গোবিন্দ বোল॥"

এইরূপে সব নাম কীর্ত্তন করিতেন এবং সকলকে করিতে বলিতেন। বলিতেন, "নাম কীর্ত্তনে স্থান পবিত্র হয়, যে করে সে ত পবিত্র হয়ই, যে শোনে সেও পবিত্র হয়।"

একবার ঢাকায় রমণা আশ্রমে বীরেনদাদার মনে সংশয় জাগিয়াছিল, নাম কীর্ত্তনে কি হয়? পরে একদিন কীর্ত্তনের ঘরে খুব কীর্ত্তন হইতেছে। ভোলানাথও খুব কীর্ত্তনে মাতিয়াছেন। সেই সময় বীরেন-দাদাও কীর্ত্তনের কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন; তাঁহার ভিতরেও নাম চলিতেছিল। হঠাৎ কেমন যেন হইয়া গেলেন। একটা জ্যোতিঃ চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। অবশ্য তিনি চোখ বুজিয়াই ছিলেন। পরে সেই জ্যোতির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মুখখানি শুধু ভাসিয়া উঠিল। তাঁর সমস্ত শরীর হইতে ঝর ঝর করিয়া ঘাম বাহির হইতে লাগিল; তিনি দাঁড়াইয়াই আছেন। হঠাৎ মা জটুকে বলিলেন, "বীরেনকে গিয়া একটু বাতাস কর"। জটু তাহাই করিল। কিছুক্ষণ পর বীরেনদাদা স্থির হইলেন। কিন্তু একটা

কীর্ত্তনের সময় বীরেন-দাদার বিচিত্র দর্শন ও অবস্থা।

নেশার ভাব ছিল। তিনি যখন বাহির হইয়া মাঠে যান, অমূল্যদাদা তাঁহাকে ডাকিলেন। তিনি কিছু শব্দ করিলেন না; চলিয়া গেলেন। পরদিন বলিয়াছিলেন, "অমূল্যবাবু, আপনি যখন আমাকে ডাকিয়া ।ছলেন, তখন আমার কেমন একটা নেশার ভাব ছিল, কথা বলিতে পারি নাই"।

যাহা হউক কীর্ত্তনের পর বীরেনদাদা কিছুক্ষণ মাঠে থাকিয়া, যখন মার কুটীরের বারান্দায় মার কাছে আসিলেন, তখন মা শুধু একটু হাসিলেন এবং বলিলেন, "বাবাজী, আজ যাহা দেখিলে, তাহা শুধু আভাস।" দাদা অবাক্ হইয়া গেলেন।

"হরি বোল হরি বোল" বলা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমায়ের উক্তি।

সেইদিনই অনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "মা হরিবল না বলিয়া হরিবোল বল কেন?" মা উত্তরে বলিলেন, "হরিবোল বলিতে বলিতে প্রণব আসিয়া পড়ে।" এই বলিয়া বীরেনদাদাকে বলিলেন, "তুমি আজ যাহা দেখিলে, তাহা প্রণবের আভাস মাত্র।"

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

৺কাশী হইতে মা সকলকে নিয়া ৺তারাপীঠে গেলেন। মা আমাদেরও সঙ্গে নিলেন। সঙ্গে আমি, অতুল, নেপালদাদা, অখণ্ডানন্দজী, জ্যোতিষ-দাদা ও শঙ্করানন্দজী ছিলাম। ৺তারাপীঠে মা পূর্ব্ব হইতেই পরিচিতা। মার ৺তারা-পীঠে আগমনের খবর পাইয়া দলে দলে লোক মার দর্শনে আসিল। মা গিয়া সিদ্ধাশ্রমে রহিলেন। আমরা সকলেই সেখানে রহিলাম। ভোলানাথ গিয়া ৺তারা মার মন্দিরের বারান্দায় নিজের ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিছাইলেন। তিনি সেখানেই বেশী সময় থাকিতেন। কলিকাতায় খবর পাইয়া, সেখানকার অনেকেই আসিলেন। যতীশ গুহ মহাশয়েরা সপরিবারে আসিলেন; প্রাণকুমারবাবু সপরিবারে আসিয়াছেন; পশুপতিবাবুর স্ত্রী, নবতরু দাদা, জ্ঞানদাদা সকলেই আসিয়াছেন। প্রায় প্রত্যেক দিন রামপুরহাট হইতে গরুর গাড়ী ভর্ত্তি হইয়া ভক্তেরা নানাস্থান হইতে মার দর্শনে আসিতেছেন।

৺কাশীধাম হইতে শ্রীশ্রীমার পুনশ্চ ৺তারাপীঠ গমন।

৺তারাপীঠে কয়েক ঘর মাত্র পাণ্ডা আছেন; আর বাকি সবই শ্মশান। এই শ্মশানে আনন্দের হাট বসিল। এত লোকের সমাগমে দোকান-পাটও বসিল। যতীশ গুহ মহাশয় একদিন খুব সমারোহের সহিত ৺তারা মায়ের পূজা দিলেন। শচীবাবু আসিয়াছেন। তিনি ৺তারা মায়ের রেশমী পরিচ্ছদ ও নূতন বিছানা নিয়া আসিয়াছেন। সেখানে ভোলানাথের পাণ্ডা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ পাণ্ডা ঠাকুরটিও খুবই ভাল মানুষ। তিনি এবং তাঁর ছেলেরাও মার খুব অনুগত। কিছুদিন

পর মা আমাকে ও জ্যোতিষদাদাকে চট্টগ্রাম পাঠাইয়া দিলেন। কারণ পরে বলিতেছি।

১৩৪২ সনের পৌষ মাসে মা জ্যোতিষদাদাকে চট্টগ্রাম পাঠাইলেন, সঙ্গে আমাকে দিয়া দিলেন। বলিলেন, "ধর্ম্ম-ভাইয়ের সেবা করিতে যাও; এক যে বাপেরই সেবা করিবে, এমন ত কথা নাই, এই রাস্তায় আসিলে ধর্ম্ম সম্বন্ধই বড়"। আমরা রওনা হইবার ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বেও জানিনা যে, আজ আমাদের মাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। মা নিজেই আমাদের পাণ্ডা মহাশয়কে দিয়া গাড়ীর বন্দোবস্ত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। সারাদিন মা ৺তারা মায়ের মন্দিরে শুইয়াছিলেন। ভোলানাথ সেই সময় অনেককে দীক্ষা দিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে মা উঠিয়া মন্দিরে আমাদের ডাকিয়া নিলেন। ২।৪টী কথা বলিলেন, "আমি যাহা বলি, তাহা করিয়া যাইও। আপত্তি করিও না। তোমাদের মঙ্গলের জন্যই জানিও"।

৺তারাপীঠ হইতে আমাদের চট্টগ্রাম পাঠাইবার পূর্ব্বেই যখন বাবু যতীশ গুহ প্রভৃতি সপরিবারে পূজা দিতে আসিলেন, প্রাণকুমারবাবুরাও সপরিবারে আসিয়াছিলেন। পশুপতিবাবুর স্ত্রী, শচীবাবুর বাসার মেয়েরা, শচীবাবু সকলেই আসিয়াছেন। অনেক খাবার নিয়া ৺তারা মায়ের নাটমন্দিরে গিয়া মাকে বসাইয়া সকলে ভোগের আয়োজন করিয়াছেন। কি কথায় মা ভয়ানক হাসিতে হাসিতে আবার কাঁদিতে লাগিলেন। কেমন যেন ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সকলে ভয় পাইয়া গেল। অনেক পরে মার স্বাভাবিক অবস্থা হইল। ৺তারাপীঠে প্রায় ২।৩ বার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। মন্দিরের ভিতরেই মা জ্যোতিষদাদার

৺তারাপীঠে শ্রীশ্রীমা কর্ত্তৃক জ্যোতিষদাদা ও আমার মধ্যে ধর্ম্ম-ভাইবোন সম্বন্ধ স্থাপন।

ও আমার হাত একত্র করিয়া বলিলেন, "তোমরা ধর্ম্ম-ভাইবোন, পরস্পর পরস্পরকে দেখিও।" শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী সংজ্ঞা দেবীও কয়েকদিন আসিয়া এখানে মার কাছে ছিলেন।

যখন মা ঐ ধর্ম্ম-সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন, তখনও জানি না কি আদেশ হইবে। সন্ধ্যার কিছু পরে মন্দির হইতে উঠিয়া সিদ্ধাশ্রমে গিয়া আমাকে ও জ্যোতিষদাদাকে কিছু খাইতে আদেশ করিলেন। আমরা খাইয়া উঠিলে ৺তারা মায়ের নাটমন্দিরে কীর্ত্তনে আমাদিগকে নিয়া গেলেন। তখন সেখানে কলিকাতা হইতে বাবু যতীশ গুহের পরিবারবর্গ, শচীবাবু, প্রাণকুমারবাবু সপরিবারে, জ্ঞান ব্রহ্মচারী, নবতরুদাদা প্রভৃতি বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা আজ কয়দিন হইল, মার দর্শনে আসিয়াছিলেন, মহা আনন্দ চলিতেছিল।

উক্ত সম্বন্ধ স্থাপনের পর উভয়কে একত্রে চট্টগ্রাম যাইতে আদেশ

রাত্রি প্রায় ৮টার সময় মা সিদ্ধাশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া আদেশ করিলেন যে, এখনই জ্যোতিষ দাদাকে চট্টগ্রাম যাইতে হইবে ও সঙ্গে আমাকে যাইতে হইবে। জ্যোতিষদাদার শরীরটা ভাল ছিল না; কিন্তু মা আমাকেই সঙ্গে যাইতে আদেশ করিয়া বাবার (স্বামী অখণ্ডানন্দজী) দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "তোমার কি মত।" বাবা বলিলেন, 'তুমি যাহা বল, আমার কিছুতেই আপত্তি নাই। তবে জ্যোতিষের শরীর খারাপ সঙ্গে একজন পুরুষ গেলে ভাল হইত না?' মা আমায় বলিতেছেন, "খুকুনীই ত পুরুষ; ওকে ত অনেকে ব্রহ্মচারীদাদা বলে। ওরই যাইতে হইবে।"

মা স্থিরভাবে হাসি হাসি মুখে বসিয়া আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন। রাত্রি ৯টার সময় আমরা দুইজনে গরুর গাড়ী করিয়া রওনা হইলাম। রামপুরহাট আসিয়া রাত্রির ট্রেণ ধরিয়া ভোরে কলিকাতা

পৌঁছিলাম। পৌঁছিয়া সেদিন আমরা কলিকাতায় রহিলাম। রাত্রিতে কলিকাতার ভক্তেরা ৺তারাপীঠ হইতে ফিরিয়া আমাদের সঙ্গে দেখা করিয়া জানাইলেন, মা ২।১ দিনের মধ্যেই কলিকাতায় আসিতেছেন। কিন্তু কলিকাতায় থাকিবেন না, ঢাকা রওনা হইয়া যাইবেন। ঢাকায় ৫।৭ দিন থাকিবেন, পরে কলিকাতা আসিয়া কয়েকদিন থাকিয়া পুনরায় ৺তারাপীঠ যাইবেন কেননা ভোলানাথ ৺তারাপীঠে শীঘ্র ফিরিয়া যাইতে চান। তখন শচীবাবু পূজা দিবেন, আর ভোলানাথ স্বয়ং ৺তারামায়ের পূজা করিবেন। আমরা পর দিনই চট্টগ্রাম রওনা হইয়া গেলাম।

চট্টগ্রাম হইতে টেলিগ্রাম করিয়া খবর পাইলাম, মা ঢাকা পৌঁছিয়াছেন। আজ প্রায় ৪ বৎসর পর মা ঢাকা ফিরিয়াছেন। আবার ৭ দিন পরই মা চলিয়া যাইতেছেন। কাজেই ঢাকায় মাকে দর্শনের জন্য সকলেই পাগল। অসম্ভব ভিড়। রাত্রিতে মেয়েরা অনেকে মার কাছে আশ্রমেই থাকেন। মার ঢাকাবাসের ষষ্ঠ দিনে আমি ও জ্যোতিষদাদা চট্টগ্রাম হইতে ঢাকায় পৌঁছিলাম। আগামী কল্যই মা ঢাকা ছাড়িবেন।

ঢাকায় শ্রীশ্রীমা।
জ্যোতিষদাদার ও আমার ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন।

আশ্রমে লোকারণ্য; মার কাছে যাওয়াই মুস্কিল। বাঙ্গলাদেশে মাকে সিন্দুরে লাল করিয়া দিয়াছে। বড় লালপেড়ে সাড়ী পরাইয়াছে। কাহারও যেন মাকে দেখিয়া আকাঙ্খা মিটিতেছে না। মা মাঠে গিয়া বসিতেছেন; আশ্রমে জায়গা হইতেছে না। পুনঃ পুনঃ মার সিন্দুর মাখান চোখ মুখ ধোয়াইয়া দিতেছে। কাপড় জামা সব সিন্দুরে লাল হইয়া গিয়াছে। মাকে সিন্দুর দিয়া যেন কাহারও আশা মিটিতেছে না। সকলেই যেন উন্মাদ। বাবা ভোলানাথও সকলের সহিত আলাপ

করিতেছেন। সকলের প্রাণেই আনন্দ। কিন্তু মা কালই চলিয়া যাইবেন, আবার কবে ফিরিবেন কে জানে!

যাহা হউক, সোমবার আমরা ঢাকা হইতে রওনা হইয়া পারুলদিয়া গ্রামে গেলাম। কারণ পূর্ব্বেই রায়বাহাদুর যোগেশ ঘোষের সহিত কথা হইয়াছিল যে যাওয়ার সময় মা তাঁহার বাড়ী হইয়া যাইবেন, এবং তথায় যোগেশবাবু ৺রাধাকৃষ্ণের যে মন্দির তৈয়ার করিয়াছেন, তাহার পরিচালনার সুব্যবস্থা করিয়া ভোলানাথ নিজ হাতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইবেন। যোগেশবাবু অতি বৃদ্ধ। তিনি বহুদিন ধরিয়া এই আশা করিয়া আছেন, যে মাকে একবার মন্দিরে নিবেন। মা তাঁহার এই আশা অপূর্ণ রাখিলেন না। তথায় যাওয়ার সময় মাকে দর্শন করিতে অনেকে আসিয়াছেন।

ঢাকা হইতে পারুলদিয়া গমন।

মা বিক্রমপুর পারুলদিয়া গ্রামে ২।১ দিন থাকিবেন শুনিয়া অনেক স্ত্রী-পুরুষ মার সঙ্গে পারুলদিয়া গ্রামে চলিলেন। অনেকে এক বস্ত্রেই চলিয়াছেন কারণ, অনেকেরই মাকে দেখিয়া ফিরিয়া বাসায় যাইবার কথা ছিল, কিন্তু পারিল না; সঙ্গেই চলিল। প্রায় ৬০।৬৫ জন সহ পারুলদিয়াতে যাওয়া হইল।

সেখানেও যোগেশবাবু মহোৎসব করাইলেন। ভোলানাথ নিজ হাতে মন্দিরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সেবার জন্য ঢাকা হইতে কমলাকান্তকে নেওয়া হইল। যোগেশবাবু, তাঁহার স্ত্রী এবং অন্যান্য অনেকে সেখানে ভোলানাথের কাছে দীক্ষিত হইলেন। মা ভোলানাথকে লক্ষ করিয়া বলিতেছেন, "আমার গোপাল আজ অনেক পূজাদি করিবে; খুব ভাল কাজ করে, তাই

তথায় রায়বাহাদুর যোগেশবাবুর রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা।

আমিও কাপড় পরাইয়া দেই।" এই কথা বলিতে বলিতে মা যেমন শিশুসন্তানকে আদর করেন, কাপড় পরাইয়া দেন, তাহাই করিতেছেন। ভোলানাথও মায়ের পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিলেন। মা'ও বলিতেছেন, "গোপাল ত নারায়ণ, আমিও প্রণাম করি" বলিয়া মা'ও প্রণাম করিলেন। মন্দিরে যথা নিয়মে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাদির পর রাত্রিতে কীর্ত্তনাদি হইল। দুইদিন আমরা পারুলদিয়াতে থাকিয়া কলিকাতা রওনা হইলাম।

মা কলিকাতায় পৌঁছিলেন। বহু ভক্ত ষ্টেশনে উপস্থিত। আমরা মেল ট্রেণ ফেল করায় রাত্রিতে আসিয়া কলিকাতা পৌঁছিলাম। মার জন্য ধর্ম্মশালা ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে। বাবু যতীশ গুহদের বাড়ীর কেহ খায় নাই, সেখানেই ভোগরান্না তৈয়ার ছিল। ষ্টেশন হইতে মোটরে মাকে বাবু যতীশ গুহদের বাড়ীর দরজায় নেওয়া হইল।

পারুলদিয়া হইতে কলিকাতা গমন।

আমরা জানি, মা আজ ৪ বৎসর যাবৎ গৃহস্থের ঘরে যান না। কিন্তু যখন সকলে বলিতে লাগিল, "মা, কেহ খায় নাই, ভোগরান্না তৈয়ার; তুমি আর কোন ঘরে যাইও না, শুধু হল ঘরটি, যে ঘরে আমরা শুধু কীর্ত্তনাদি করি, তোমারই ছবি দিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছি, সেই ঘরে যাইতে আপত্তি কি?" তখন মা'ও বেশী কিছু আপত্তি করিলেন না। আর কোন ঘরে না গিয়া, সেই ঘরটিতেই গিয়া বসিলেন। বহু ভক্ত তথায় একত্রিত হইয়াছেন। একটা আশ্চর্য্যের বিষয়, মা ঘরে যাইতেই লাইটগুলি সব নিস্তেজ হইয়া গেল। সকলেই বলিতেছেন, "এ'কি হইল।"

বাবু যতীশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের বালিগঞ্জের বাড়ীতে পদার্পণ।

৺ক্ষিতীশ চন্দ্র গুহ মহাশয়ের কথা।

যতীশ গুহ মহাশয়েরা তিন ভাই, খুবই ভক্ত পরিবার। বৃদ্ধা মা

আছেন; বউরা, শিশু-ছেলেমেয়েরা সকলে মিলিয়া রোজ মার কীর্ত্তন-আরতি করেন। কলিকাতাস্থ সব ভক্তেরাই এঁদের বাসায় মিলিত হইয়া মার নাম করেন। মধ্যম ভাই ক্ষিতীশদাদার আজ কয়দিন যাবৎ জ্বর। তিনি উঠিয়া আসিয়া মাকে প্রণাম করিলেন। এই ক্ষিতীশ দাদারও এত ভক্তি, মার নাম করিতেই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িত। বালিগঞ্জে নিজেরাই বাড়ী করিয়াছেন। মা সেই বাড়ীতেই আসিয়াছেন।

রাত্রি প্রায় ১২টায় ভোগাদির পরে মাকে নিয়া আমরা ৺কালী-ঘাটের ধর্ম্মশালায় রাত্রিবাসের জন্য গেলাম। পরদিনও কীর্ত্তন উপলক্ষ করিয়া মাকে গুহ মহাশয়দের বাড়ীতে আনা হইয়াছে। মা আজ প্রায় ১৷৷০ বৎসর যাবৎ একদিন পর একদিন আহার করেন। আজ আর মার খাওয়া হয় নাই। ভোলানাথ ও অপরাপর ভক্তেরা এই বাসাতেই আহার করিলেন। মা বসিয়া ভক্তদের সহিত কথা বলিতে-ছেন। স্বামী যোগানন্দ (রাঁচি ও আমেরিকায় তাঁহার আশ্রম আছে) আসিয়া মার ফটো নিলেন ও মার সঙ্গে আলাপ করিলেন। মধ্যে মধ্যে কীর্ত্তনাদিও হইতেছে।

পাশের ঘরেই ক্ষিতীশ দাদা শুইয়া আছেন। অসুস্থ, কিন্তু এই গোলমালে বিরক্ত হইতেছেন না। বরং মা যে তাঁহাদের বাটীতে আসিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার দর্শন পাইতেছেন, এই তাঁর মহা আনন্দ। বাড়ীর সকলেও রোগীকে দেখিতেছেন না, মাকে নিয়াই সকলে মহা আনন্দে আছেন। ৩।৪ দিন কলিকাতায় থাকিয়া যেদিন ৺তারাপীঠ যাওয়ার কথা, তাহার পূর্ব্বদিন রাত্রি প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত, মা যতীশদাদার বাসায় বালিগঞ্জে ছিলেন। সেদিন ক্ষিতীশদাদার অবস্থা বেশ ভাল নয়। মা রাত্রিতে ধর্ম্মশালায় আসিবার সময় যতীশদাদাকে

বলিয়া আসিলেন, "ভাল করিয়া চিকিৎসা করাও; বড় ডাক্তার দেখাও, মার (যতীশদাদার মা) মনে যেন কষ্ট না থাকে।" আমি কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। ভয় হইল, মা এ আবার কি বলিতেছেন?

সারারাত্রি সেদিন ধর্ম্মশালায় ভ্রমরের সহিত (ভ্রমর কলিকাতা হইতে আজ কয় মাস পূর্ব্বে দেরাদুনে মার কাছে গিয়াছিল, ৺কাশী পর্য্যন্ত মার সঙ্গেই আসিয়া ৺কাশী হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসে। পরে আবার মা ৺তারাপীঠে গেলে ভ্রমরও তথায় গিয়া মার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল) কথা বলিতেছিলেন; শুইবার ভাবই নাই। অনেক সময় দেখিয়াছি, কোন বিপদের সম্ভাবনার পূর্ব্বে মার এইরূপ ভাব হয়। তাই এই অবস্থা দেখিয়া ক্ষিতীশদাদার জন্য আমার চিন্তাই হইতেছিল। রাত্রি ৩টার সময় খবর পাইলাম, তাঁহার অবস্থা খুব খারাপ। মা বলিতেছেন, "সকলে ভাল করিয়া সেবা কর"। শঙ্করানন্দ স্বামী ও জটুকে মা সেই বাসায় রাত্রে থাকিতে বলিয়াছেন।

সকাল বেলা মাকে অন্যান্য বাসায় নিয়া গেল। আমরা যখন দুপুর বেলা শচীবাবুর বাসায় গিয়াছি, তখন খবর পাইলাম, ক্ষিতীশদাদার মৃত্যু হইয়াছে। মা কিন্তু স্থির, ধীর। মুখে কোনই পরিবর্ত্তন নাই।

শুনিলাম, ক্ষিতীশদাদার মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রাত্রে একটা সাদা পাঁঠা দোতলায় উঠিয়া ক্ষিতীশদাদার স্ত্রীর কোলের কাছে যায়, পরে ক্ষিতীশদাদার চৌকির নীচে বসিয়াছিল। মৃত্যুর পরে মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যাওয়ার সময়, ঐ পাঁঠাও সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল। কোথা হইতে এই পাঁঠা আসিল, কেহ জানে না। মা এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "পবিত্র আত্মাদের নিবার জন্য মহাত্মারা এই রকম নানা রূপ ধরিয়া আসেন। দেখ, কেমন শরীরের নীচে, চৌকির নীচে গিয়া বসিয়া রহিল"।

ক্ষিতীশদাদার মৃত্যু এবং শ্রীশ্রীমায়ের ৺তারাপীঠে পুনশ্চ গমন।

বৈকালে আমরা বিনয়বাবুর বাসায় গিয়াছি। সেখানে মার ভোগ হইল। সন্ধ্যার গাড়ীতে ৺তারাপীঠ রওনা হইব। প্রায় সব ভক্তগণই ক্ষিতীশদাদার সৎকার করিতে এবং পরিবারস্থ সকলকে সান্ত্বনা দিতে সেই বাড়ীতে গিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, "মা, আজ ৺তারাপীঠে যাওয়ার দরকার নাই, এই বিপদ্"। মা বলিতেছেন, "যখন পূর্ব্বেই ঠিক হইয়াছে, তখন আজই যাওয়া হইবে"। তাহাই হইল।

আসিবার সময়, যতীশদাদাদের বাড়ীর সামনে মোটরে মাকে রাখিয়া সকলে ক্ষিতীশদাদার স্ত্রী ও তাঁহার মাকে নিয়া ঐ মোটরের নিকট আসিল। পুরুষরা সকলেই শ্মশানে গিয়াছেন; কি ভয়ঙ্কর অবস্থা। মা, ক্ষিতীশদাদার মা ও স্ত্রীকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন, বলিলেন, "ক্ষিতীশের আত্মা বড় পবিত্র ছিল"। ক্ষিতীশদাদার শাশুড়ী এই শোকের মধ্যেও বলিতেছেন, "মা, তখন বুঝি নাই; কিন্তু এখন মনে হইতেছে যে তুমি এই মহাপুরুষকে বিদায় দিতেই আসিয়াছিলে"। মা, আরও কি সব ক্ষিতীশদাদার স্ত্রীকে চুপি চুপি বলিলেন। ইহাও বলিলেন, "ক্ষিতীশের জন্যই বোধ হয় আমার ঘরে যাওয়া হইয়াছিল। সে ত বাহিরে আসিতে পারিত না। আমি ত নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না; যাহা হইয়া যায়"। মা বাড়ীতে পা দেওয়ামাত্র যে লাইটগুলি নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিল, সে কথাও ক্ষিতীশদাদার মৃত্যুতে অনেকের মনে পড়িয়া গেল। এই শোকাবহ ঘটনা শেষ করিয়া আমরা রাত্রির ট্রেণেই ৺তারাপীঠ রওনা হইলাম। পর দিন ৺তারা-পীঠে পৌঁছিলাম।

ভ্রমরকে আসিবার সময় মা কলিকাতা রাখিয়া আসিলেন। ভ্রমরের ছোট বোন টুন্টির খুব কঠিন অসুখ। মা ভ্রমরকে তার জন্য কি সব নিয়ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট কয় দিনের জন্য কলিকাতাতে থাকিতে বলিয়া আসিলেন।

মা কাহারও কথা অন্য কাহারও কাছে বলেন না। যার যা দরকার, তার কাছে তাই বলেন। কাজেই ভ্রমরকে কেন রাখা হইল, কি নিয়ম বলা হইল, বাহিরের কেহ জানে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এর পর হইতেই টুন্টি ভাল হইতে আরম্ভ করিল। মার গায়ের অলোয়ানও তাকে দিয়া আসেন। এই সব যে হইত, মা ইচ্ছা করিয়া করিতেন না। এক এক জনের জন্য হইয়া যাইত। বোধ হয় যার যে রকম কর্ম্ম সেই অনুসারেই মার শরীর দিয়া কাজ হইয়া যায়। মা প্রায়ই বলেন "তোমরা যেমন করাইয়া লও।"

ভ্রমরের ছোট বোনের কঠিন ব্যাধি সম্বন্ধে ভ্রমরকে শ্রীশ্রীমায়ের গুপ্ত উপদেশ এবং তাহা পালনে তাহার রোগ প্রশমন।

[পুনশ্চ—৺তারাপীঠে যাইয়া তথায় অবস্থানকালে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হইল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে (অর্থাৎ ২৪ অধ্যায়ে) পূর্ব্বের কয়েকটি ঘটনা লিখিত হইল। লেখিকা।]

———

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

একবার কলিকাতায় মা স্বরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় আছেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা নানা রকম ভোগ রাঁধিয়া দিয়াছেন। বীরেনদাদা তখন সেখানে ছিলেন। তখন নিয়ম ছিল, ভোলানাথ ভোগ নিবেদন করিতেন, মা নিকটে বসিয়া থাকিতেন। সেদিন মা বীরেনদাদাকে বলিলেন, "আজ তুমি গিয়া ভোগ নিবেদন করিয়া দাও"। এই বলিয়া মা উপরেই বসিয়া রহিলেন। নীচে ভোগ নিবেদন করিয়া, বীরেনদাদা আসিয়া মা ও ভোলানাথকে আহারের জন্য ডাকিয়া নিয়া গেলেন। একটা কি তরকারি মার মুখে দিতেই মা বলিতেছেন "এটা কি কচুর শাক নাকি"? অথচ, সেই তরকারি খাইয়া কচুর শাক বলিয়া ভুল করিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। বীরেনদাদা ইহাতে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

কলিকাতায় মায়ের ভোগ সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা।

ঘটনা এই যে, অনেক তরকারি রাঁধিয়া ভোগ দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতার অনেক বাসারই নীচের ঘরগুলি কতকটা অন্ধকার; উক্ত তরকারির বাসনটা অনেক দূরে ছিল। বীরেনদাদা দূর হইতে ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই; কচুর শাক মনে করিয়া, নিবেদন করিবার সময় তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু মা যেখানে খাইতে বসিয়াছিলেন, সেখানে আলোর কোন অভাব ছিল না; বিশেষতঃ মা সেই তরকারি মুখে দিয়াই বলিতেছেন, "কচুর শাক নাকি"? বীরেনদাদা তখন সকলের কাছে ঘটনাটা বলিলেন। মা হাসিতে লাগিলেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একদিন মা কলিকাতায় রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত দীনেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় গিয়াছেন। রাত্রিতে সেখানেই থাকা হইল। ভোর বেলায় মা শুইয়া আছেন। এর মধ্যে জনৈক প্রফেসার, তাঁর একটি ছোট ছেলেকে নিয়া মার কাছে গিয়াছেন।

কলিকাতায় একটি ছেলের পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে শ্রীশ্রী-মায়ের উক্তি।

প্রফেসার মহাশয় গিয়া বসিয়াই আছেন। অনেক পরে মা উঠিয়া ছেলেটির দিকে চাহিয়া আছেন। হঠাৎ মা কাঁদিয়া উঠিলেন; এবং এই ছেলেটি পূর্ব্বজন্মে মার সহোদর ভাই ছিল বলিয়া প্রকাশ করিলেন। আরও বলিলেন, সেই ভাই মারা যাওয়ার কিছুদিন পূর্ব্বে বাবা রাগ করিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। তখন তাহার হাতে খুব চোট লাগিয়াছিল; কয়েকদিন পরেই মারা গেল। কাজেই হাতখানা যে চোট পাইয়া বাঁকা হইয়া গিয়াছে, ইহা কেহ লক্ষ্য করিল না। এই জন্মে সেই চিহ্ন নিয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই বলিয়া ছেলেটিকে টানিয়া নিজের দিকে আনিয়া দেখাইলেন যে ছেলেটির একটি হাত একটু বাঁকা। পরে ছেলেটির বাবা বলিলেন, "জন্মাবধিই এই অবস্থা, তাই মাকে দেখাইতে আনিয়াছি"। মা বলিলেন, "পূর্ব্বজন্মের চিহ্নের আরও অনেক লক্ষণ দেখিতেছি। এই চিহ্ন যাইবার মত নয়ই; এই ছেলেকে বাঁচাইতে পার, তবে হয়"। এই বলিয়া মা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ছেলের বাবা এবং অন্যান্য সকলেই ছেলেটি যাহাতে বাঁচিয়া থাকে, সে জন্য মার কাছে কত বলিতে লাগিলেন। কিন্তু মা আর কিছুই বলিলেন না। ঐ বাসা হইতে মা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ীতে গেলেন। ছেলেটিকে নিয়া তার বাপ-মা গিয়া সেখানে মার

কাছে উপস্থিত। তাঁহারা যে কথা শুনিয়াছেন তাহাতে ছেলের জীবনের জন্য তাঁহাদের বড়ই আশঙ্কা হইয়াছে। তাই মার মুখ হইতে একটা আশ্বাস বাণী না নিয়া তাঁহারা যাইতে পারিতেছেন না। হাত বাঁকা দেখাইতে প্রথম আসিয়াছিলেন; কিন্তু এখন বলিতেছেন, "মা, হাত এইরূপই থাকুক, তবুও যেন দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে।" সকলে মিলিয়া বলাতে, মা নিজের হাতের আংটি খুলিয়া ছেলেটিকে দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, "ইহা যেন সঙ্গে সঙ্গে থাকে"। আর কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে ভোলানাথ বলিয়া দিলেন। পরে তাঁহারা মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। আরও ২।৩ বার তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইয়াছে; ছেলেটীকেও দেখিয়াছি। তারপর আর খবর পাই নাই।

মা বাংলাদেশে আসিয়া ৺তারাপীঠে ভক্তদের অনেককে নূতন নূতন নাম দিলেন। আবার ভক্তেরাও মাকে এক একটি নাম দিল। পারুলদিয়া হইতেই মার নামের এই খেলা চলিতেছে। মাকে সকলে এক একটি নাম দিতেছেন। মা পারুলদিয়াতে শ্রীমতী ভ্রমরকে দিয়া তাহা লিখাইয়াছেন। আবার ৺তারাপীঠে সকলে মার যে যে নামকরণ করিতেছেন, তাহা মা আমাকে দিয়া সব লিখাইলেন। বোধ হয়, ১০০।১৫০ নাম হইল। শুনিয়াছি, মার ছোটবেলায় ৫টি নাম ছিল,—'দাক্ষায়নী', 'তীর্থবাসিনী', 'গজগঙ্গা', 'বিমলা' ও 'কমলা'। দিদিমা 'নির্ম্মলা' নাম রাখিয়াছিলেন। "নির্ম্মলা" নামেই মা পরিচিতা ছিলেন। পরে জ্যোতিষ-দাদা "আনন্দময়ী" নাম দিলেন। ভক্তদের মধ্যে মা এই নামেই পরিচিতা হইলেন।

মা একবার বলিয়াছিলেন, "আমার যখন শারীরিক ক্রিয়াদি হইতে আরম্ভ হইল, একদিন মেরুদণ্ডের মধ্যে একটা খট্‌খট্ শব্দ হইতে লাগিল, যেন কিছু উপরে উঠিতেছে। তখন আমার শ্রীপুরের একটি

ঘটনা মনে হইল। শ্রীপুরে যখন ভাসুরের বাসায় থাকিতাম, তিনি ষ্টেশনমাষ্টার ছিলেন, কাজেই ষ্টেশনের কাছেই আমাদের বাসা ছিল। কোন কোন সময় গাড়ীগুলি লাইন হইতে পড়িয়া গেলে, যখন উঠান হইত, তখন একটা খট্‌ খট্‌ শব্দ হইত। আমার সেই কথাটা মনে পড়িত।"

শ্রীশ্রীমায়ের একটি শারীরিক ক্রিয়া।

মা অনেক সময় বলেন, "সাধন' মানে আমি ত বলি, 'স্বধন' এই ধন আর ক্ষয় হয় না। আবার, "গৃহস্থ" অর্থ "গৃহ যার হাতে"। পূর্ব্বে লোকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া তবে গৃহস্থ হইত, কাজেই গৃহ তাহাদের হাত করিতে পারিত না। গৃহই তাহাদের হাতে থাকিত। তাই তাহারা গৃহধর্ম্ম পালন করিয়া, সময় মত আবার বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস লইতে পারিত। গৃহ তাহাদের আবদ্ধ কবিতে পারিত না।

"সাধন" ও "গৃহস্থ" পদ দুইটির শ্রীশ্রীমা প্রদত্ত অর্থ।

বাজিতপুরে মার একটা ঘটনা মনে পড়িল, ইহা মা নিজ মুখেই বলিয়াছেন। একদিন বাজিতপুরে ভোলানাথের পেট খারাপ হইয়া অবস্থা খুব খারাপ হইয়া পড়িল; তখন মার বয়স অল্প ছিল। রাত্রিতে ভোলানাথ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। মা তখন একাই ছিলেন। মা ভোলানাথের মাথা কোলে করিয়া বসিলেন এবং মার মুখ হইতে উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্রাদি স্বতঃই বাহির হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে ভোলানাথের আপাদ মস্তক মা নিজ হাতে ঝাড়িতে লাগিলেন। (মা বলিলেন, "হাত দিয়া স্বতঃই ঐরূপ ক্রিয়া হইতে লাগিল")। কিছু পরেই ভোলানাথ একটু

বাজিতপুরের একটি ঘটনা— ভোলানাথের আশ্চর্য্য রোগ মুক্তি।

সুস্থ হইলেন। পরদিনই মা ভোলানাথকে অন্ন-পথ্য দিলেন। প্রতিবেশীরা ইহাতে বাধা দিয়াছিলেন। কিন্তু অন্ন-পথ্য পাইয়াই ভোলানাথ ক্রমে ভাল হইয়া উঠিলেন।

শ্রীশ্রীমা কৃত গায়ত্রী মহামন্ত্রের অর্থ।

মা, ব্রাহ্মণদের গায়ত্রী জপের উপর খুব জোর দেন। যিনি যতটুকু পারেন, তাঁহাকে ততটুকু গায়ত্রী জপ করিতে বলেন! একবার মা আমাকে গায়ত্রীর অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

গায়ত্রীর অর্থঃ—

"যিনি সৃষ্টি স্থিতি, লয় করিয়া থাকেন, যিনি বিশ্বরূপ তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করিয়া থাকেন। সেই যে পরব্রহ্ম অন্তর্য্যামী, তাঁহার বরণীয় জ্যোতিঃ আমি ধ্যান করিতেছি।"

ঢাকায় ভূদেববাবু, মার বাজিতপুরের কথা বলিতে বলিতে ইহাও বলিলেন যে, "মা খুব উৎকৃষ্ট রান্না করিতে পারিতেন, এমন কি চপ্, কাটলেট প্রভৃতি বড়লোকের খাদ্যও তিনি আমাদের করিয়া খাওয়াইয়াছেন। অথচ তিনি গরীবের মেয়ে এবং গরীব ব্রাহ্মণেরই স্ত্রী। কিন্তু কি করিয়া এইসব খাদ্য এমন উৎকৃষ্ট প্রস্তুত করিতেন বলিতে পারি না। আমি ঢাকায় মার এই উচ্চ অবস্থা প্রকট হওয়ার পর ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছি, আপনার এরূপ অবস্থা হওয়ায় আমাদের খাওয়া নষ্ট হইল।" মা, এই কথার কিছুদিন পর, আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ হাতে নানারকম রান্না করিয়া খাওয়াইয়াছেন।

ভূদেববাবুর স্ত্রী বলিলেন, "বাজিতপুরে মার রূপের খুব খ্যাতি ছিল। তখন এমন অপরূপ সুন্দরী ছিলেন যে ঘাটে গেলে, যেন ঘাট আলো হইত। তাই অনেকে "রাঙ্গাদিদি" ডাকিতেন।

ছোটবেলা হইতেই দেখা যায়, মাকে সকলেই প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। অথচ বাহিরের দিক হইতে দেখিলে, তাহার বিশেষ কোন কারণ ছিল না। মার অনুপম সৌন্দর্য্য ও আনন্দময়ী মূর্ত্তিই হয়ত ইহার কারণ ছিল। অনেকে মাকে "খুসীর মা" ডাকিত।

৺কাশীতে একবার একটি ঘটনা হয়। মা শুইয়া আছেন, দেখিলেন একটি মূর্ত্তি আসিয়া নির্ম্মলবাবুর স্ত্রীর কাছে সোনা চাহিতেছে। মা (এই সোনা চাওয়ার অর্থ দেশের কথায় ছেলে চাওয়া বলিয়াছেন) তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন এবং যাওয়ার রাস্তা দেখাইয়া দিলেন। পরে মা ঐ রাস্তার খবর নিতে বলিলেন। জানা গেল, ঐ রাস্তায় দুইটি লোক বসন্ত হইয়া মারা গিয়াছে। অথচ সে সময় সহরে বসন্ত ছিল না। মা বলিয়াছেন, রোগের মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখা যায়।

৺কাশীধামের একটি ঘটনা।

মা যে সব ঘটনা দূর হইতেই জানিতে পারেন, সেই সম্বন্ধে ২।১টি কথা:—

শাহবাগে একবার ৺দুর্গাপূজার সময় দাদামহাশয় ও মাখন (শ্রীশ্রী-মায়ের জাগতিক পিতা ও ভ্রাতা) শাহবাগে মার কাছে ছিলেন। দিদিমা বিদ্যাকূটে ছিলেন। মা একদিন মাখনকে বলিতেছেন, "বাবা ও তুই শীঘ্র বাড়ী যা, মা তোদের জন্য খুব ব্যস্ত হইয়াছেন। দেখিলাম, মা তুলসীতলায় বাতি দিতেছেন, মার চোখে জল"। এর পরই মাখন ও দাদামহাশয় বাড়ী চলিয়া যান ও মার এই কথা তাঁহাকে বলেন। তাহাতে দিদিমা বলিলেন, "সত্যই ৺পূজার মধ্যে তোরা না আসায় মনে খুব কষ্ট ও চিন্তা হইতেছিল। তুলসীতলায় বাতি

শ্রীশ্রীমায়ের অন্তর্য্যামিত্ব ও সর্ব্বদর্শিতা।
(১)
বিদ্যাকূটের ঘটনা।

দিতে গিয়া মন খুব খারাপ হওয়ায় একদিন চোখের জল পড়িয়াছিল"।

আর একবার যখন ১৩৪২ সনের অগ্রহায়ণ মাসে ঢাকা যান, তখন মা ঢাকা হইতে আসিবার পূর্ব্বদিন ভিড়ের মধ্যে আশ্রমে বসিয়া আছেন। আমি ও জ্যোতিষদাদা সেই-দিনই চট্টগ্রাম হইতে আসিয়াছি। আমি মাঠে বসিয়া অমূল্যদাদা প্রভৃতির নিকট মার গল্প করিতেছিলাম। এর মধ্যে নগেনদাদা আমাকে ডাকিয়া নিয়া যাওয়ায় মার কথা যাহা বলিতেছিলাম, তাহা শেষ হইল না। আমি চলিয়া যাওয়ায় অমূল্যদাদা প্রভৃতিও উঠিয়া গেলেন।

(২)
ঢাকার ঘটনা।

কিছুক্ষণ পর মার কাছে গেলে মা আমাকে বলিলেন, "তুমি না গল্প করিতেছিলে, শেষ হয় নাই, যাও শেষ করিয়া আস গিয়া"। আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। মা কি করিয়া দেখিলেন, যে আমি মাঠে গল্প করিতেছিলাম এবং তাহা শেষ হয় নাই। অথচ এরূপ ঘটনা নূতন নয়। মার চক্ষুতে যেন কিছুই এড়ায় না, তাহার প্রমাণ অনেক পাইয়াছি। তবুও এই লীলা নিত্যই নূতন বলিয়া মনে হয়। তাই প্রতিবারেই আনন্দ পাই ও আশ্চর্য্য হই। আমি বাহিরে গিয়া দেখি, তখন সেখানে আর কেহ নাই। পরদিন অমূল্যদাদার নিকট এই কথা বলিলাম। অমূল্যদাদা তাই বলেন, "মা আমার অন্তর্য্যামী নন, তিনি যে আবার বিশ্বতঃ-চক্ষু"।

আর একদিন কৃপা ও কর্ম্মফল নিয়া আমাদের মধ্যে কথা হয়। প্রায়ই ইহা নিয়া আমাদের মধ্যে তখন মতদ্বৈধ ও তর্কবিতর্ক হইত। ইহা মার সাক্ষাতেই হইত। কিন্তু সেই সময় একদিন দেখি, যে মা সকলের নিকটে বসিয়া নিজেই কর্ম্মফলের কথা তুলিয়া বলিতেছেন,

"যাহার যেরূপ কর্ম্ম, সে সেইরূপই ফল পায়। ভগবানের কৃপাও কর্ম্মফল অনুযায়ীই আসে।" তখন আমি বলিলাম, "তবে যে কেহ কেহ বলেন, কৃপা ছাড়া কিছুই হয় না। অথচ কৃপা স্বীকার করিলে ত ভগবানের পক্ষপাতিত্ব দোষ বলা হইল ?" মা উত্তরে বলিলেন, "কর্ম্মফলেই সব হয়, একথা বলিতেই হইবে। যার যেমন কর্ম্ম, সে সেইরূপ ফললাভ করিবে। তবে সাধকের এমন একটা অবস্থা আসে, যখন সে ভগবানের কৃপা অনুভব করে। তখনই সে বলে, 'কৃপা ছাড়া কিছুই হইতে পারে না'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাহার নিজ কর্ম্মফলই তাহাকে এই কৃপার অধিকারী করিয়াছে।" আমরা বুঝিলাম, যে মা মনে মনে বুঝিতে পারিয়া আমাদের তর্ক-বিতর্কের অবসান করিতেছেন।

(৩)
'ভগবদ্-কৃপা' ও
'কর্ম্মফল'

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

৺তারাপীঠে আদ্যাপীঠের বিমলা মা ও আনন্দভাই মার কাছে পূর্ব্বে দুইবার আসিয়াছিলেন। ৺আদ্যাপীঠেই মার সহিত তাঁহাদের প্রথম দেখা হয়। শচীবাবু পরে ইঁহাদিগকে নিয়া ৺তারাপীঠে মার কাছে গিয়াছিলেন। কয়েকদিন পর আবার কলিকাতা হইতে শচীবাবু প্রভৃতি অনেকে আসিয়াছেন। মঙ্গলবার কি শনিবার ঠিক মনে নাই, শচীবাবু ৺তারা মার পূজা দিবেন কথা ছিল। কিন্তু হইল না। পরে হইবে কথা হইল। কারণ, শচীবাবু চলিয়া যাইতেছেন। মা অমনি বলিলেন, "তোমরাই বল, কালী, তারা—এঁরা বড় ভয়ঙ্কর দেবতা; যেদিন পূজা দিবে মনস্থ কর, সেদিন পূজা না দেওয়া ঠিক নয়। যদি কোন বিশেষ কারণে না পার, অন্ততঃ মনে মনেও সেদিন কিছু করিতে হয়। এইত দেখ, যেদিন পূজার কথা ছিল, সেদিন পূজা দেওয়া হইল না, আবার ক্ষিতীশ শরীরটা ছাড়িল। আবার দিন স্থির করিলে, তাও হইল না"। এই বলিয়া জ্যোতিষদাদাকে বলিলেন, "কাঁচিটা নিয়া আয় ত। আমার মাথার এক গোছা চুল কাট। সেই চুল এই অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় (মা তখন সিদ্ধাশ্রমের কাছে বড় অশ্বত্থ গাছতলাতেই বসিয়াছিলেন) মাটি খুঁড়িয়া মাটির মধ্যে পুঁতিয়া রাখ"। তাহাই করা হইল। মা বলিলেন, "এখন আমি মরিয়াছি, আমাকে যে যে ছুঁইয়াছ, চল সকলে মিলিয়া 'জীবিত পুষ্করিণীতে' (৺তারাপীঠে জীবিত পুষ্করিণীর অনেক ইতিহাস আছে। বামাক্ষেপার জীবনীতে পাওয়া যায়) স্নান করিয়া জীবিত হই"।

শ্রীশ্রীমায়ের ৺তারাপীঠে পুনশ্চ গমন।

সকলকে নিয়া আর ঘরে গেলেন না, ধোয়া কাপড় পর্য্যন্ত কাহাকেও ছুঁইতে দিলেন না, সকলে মিলিয়া পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া আসিলেন। শচীবাবু কোট, সার্ট পরিয়া কলিকাতা রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন ; তিনিও সব নিয়াই ডুব দিয়া উঠিলেন। যেখানে মার চুল পুঁতিয়া রাখা হইল, স্বামী অখণ্ডানন্দজী সেই স্থানের উপর একটি বেদী প্রস্তুত করাইয়া, মায়ের পায়ের ছাপ সেখানে রাখিয়াছেন। সেখানে রোজ ফুল ও প্রদীপ দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

৺তারাপীঠে মা ভোরে উঠিয়া রোজই প্রায় জ্যোতিষদাদাকে নিয়া মাঠে মাঠে ঘুরিয়া আসিতেন। যেদিন খাওয়ার দিন থাকিত না, সেদিন ত বেলা ৮টা—৯টা হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মাঠে মাঠে ঘুরিতেন, আর মার নাম শুনিয়া, নিকটবর্ত্তী সব গ্রামের লোকেরা দর্শন করিতে আসিত, তাহাতে সর্ব্বদা একটা ভিড় লাগিয়াই থাকিত। যেন প্রত্যেক দিনই মেলা। নূতন নূতন দোকান বসিল ও বেশ চলিতে লাগিল। এই ৺তারাপীঠে মা ও ভোলানাথ আজ প্রায় ৭।৮ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই আসিতেছেন। ভোলানাথের এই স্থানটি খুবই প্রিয়। তাঁহার খুব সুন্দর অবস্থা হইয়াছিল।

প্রথমে এখানে দোকান-পসার কিছুই ছিল না। মা আসার পর হইতে ধীরে ধীরে মন্দিরের, গ্রামের ও পুষ্করিণীর অনেক সংস্কার হইতেছে। এটা অনেক জায়গায়ই দেখা গিয়াছে, মা যাওয়ার পর হইতেই পুরাণ মন্দিরগুলির সংস্কার হইয়াছে। (শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বসু মহাশয় বলিতেন, মার জন্মধারণের এ'ও বোধ হয় এক উদ্দেশ্য। যে বিশেষ বিশেষ স্থান ও মন্দিরগুলি লুপ্ত প্রায় হইয়া গিয়াছে তাহা পুনরায় জাগাইয়া উঠান)। চাষারা বলিত, একবার অনাবৃষ্টির সময় মা আসায় খুব বৃষ্টি হইয়াছিল। এবার মাঠে মাঠে মাকে বেড়াইতে দেখিয়া

তাহাদের মনে খুব আনন্দ হইল। মা মাঠে মাঠে যত দূরই যান, সেখানেই "ঢাকার মাকে" দেখিতে হিন্দু মুসলমানের ভিড় হইয়া পড়ে।

এই সময়ে একদিন চন্দ্রগ্রহণ পড়িল। বহু লোক ৺তারামায়ের দর্শনে আসিয়াছে। কিন্তু সকলের মুখেই শুনা যাইতেছে, "কোন দিন গ্রহণ উপলক্ষে ৺তারাপীঠে এত ভিড় হয় না; আজ ঢাকার মাকে দেখিতেই আমরা এতদূর হইতে সব আসিয়াছি"। দরজা বন্ধ করিয়া রাখা যাইতেছে না। কি যে দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা! শুধু দেখিবে, দূর হইতে একবার দেখিবে, বাহিরে দাঁড়াইয়া সব মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

কোন কোন দিন ওখানে এক গৃহস্থ, মাকে ফুলসাজে কৃষ্ণ সাজাইয়া দিত। হাতে ফুলের বাঁশী, সমস্ত গায়ে ফুলের গহনা; মা'ও বাঁকা হইয়া বসিয়া ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। কোন কোন দিন ফুলের মালা দিয়াই জটা বানাইয়া, মার মাথায় দিয়া রাম সাজাইতেছে, হাতে ফুলের ধনুকবাণ, অপরূপ সে দৃশ্য!

৺তারাপীঠে একদিন মাঘ মাসে রাত্রি প্রায় ১০টায় মা রাস্তা দিয়া হাঁটিতেছেন। হঠাৎ গিয়া 'জীবিত পুষ্করিণীতে' ঝাঁপাইয়া পড়েন। আলোয়ান, গরম জামা সব নিয়াই সাঁতরাইতে লাগিলেন। জ্যোতিষ-দাদা একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন। হঠাৎ শব্দ শুনিয়া গিয়া দেখেন, এই ব্যাপার। একটু পরে মা উঠিয়া আসিয়া আমাকে (আমি সিদ্ধাশ্রমে মার খাবার করিতেছিলাম) বাহির হইতে ভিজা কাপড়ে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছেন, "খুকুনী"। আমি দৌড়াইয়া গেলাম। আমাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিতেছেন, "দেখিলাম, সব জামা কাপড় নিয়া জলে নামিতে কেমন লাগে। আর জল ডাকিতেছে, জলের কাছে যাইতেছি, কিছু ফেলিয়া যাইতে নাই, সব নিয়াই জলকে জড়াইয়া ধরিলাম"।

৺তারাপীঠে কয়েকটি ঘটনা।

এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমরা তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়াইয়া কিছু খাওয়াইলাম। সারা রাত্রি সেদিন স্থির হইলেন না।

৺তারাপীঠে আর একদিন রাত্রি প্রায় ১০টায় সকলকে সিদ্ধাশ্রমে রাখিয়া মা ভোলানাথের কাছে মন্দিরে গেলেন। বলিয়া গেলেন, "যদি আজ রাত্রিতে না আসি, কেহ খুঁজিতে বাহিরে যাইও না। যখন হয় আমি আসিব"। কিন্তু সারারাত্রি মা আর ফিরিলেন না। আমরা বসিয়া মনে করিতেছি, হয়ত মন্দিরেই আছেন। কিন্তু কখনও তাহা থাকেন না, তাই চিন্তা হইতেছে। কিন্তু মার নিষেধ, তাই কেহ খুঁজিতে যাইতে পারিতেছেন না। সকাল বেলা মা আসিয়া উপস্থিত! মার মুখে শুনিলাম, এই অন্ধকার শীতের রাত্রিতে একাই সমস্ত মাঠে মাঠে ঘুরিয়াছেন; পরে মস্‌জিদে গিয়া, ভোর রাত্রে বসিয়াছিলেন; সকাল বেলা উঠিয়া আসিলেন। কেন এইরূপ করেন, কেহই কারণ জানে না।

৺তারাপীঠে থাকাকালীন আর একটা ঘটনা ঘটিয়াছে। মানিক বলিয়া একটি ছেলে মার খুব ভক্ত। সে ৺কাশীতে চাকুরি করে। ৺তারাপীঠে যখন নানা গ্রাম হইতে বহু স্ত্রী-পুরুষ মাকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিলেন, তার মধ্যে একটি মেয়েকে দেখিয়া মা আমাদের বলিতেছেন, "দেখ, এই মেয়েটির চেহারা অনেকটা মানিকের মার মত নয়"? এই কথার পর সন্ধ্যাবেলা বেড়াইতে গিয়া এক জায়গায় বসিয়া আবার বলিতেছেন, "মানিক যদি আজ আসিত, ঐ মেয়েটিকে মানিকের মা করিয়া দিতাম"। কালই মেয়েটির চলিয়া যাওয়ার কথা। মানিকের আসিবার কোনই কথা নাই। সেই দিনই শেষরাত্রিতে দেখি মানিক আসিয়া হঠাৎ উপস্থিত। সকলেই এই ব্যাপারে আশ্চর্য্য হইল। মানিকের মা কিছুদিন হয় মারা গিয়াছেন।

কোন কোন সময়ে মা সকলকে ডাকিয়া, কাহাকেও "মা" বলিয়া, কাহাকেও খাইতে দিয়া, কাহারও শিশুসন্তানের নূতন নাম রাখিয়া আনন্দ করিতেন। হঠাৎ একদিন একটি ছেলের পৈতার দিন দেখা হইবে; মা বলিতেছেন, "আমাদের জন্যও একটা পৈতার দিন দেখ"। তারপর আবার বলিতেছেন, "একটা বিবাহের দিনও দেখ"। যতীন্দ্র পাণ্ডা মহাশয় দিন দেখিলেন। আবার শুনিলাম, ৺তারা মায়ের মন্দিরের সম্মুখে একটী যজ্ঞকুণ্ড তৈরী হইবে এবং তাহাতে যজ্ঞ আরম্ভ হইবে। ইং ১৯৩৫ বাং ১৩৪২ সন পৌষ সংক্রান্তির দিন হইতে যজ্ঞ আরম্ভ হইবে। মার আদেশ মত সব ঠিক হইতেছে। মার কাজে সব বন্দোবস্ত আশ্চর্য্যভাবে ঠিকই হইয়া যায়। ইতিমধ্যে ভোলানাথ একবার কলিকাতা যাইয়া কীর্ত্তনাদি করিয়া গুহ-পরিবারকে কিছু সান্ত্বনা দিয়া আসিয়াছেন। আসিয়াই তিনি আবার কলিকাতার ভক্তদের নিয়া ৺গঙ্গাসাগর স্নানে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে বিরাজমোহিনী দিদি ও অখণ্ডানন্দ স্বামীজীকে নিয়া গেলেন। জ্যোতিষদাদার বাড়ী হইতে কি এক চিঠি আসিয়াছে, যে তাঁর একবার বাড়ীতে যাওয়া দরকার। মা বলিতেছেন, "আজই তোর যাইতে হইবে, আর তোর একবার ৺পুরী যাওয়ার ইচ্ছা মনে ভাসিয়াছিল, সব শেষ করিয়া আয়"। জ্যোতিষদাদা বলিলেন, "অখণ্ডানন্দস্বামী, ভোলানাথ, কেহ এখানে নাই; শীঘ্রই যজ্ঞ আরম্ভ হইবে, এখন যাইব না"। কিন্তু কে শোনে? মা বলিলেন, "কিছু ঠেকিবে না, সব হইয়া যাইবে"।

৺তারাপীঠে যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মাণ এবং তাহাতে যজ্ঞারম্ভ (১৩৪২, পৌষ সংক্রান্তি)।

রাত্রিতে জ্যোতিষদাদাকে ও সঙ্গে যতীন্দ্র পাণ্ডা মহাশয়ের ছেলে শ্যামকে পাঠাইয়া দিলেন। মার কাজ কিছু ঠেকে না, ঠিক সময় যজ্ঞ

আরম্ভ হইল। এখানে মার হাতে যে ফুলের বাঁশী দিয়া একদিন মাকে কৃষ্ণ সাজান হইয়াছিল, সেই বাঁশী মা ৺পুরীতে ৺জগন্নাথদেবের হাতে দিয়া পুনরায় ফিরাইয়া নিয়া আসিতে বলিয়া জ্যোতিষদাদার হাতে দিয়া দিলেন।

তখন শুনিলাম এখানেই মরণীর ও আমার উপনয়ন এবং মরণীর বিবাহ হইবে। মা যজ্ঞকুণ্ডের সম্মুখেই একটী পাকা কোঠা ছোট করিয়া তুলিতে আদেশ দিলেন। বলিলেন, "পৈতা হইলে তোমরা থাকিতে পারিবে"। তখনই মিস্ত্রিরা আসিয়া কাজ সুরু করিল। মার যেন সবই অদ্ভুত। যে কাজ করিবেন, দেরী হইতে পারিবে না। বেশী পূর্ব্বেও কিছু বলিবেন না। উপস্থিত মত সব ব্যবস্থা। আশ্চর্য্যের বিষয়, সব হইয়াও যায়, ঠিক ঠিক। কিছু হয়ত ঠিক নাই, কিন্তু দেখ, উপস্থিত মত মার কাজের সময় সব হাজির। অনেকবার এই ঘটনা দেখিয়াছি। যজ্ঞ নির্দ্দিষ্ট দিনে আরম্ভ করাইলেন এবং দেখিতে দেখিতে পাকা কোঠাটীও নির্ম্মিত হইয়া গেল। পূর্ব্বের বন্দোবস্ত ছাড়াও মার কাজ যে ঠিক মত হইয়া যায় মরণীর বিবাহের সময়ও তাহা দেখিলাম। একে শ্মশানের মধ্যে, ৺তারামায়ের মন্দিরে বিবাহ, কয়েক ঘর পাণ্ডা ছাড়া আর কেহ নাই। বিবাহ হইবে, কিন্তু স্ত্রী-আচার করিবার মত আমাদের মধ্যে কেহই নাই। আত্মীয় কুটম্ব যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ বিধবা, কেহ বৃদ্ধা ইত্যাদি। বিবাহের পূর্ব্বদিন বিক্রমপুরেরই দুইটী সধবা স্ত্রীলোক আকস্মিকভাবে আসিয়া উপস্থিত। আমাদের সহিত তাঁহাদের আত্মীয়তা আছে বটে, কিন্তু মার কাছে কখনও তাঁহারা পূর্ব্বে আসেন নাই। আর আমরাও নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াই; তাই আমাদের সঙ্গেও তাঁহাদের বহুদিন সাক্ষাৎ নাই। সেই সময়ে তাঁহারা ৺তারাপীঠে গিয়া হঠাৎ উপস্থিত। ৺তারাপীঠে তাঁহারা এই প্রথম আসিলেন।

মরণীকে তাঁহারা কখনও দেখেন নাই। কিন্তু মরণীর বিবাহে তাঁহারা দুই বোনই সমস্ত স্ত্রী-আচার করিলেন। মরণীরা ও তাঁহারা এক দেশের লোক হওয়ায় লৌকিক আচারাদি সবই তাঁহাদের জানা আছে। এমন ভাবে তাঁহারা কাজ করিতেছিলেন যেন নিজেদের বাড়ীর বিবাহের কাজই করিতে আসিয়াছেন। একদিন থাকিয়াই তাঁহারা চলিয়া যাইবেন, কথা ছিল। কিন্তু বিবাহের সব কাজ করিয়া মেয়ে জামাতার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা বিদায় নিলেন, যেন এ কাজ করিতেই আসিয়াছিলেন!

মাকেও একদিন রান্না করিয়া খাওয়াইয়া গেলেন। মা হাসিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমাদের বিবাহে স্ত্রী-আচার করিবার লোক ছিল না। ঠিক সময় মায়েরা আসিয়া উপস্থিত।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। মরণী ত আশ্রমেই প্রতিপালিত, তার বিবাহের কাজও অপরিচিতারা আসিয়া করিয়া দিয়া গেলেন! মার কাজ এইভাবেই সব হইয়া যায়। কোন অংশই অপূর্ণ থাকে না।

কয়েকদিন পর ভোলানাথ ৺গঙ্গাসাগরে স্নান কারয়া ফিরিয়া আসিলেন। বাবাকে পৈতার জিনিষপত্র কিনিবার জন্য কলিকাতায় রাখিয়া আসিলেন। জ্যোতিষদাদাও কয়েকদিন পর আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

৺তারাপীঠের মাঠে চড়াইভাতি।

পৈতার কয়েক দিন পূর্ব্বেই মা একদিন মাঠে গিয়া চড়াইভাতি খাইলেন। গরীব দেশ; বহুলোক প্রসাদ পাইল। বীরেন মহারাজ ও অন্যান্য কয়েকটি ছেলে ভিক্ষা করিয়া অনেক জিনিষ আনিয়াছে। খাওয়ার পরই খুব বৃষ্টি হইল—এত যে সিদ্ধাশ্রমে থাকা যায় না। মা মাঠ হইতে আসিয়াই ৺শিব মন্দিরে স্থান নিলেন। আমি ও ভ্রমর মার সঙ্গে ৺শিব মন্দিরে থাকিলাম। দুই একদিন পরই

জ্যোতিষদাদার হঠাৎ বুকে শ্বাসকষ্ট হইয়া প্রাণ যায় যায় অবস্থা, মার কৃপায় রক্ষা পাইলেন। অনেকদিন শয্যাগত ছিলেন।

মরণী—ভোলানাথের দত্তক কন্যা।

মরণীকে ভোলানাথ "দত্তক কন্যা"রূপে গ্রহণ করিলেন। কারণ, মরণীর জন্মদাতা পিতা ও গর্ভধারিণী মা এবং মরণীকে যাহার সহিত বিবাহ দিবেন বলিয়া শ্রীশ্রীমা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন (কুলদা দাদার ছেলে) তাহারা এক গোত্র। পূর্ব্বেও একথা উঠিয়াছিল। কিন্তু মা বলেন, "যার সঙ্গে যার নির্দ্দিষ্ট আছে, তা হবেই"। কাজেই ভোলানাথ "দত্তক কন্যা" রূপে গ্রহণ করিয়া দান করিবেন, ইহাই স্থির হইল। কেন না, তাহা হইলে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে স্বগোত্রভাব থাকিবে না।

এই কাজ উপলক্ষে মরণীর পিতা, ঠাকুরমা, মটরী পিসীমা, ঢাকুরিয়া হইতে পিসামহাশয় (কালীপ্রসন্ন কুশারী মহাশয়), পিসীমা, দাদামহাশয়, দিদিমা, মাখন প্রভৃতি সব উপস্থিত হইয়াছেন। ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত। বহুদিন পূর্ব্বে পিসীমার সহিত "উমামহেশ্বরের ব্রতের" কথা মার হইয়াছিল। এখানে সেই ব্রত পিসীমা করিলেন। ভোলানাথ ব্রত করাইলেন। বিরাট ব্রত, ব্রতে আনন্দও খুব হইল।

আমার ও মরণীর উপনয়ন।

প্রথমে একটি ভক্তের ছেলের পৈতা হইল। পরে ১৯শে মাঘ আমার ও মরণীর পৈতা হইল। ভোলানাথ মরণীর এবং শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার আচার্য্য গুরু হইলেন। মেয়েদের পৈতা কেহ বড় দেখে নাই। আজ অনেক বৎসর হইতেই মার এই খেয়াল চলিতেছিল আজ তাহা পূর্ণ করিলেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র 'পঞ্চু' ও কন্যা 'নন্দী' মাকে

দর্শন করিতে ৺তারাপীঠে উপস্থিত ছিল। পৈতার পর পঞ্চু মায়ের ও আমাদের চলচ্চিত্র উঠাইয়াছিল। চিত্র সুন্দর উঠিয়াছিল।

২৪শে মাঘ মরণীর বিবাহ হইল। পাত্র তুইদিন পূর্ব্বেই পৌঁছিয়াছিল। সেও আশ্রমের ছেলের মতই; কাজেই খুবই আনন্দের বিবাহ। ভোলানাথ কন্যা দান করিলেন। বিবাহের সময় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সব লোক একত্র হওয়ায় বহু লোকের সমাবেশ হইয়াছিল।

মরণীর বিবাহ।
(১৩৪২।২৪শে মাঘ)

মরণীকে ভোলানাথ খুবই স্নেহ করিতেন। কাজেই দান করিয়াই কাঁদিতেছেন। বিবাহের পর দিনই রাত্রিতে কন্যা জামাতা সহ আত্মীয় স্বজনেরা প্রায় সকলেই চলিয়া গেলেন। ফুলশয্যা, কলিকাতা পিসামহাশয়ের বাসায় হইবে, স্থির হইয়াছে। ২৫শে মাঘ তাহারা চলিয়া গেল। প্রত্যহ হোম করিবার আদেশ দিয়া, কন্যা জামাতার সহিত এখানকার যজ্ঞের অগ্নি দিয়া দেওয়া হইল।

এখানে মা যে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞের মধ্যেই উপনয়নের কার্য্যাদি হইল। আর আমাকে পৈতার পর বলিলেন, "এই পৈতা যে দেওয়া হইল ইহা খেলার কথা নয়, তোমার আদর্শ ব্রহ্মচারিণী হওয়া চাই। মরণীর ত বিবাহ দেওয়া হইল। তুমি খাওয়া-দাওয়া সবই পৈতার সময় যেমন করিতেছ, এইরূপই করিবে"। (অনেক দিন পর্য্যন্ত আমাকে নুন, চিনি পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন)।

২৬শে মাঘ রাত্রিতেই প্রায় ১৫।২০ খানা গরুর গাড়ী ভরা ভক্তগণ সহ মা ৺তারাপীঠ ছাড়িলেন। জ্যোৎস্না রাত্রি; গ্রামের নির্জ্জন রাস্তা। এই গভীর রাত্রে মার সঙ্গে ভক্তদের যাত্রা বড়ই সুন্দর।

শ্রীশ্রীমায়ের ৺তারাপীঠ ত্যাগ (১৩৪২।২৬ মাঘ)

তার মধ্যে হারমোনিয়াম নিয়া গরুর গাড়ীর মধ্যে ভ্রমর নাম কীর্ত্তন

আরম্ভ করিল। মার সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া ভক্তদের মধুর নাম কীর্ত্তন চলিতেছে। সকলেই আনন্দে বিভোর হইয়া নাম করিতেছেন। আমরা রামপুরহাট ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। রাত্রি প্রায় ২টায় গাড়ী। কথা হইয়াছে যে শ্রীরামপুর যাওয়া হইবে।

———

ষড়বিংশ অধ্যায়

পর দিন সকালে শ্রীরামপুর পৌঁছিলাম। ভক্তেরা সকলে আমাকে গৌরাঙ্গের মন্দিরে নিয়া গেলেন। তথায়ই মার থাকিবার স্থান দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে গোবর্দ্ধন গোঁসাইদের বাড়ীতেই থাকার বন্দোবস্ত হইয়াছিল (ইহারাই মার পুরান ভক্ত)। মা ঘরে যান না, তাই গৌরাঙ্গের মন্দিরে মাকে আনা হইল। এখানকার গোব ন-গোঁসাই, সুচারুবাবু, ত্রিগুণাবাবু প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সর্ব্বদাই মার সেবায় তৎপর ছিলেন। এখানেও ভোলানাথের কাছে কয়েকজন দীক্ষিত হইলেন।

শ্রীরামপুরে গৌরাঙ্গ-মন্দিরে মা।

পর দিন আমরা ৺নবদ্বীপ রওনা হইলাম। এখানে ডাক্তার গিরীনবাবুর ভাইপোর সহিত মার ভাই মাখনের বন্ধুত্ব পাতান হইল। গিরীনবাবুর ভাইপো মার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। ৺নবদ্বীপে শচীবাবুর অনেক আত্মীয়াদের সঙ্গে নিয়া গেলেন। ৺নবদ্বীপে মা আসিবার দিন সকলকে নিয়া গঙ্গায় স্নান করিলেন। শচীবাবুর বিধবা বোনের খুব সুন্দর চুল; এত লম্বা চুল বড় দেখা যায় না। মা স্নান করিয়া উঠিয়া সেই চুল নিজের গলায় জড়াইয়া বলিলেন, "এখন আমার কাশি কমিয়া যাইবে। এই আমার গরম কাপড়"। শচীবাবুকে ঐ চুল এক গোছা কাটিয়া ঘরে বাঁধাইয়া রাখিতে বলিয়া দিলেন।

৺নবদ্বীপে শ্রীশ্রীমা।

মা নবদ্বীপ হইতে শ্রীযুক্ত অবনী নাথ মহাশয়ের কাতর আহ্বানে

বহরমপুর গেলেন। আমরাও সঙ্গে গেলাম। বহরমপুর থাকাকালীন মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে বেড়াইয়া আসা হইল। বহরমপুর ৫।৭ দিন থাকিয়া টাটানগর ও জামসেদপুর যাওয়া হইল। সেখানেও মাকে পাইবার জন্য ৩।৪ বৎসর যাবৎ সেখানকার ভক্তগণ কতই না অনুরোধ করিতেছিলেন। কয়েকজন ৺তারাপীঠেও মাকে আনিতে গিয়াছিলেন। সেখানকার ৺কালীবাড়ীতে মার থাকার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ভক্তেরা প্রায় অনেকেই ঘর ছাড়িয়া সেখানেই বেশী সময় কাটাইতেছিলেন। কীর্ত্তনাদিতে খুব আনন্দ চলিতেছে। মার সঙ্গে প্রায় ৮।৯ জন লোক। সেখানকার ভক্তেরা যথাসাধ্য আদর যত্ন করিতেছেন। এখানেও প্রায় ১৯।২০ জন ভোলানাথের কাছে দীক্ষিত হইলেন।

বহরমপুর এবং টাটানগরে শ্রীশ্রীমা

টাটানগরে ৫।৭ দিন থাকিয়া মা সকলকে নিয়া ৺বিন্ধ্যাচল রওনা হইলেন। পথে হাওড়া ষ্টেশনে ২।১ ঘণ্টা ছিলেন। ষ্টেশনে ভক্তেরা মার খাবার নিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কত আগ্রহে তাঁহারা মাকে খাওয়াইতেছেন; ভোলানাথকে খাওয়াইতেছেন, ভক্তদের খাইতে দিতেছেন। সকলে অনুরোধ করিতেছেন, "২।১ দিন কলিকাতায় থাকিয়া যাও।" মা হাসি মুখে সকলকে বলিতেছেন, "এখন আর হইবে না।" যতীশ গুহদের বাড়ীতে বিপদ হইয়া যাইবার পর, আর মার সঙ্গে যতীশদাদার দেখা হয় নাই। কতকটা সংসারের ঝঞ্ঝাটে বিব্রত হইয়া এবং কতকটা অভিমানে, তিনি আর মার কাছে যান নাই। আজ ষ্টেশনে তিনি এখনও আসেন নাই। তাঁহার মা, ৺ক্ষিতীশদাদার স্ত্রী, যতীশদাদার স্ত্রী এবং বাটীর মেয়েরা সব আসিয়াছেন। মা তাঁহাদের সান্ত্বনা বাক্য বলিতেছেন। কিন্তু এত ভীড়, যে বেশী কিছু বলিবারও উপায় নাই।

প্রাণকুমারবাবুও সপরিবারে আসিয়াছেন। কলিকাতার সব ভক্তরাই প্রায় আসিয়াছেন, শুধু যতীশদাদা তখনও আসেন নাই।

গাড়ী ছাড়িবার কিছু পূর্ব্বে যতীশদাদা হঠাৎ আসিয়া বলিলেন, "ক্ষিতীশের ছেলেদের পরীক্ষায় পাঠাইয়া আসিলাম, আর ত কেহ বাসায় নাই"। মার উপর বেশ অভিমান। গম্ভীর ভাবে একবার প্রণাম করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া আছেন। এর মধ্যে মা চারদিকে চাহিয়া বলিলেন, "যতীশ কই? তাহাকে ডাক।" আমি ডাকিয়া দিলাম। মা বলিলেন, "জ্যোতিষ (রায়) কিন্তু তোমার বন্ধু। তার কাছে সর্ব্বদা চিঠি দিও।" এই আদরে তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। ছুটিয়া আসিয়া মার চরণে মাথা লুটাইয়া দিলেন। ঝর্ ঝর্ করিয়া চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সমস্ত অভিমান যেন চোখের জলে ধুইয়া ভাসিয়া কোথায় চলিয়া গেল। মা মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন। তখনই গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। সকলে নামিয়া পড়িলেন। সকলেই কাঁদিতেছেন, ভাবিতেছেন, আবার কবে মাকে দেখিব। মার মুখের দিকে সকলে চাহিয়া আছেন। কি ব্যাকুলতাই না সে সব দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। মা'ও সকলের দিকে চাহিতেছেন; করুণা ভরা সে দৃষ্টি!

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। মা শুইয়া পড়িলেন। এতগুলি ভক্তের কাতর ক্রন্দনে মার বুকেও আঘাত করিল কিনা, কে জানে! বাহিরে তিনি ধীর, স্থির; কঠিন ও কোমলের একত্র সমাবেশ; অপূর্ব্ব দৃশ্য! এমন আর কোথাও দেখি নাই। অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "মা আমরা তোমাকে এত ভালবাসি, আর তুমি একটুও ভালবাস না নাকি?" মা হাসিয়া উত্তর দিয়াছেন, "আমি ভালবাসি

৺বিন্ধ্যাচল আগমন।

বলিয়াই ত তোমরা ভালবাস। আর আমি যত ভালবাসি, তোমরা যে আমাকে তার এক কণাও ভালবাস না, তা' ত তোমরা বোঝ না।"

আমরা ৺বিন্ধ্যাচল আসিবার সময় বেতিয়ার গিরীনবাবু ডাক্তারের বাড়ী হইয়া আসিলাম। সেখানেও তিনি একটা মন্দিরের সামনে তাঁবু টাঙ্গাইয়া মার থাকিবার জায়গা করিয়াছিলেন। আমরা ২ দিন তথায় ছিলাম।

৺বিন্ধ্যাচল বাসের কথা।

৺বিন্ধ্যাচলে আসিয়া এবার কয়েকদিন মা ছিলেন। প্রায় প্রত্যহই ভোর বেলা মা পাহাড়ে বেড়াইতে বাহির হইতেন। খাওয়ার দিন বেড়াইয়া আসিয়া কিছু খাইতেন। না হইলে, উপরের ঘরে শুইয়া থাকিতেন, কি বসিয়া ভক্তদের সঙ্গে নানা কথা বলিতেন। এখন মার সঙ্গে ভোলানাথ, আমি, অখণ্ডানন্দজী, জ্যোতিষদাদা, শঙ্করানন্দ, ভ্রমর, বিরাজমোহিনী দিদি ও মাসীমা (মার মাতুল ভগ্নী) আছে। দেরাদুন হইতে চিঠি আসিতেছে তথায় যাইবার জন্য। তাঁহারা মার জন্য আশ্রম তৈয়ার করিয়াছেন, মা পৌঁছিলে প্রতিষ্ঠা হইবে।

৺বিন্ধ্যাচল আশ্রমে যজ্ঞশালা প্রতিষ্ঠা। (১৩৪২, ফাল্গুন; দোলপূর্ণিমার দিন)

আজ প্রায় ১॥ বৎসর যাবৎ মার আদেশে স্বামী অখণ্ডানন্দজী ৺বিন্ধ্যাচলে এক যজ্ঞশালা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। ভিতরে মার নির্দ্দেশ মতই বৃহৎ কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এতদিন তাহা বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, কারণ মা বলিয়াছিলেন, "তোমার এই কাজ বাকি, তুমি যজ্ঞশালা তৈয়ার করিয়া রাখ, যখন যজ্ঞ আরম্ভ হইবার হয় হইবে"। তাহাই করা হইয়াছে। এখন মা সেই যজ্ঞের আয়োজন করিতে

বলিতেছেন। ৺কাশী হইতে ৮।১০ জন পণ্ডিত আনান হইল। গায়ত্রী মন্ত্রে একলক্ষ আহুতি হইবে। ৺তারাপীঠ হইতে উপনয়নের যজ্ঞের অগ্নি টেলিগ্রাম করিয়া জটুকে দিয়া আনান হইল। সেই অগ্নিই এখানে স্থাপন করা হইল। ইং ১৯৩৬ সন বাং ১৩৪২ সনের ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমার দিন ৺বিন্ধ্যাচলে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। পরে ভোলানাথ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ মিলিয়া ৫ দিন ব্যাপী হোম করিলেন। আহুতির সঙ্গে সঙ্গে গায়ত্রী জপের জন্য মা ভক্তদেরও নিযুক্ত করিলেন। ডাক্তার উপেনবাবু, নেপাল দাদা প্রভৃতি এই কাজের ভার নিলেন। লক্ষ আহুতি পূর্ণ হইল। অগ্নি রক্ষার ব্যবস্থা করা হইল। একজন ব্রাহ্মণকে ৺কাশী হইতে আনান হইল। তিনি গৃহত্যাগী, ব্রহ্মচারীর মত থাকেন। তাঁহাকেই অগ্নি রক্ষার ভার দেওয়া হইল। তাঁহার নাম অনঙ্গমোহন ভট্টাচার্য্য। প্রত্যহ আহুতি দেওয়ার বন্দোবস্ত হইল।

৺বিন্ধ্যাচল আশ্রমে এইরূপে যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ হইবার কালে, শ্রীশ্রীমা একদিন উক্ত আশ্রমের ছাদের সংলগ্ন চিলের কোঠায় বসিয়া, নিম্নলিখিত সংগীতটি স্বতঃই রচনা করিতে করিতে তাঁহার স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে, আপনার খেয়ালে আপনা আপনি গাহিয়াছেন। যাঁহাদের শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাঁহারা পুলকিত, বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গানটি এই ঃ—

শ্রীশ্রীমায়ের স্বরচিত সংগীত ঃ

"জীবের ভাগ্যে, অবৈরাগ্যে, পরম পদ মিলবে নারে।
(তাই) কর সার এক, বৈরাগ্য বিবেক, পরিহরি বাসনারে ॥
বৈরাগ্যের মাত্রা কত,
বুঝবি কাজে হ'লে রত,
তখন দেখ্‌বি অবিরত,
কোন্ দিকে তোর মন টানেরে ॥

সঁপে' তাঁরে সব কর্ম্ম,
আচর মানব-ধর্ম্ম,
(তুমি) নিত্য নির্ব্বিকার ব্রহ্ম,
চিন্ত চিত্তে বারে বারে ॥

বাহির হ'তে ডাকি মন,
হৃদে রাখ অনুক্ষণ,
(করি) ব্রহ্মভেলায় আরোহণ,
তরহ ভব সাগরে ॥

হ'লে অহঙ্কার হত,
সব দ্বন্দ্ব নিবারিত,
(দেখবি) স্বভাব হবে স্থিত,
জ্ঞেয় সত্য পরাৎপরে ॥

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত আশ্রমের নিকটেই বাড়ী করিয়া আছেন। তিনি মার কাছে আসিতেন। মা তাঁকেও এক বৎসর কি নিয়ম পালনের কথা বলিয়া দিলেন ; এবং ৺বিন্ধ্যাচলে তাঁর বাড়ীর সামনে একটী পঞ্চবটী তৈয়ার করিয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ একটু সময় পঞ্চবটীতে বসিতে আদেশ দিয়া গেলেন। মির্জ্জাপুর হইতে অনেক লোক আসিতেছেন। অভয়বাবু, গোপালবাবু প্রভৃতি কয়েকজন সপরিবারে ভোলানাথের কাছে এখানে দীক্ষিত হইলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের নিকট শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ক্ষেত্রবাবু বলিয়া এক ভদ্রলোক গেরুয়া পরিয়া এখানে আসিয়াছেন।

সংসারের গণ্ডগোলে বৈরাগ্য হওয়ায়, গেরুয়া পরিয়াছেন। মা তাঁহাকে বলিলেন, "গেরুয়া পরা খেলা নয়। তোমার মনের যে অবস্থা, তাহাতে গেরুয়া ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ কাপড় পড়াই ভাল। বেশ ত, ভাল ভাবে থাক; কাজ কর, পরে যাহা হয়, হইবে।" তাহাই হইল। তিনি গেরুয়া ছাড়িয়া সাদা কাপড় পড়িলেন ও ভোলানাথের কাছে দীক্ষা নিলেন। পরে ক্ষেত্রবাবুর নিজেরই বাড়ীর জন্য মন ব্যাকুল হওয়ায়, সংসারে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া মা হাসিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ, গত বারই আমি উহাকে গেরুয়া ছাড়াইয়া দিয়া গিয়াছিলাম। সকলে গেরুয়া ধরায় আর আমি গেরুয়া ছাড়াই।"

ক্ষেত্রবাবু এই আশ্রমেই থাকিবেন, ঠিক হইল। ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবন যাপন করিতে চেষ্টা করিবেন। প্রয়োজন হইলে, যিনি অগ্নিরক্ষা করিতেন—তিনি মৌনী—তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ, ক্ষেত্রবাবু ও যিনি যজ্ঞরক্ষার ভার নিয়াছেন (অনঙ্গ মোহন ভট্টাচার্য্য) এই তিনজনকে আশ্রমে রাখিয়া, মা ও ভোলানাথ আমাদের নিয়া ৺চিত্রকূট রওনা হইলেন। ভ্রমর এখান হইতেই কলিকাতা চলিয়া গেল। ৺বিন্ধ্যাচলেই কলিকাতা হইতে শচীনবাবুর ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি আসিয়া ভোলানাথের কাছে দীক্ষা নিলেন। বিন্ধ্যাচলেই একদিনের জন্য যতীশ গুহ, শচীবাবু, প্রাণকুমারবাবু প্রভৃতি আসিয়া মার সহিত দেখা করিয়া গেলেন। আমাদের সঙ্গে মির্জ্জাপুর হইতে কুলদাবাবু ও শ্রদ্ধানন্দ স্বামী ৺চিত্রকূট চলিলেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

কয়েকদিন পর হঠাৎ ভোলানাথের পেটে ভয়ানক বেদনা হইল। তাঁহার শরীর খুব অসুস্থ হইয়া পড়িল। ডাক্তার ভার্গব মায়ের একজন ভক্ত। হরিরাম গিয়া ভার্গববাবু, সারদা প্রভৃতিকে নিয়া আসিল। সারারাত্রি বেদনায় ভয়ানক কষ্ট পাইলেন। সকাল বেলা একটু কম; কিন্তু ভোলানাথ শয্যাগত। মা ছাদে হাঁটিতেছেন, কখনও রোগীর ঘরে গিয়া বসিতেছেন। পর দিন ভোলানাথকে নীচের একটি ঘরে আনা হইল।

দেরাদুন ত্যাগ ও সোলন যাত্রা।

ত্রিগুণাবাবু, মাণিক, শ্রদ্ধানন্দ প্রভৃতি ভক্তেরা বিদায় লইলেন। শঙ্করানন্দ স্বামী ৺বদ্রীনারায়ণ চলিলেন। এইবার লইয়া এই তৃতীয় বার তিনি তথায় যাইতেছেন।

২।৩ দিন পর ভোলানাথের বেদনা একটু কমিয়াছে; কিন্তু তিনি এখনও শয্যাগত। মা সকালবেলা দরজা বন্ধ করিয়া ভোলানাথের সহিত কি কথা বলিলেন। আবার ১১টা কি ১২টার সময় (দুপুর বেলা) দরজা বন্ধ করিয়া কি কথা বলিলেন। কিছুক্ষণ পর জ্যোতিষ দাদাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পরে মা বাহির হইয়া আসিয়াছেন। আমরা শুনিলাম, মা সেইদিন ৭টার ট্রেণে (সন্ধ্যায়) সোলন যাইতেছেন। সঙ্গে ভ্রমর, আমি, নেপাল দাদা যাইতেছি। অপরাপর সকলকে বলিতেছেন, "ভোলানাথ ভাল হইলে তোমরা তাঁহাকে নিয়া সোলন যাইও।" পরে শুনিলাম, কবে ভাল হইয়া যাইতে পারিবেন, তাও মা ভোলানাথকে বলিয়া গিয়াছিলেন।

পরে পরিচয়ে জানা গেল, তিনি কক্সবাজারের দীনবন্ধুবাবুদের আত্মীয়। ৺বৃন্দাবনে সাধুদের আশ্রম অনেক আছে। মাকে নিয়া ভক্তেরা সাধুদের আশ্রমে বেড়াইতে গেলেন। ৺বৃন্দাবন হইতে আমরা মার সঙ্গে জয়পুর গেলাম। তথায় ৺গোবিন্দজীর মন্দির ও অন্যান্য স্থান দেখা হইল। একদিন তথায় থাকিয়া আমরা দিল্লী রওনা হইলাম।

দিল্লী গমন।

দিল্লীতেও মার অনেক ভক্ত আছেন। একটি কাশ্মীরী বৃদ্ধা মহিলা কলিকাতা হইতে আসিয়া ৺তারাপীঠ হইতেই মার সঙ্গ নিয়াছেন এবং মার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন। আমরা সকলে তাঁকে 'নানী' বলিয়া ডাকি। মার সহিত পূর্ব্বে দেরাদুনে এঁর পরিচয় হইয়াছিল। ইনি দেরাদুনের উকিল শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রয়না মহাশয়ের পিতামহী। দিল্লীতে তাঁর ছেলের বড় দোকান আছে। তিনিই দিল্লীর সব বন্দোবস্ত করিলেন। দুই দিন দিল্লীতে থাকিয়া আমরা দেরাদুন রওনা হইলাম।

দেরাদুনে অবস্থান।

দেরাদুনের ভক্তেরা (শ্রীযুক্ত হরিরাম যোশী, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রয়না প্রভৃতি) ষ্টেশন হইতেই মাকে কৃষ্ণাশ্রমে নিয়া গেলেন। এক ভদ্রলোক তাঁহার গুরুর জন্য এই স্থানটি তৈয়ার করিয়াছিলেন। মা দেরাদুন থাকাকালীন মধ্যে মধ্যে আসিয়া এখানে থাকিতেন। কিছুদিন মা কৃষ্ণাশ্রমে রহিলেন। দেরাদুনের সব ভক্তেরাই ধীরে ধীরে আসিতেছেন। মার পুরাতন ভক্ত শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মিত্র মহাশয় মার আদেশে দেরাদুন যান। মা তাঁহাকে দেরাদুনের সন্নিকট রায়পুরে রাখিয়াছিলেন। নীচে নামিবার সময় তিনিও মার সঙ্গেই আসিয়াছিলেন।

এতদিন তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। ৺বিন্ধ্যাচলে মাসীমার* অসুখ হওয়ায় মা নিশিবাবু ও বিরাজমোহিনী দিদিকে মাসীমার কাছে রাখিয়া গিয়াছেন এবং বলিয়াছিলেন, মাসীমা ভাল হইলে তাঁহাকে ৺কাশী ৺বিশ্বনাথ দর্শন করাইয়া যেন তাঁহারা রায়পুর † (দেরাদুনে) গিয়া থাকেন। মা দেরাদুনে আসিয়াছেন খবর পাইয়া, তাঁহারাও কৃষ্ণাশ্রমে আসিয়া মার সহিত দেখা করিয়া গেলেন। অন্যান্য রায়পুরস্থ ভক্তেরা, স্বামী অসীমানন্দ প্রভৃতি সকলেই আসিয়াছেন। কিছুদিন মা শান্তভাবেই ছিলেন।

কয়েকদিন পরই মা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় অনেকে মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। হঠাৎ মা ভোলানাথকে গিয়া বলিলেন, তিনি এখনই রায়পুর যাইবেন। রায়পুর, দেরাদুন হইতে ৬।৭ মাইল দূরে। সঙ্গে ভোলানাথ, জ্যোতিষদাদা কি আমরা কেহই যাইতে পারিব না। মা আজ রাত্রে সেখানেই থাকিবেন। কাল সকালবেলা আবার ফিরিয়া আসিবেন। মা বলেন, তা করিবেনই।

---

* মার মাতুল ভগ্নী; ইনি সংসার ছাড়িয়া মার সঙ্গেই আসিয়াছেন। শিশুকালে বিধবা হইয়াছিলেন। মা ৺বিন্ধ্যাচলেই নিশিবাবু, বিরাজ-মোহিনী দিদি ও মাসীমা, নানী, জটু ও কাশীর নির্ম্মলবাবুর স্ত্রীকে মাথা মুড়াইয়া পীতবস্ত্র পড়িতে দিয়াছিলেন।

† মা ঢাকা হইতে বাহির হইয়া ১০ মাস এই রায়পুরেই ছিলেন। ভোলানাথ এখানে বসিয়া কাজ করিতেন। এখানকার শিবমন্দিরে মা থাকিতেন। এখানে সকলেই মা ও ভোলানাথকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করেন। নির্জ্জনে তপস্যাদি করিবার জন্য মা মধ্যে মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও এখানে পাঠাইয়া দেন।

বলিতেছেন, "মঙ্গলের জন্যই যা কিছু হইয়া যায়।" তখনই একজনের মোটরে নরসিংহ ও আর একটি ছেলে মাকে রায়পুরে রাখিয়া আসিল। সেখানে বিরাজমোহিনী দিদি, মাসীমা, নিশিবাবু ছিলেন। মাকে পাইয়া তাঁহাদের মহা আনন্দ। মার আজ কয়দিন যাবৎ পেট খারাপ। আজ আমরা কিছু খাইতে দিব না, দেরাদুনে এইরূপই স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু শুনিলাম, রায়পুরে ভক্তেরা যা দিয়াছেন, মা বিনা দ্বিধায় তাই খাইয়াছেন এবং তাহা রোগীর পথ্য মোটেই নয়।

মার অস্থির ভাব দর্শনে বিপদের আশঙ্কা এবং তৎপরেই ভোলানাথের দ্বিতীয় ভাগিনেয়ের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তি।

পরদিন ভোরে লেডী ডাক্তার সারদা গিয়া নিজের গাড়ীতে মাকে নিয়া আসিলেন এবং কৃষ্ণাশ্রমে পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। কিন্তু আসিয়াও মা সুস্থির নয়। মা বলিতেছেন, "গড়াগড়ি দিব ?" বলিয়া মাটীতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। দিনটী এইভাবে গেল। রাত্রিতে শুইয়া আছেন। জ্যোতিষদাদা পায়ের কাছে ও আমি নিকটে শুইয়া আছি। হঠাৎ মার শরীর ওলট পালট হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর স্থির হইলেন। পরদিনও হাসিতেছেন, কিন্তু চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। আমরা দেখিয়া আসিতেছি, মার এই ভাব কোন বিপদেরই সূচনা করে, তাই চিন্তা হইতেছে।

কয়েকদিন হইতেই গোপালজী (শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রয়না মহাশয়কে মা নাম দিয়াছেন, গোপালজী) আসিয়া মিনতি জানাইতেছেন, "মা, আনন্দচকে, মনোহর মন্দিরে চল।" এই মনোহর মন্দিরে মা অনেক সময় থাকিতেন। গোপালজীর বাড়ীর অতি নিকটেই এই মন্দির। এই ঘটনার পরদিনই মা বলিতেছেন, "কাল গোপালজী মনোহর মন্দিরে যাইতে বলিতেছিল। চল আজই যাই।" আর কোন কথা নাই;

আমরা খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জিনিষপত্র গুছাইয়া মনোহর মন্দিরে পাঠাইয়া দিলাম। সন্ধ্যাবেলায় মা সকলকে নিয়া হাঁটিয়া মনোহর মন্দিরে গেলেন। সেখানে গিয়াই চিঠি পাইলাম, ভোলানাথের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন কুশারী মহাশয়ের উপযুক্ত দ্বিতীয় পুত্র, তুইটী শিশু সন্তান রাখিয়া মারা গিয়াছেন। হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, যে রাত্রিতে মা হঠাৎ রায়পুর চলিয়া গিয়াছিলেন, সেই দিনই মৃত্যু হইয়াছে।

সম্মুখে জন্মোৎসবের কথা হইয়াছে। জন্মোৎসবের সময়ই দেরাতুনের আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইবে। মার জন্ম তারিখ, ১৯শে বৈশাখ হইতে দেরাতুনের নূতন আশ্রমে, ভোলানাথ আরও ৪ জন ব্রাহ্মণ নিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন। এখানেও লক্ষ আহুতি দেওয়া হইবে। আশ্রমে বৃহৎ যজ্ঞকুণ্ড করা হইয়াছে। হংস, হরিরাম প্রভৃতি ভক্তেরা সব বন্দোবস্ত করিতেছেন।

কিষণপুর আশ্রমের উদ্বোধন।

এর মধ্যে একদিন মনোহর মন্দির হইতে মা সকলকে নিয়া হাঁটিয়া রায়পুর চলিয়া গেলেন। পর দিন ভোরেই পুনরায় সারদার গাড়ীতে মনোহর মন্দিরে ফিরিয়া আসিয়াছেন, সেদিন ১৮ই বৈশাখ। মা কিষণপুর (দেরাতুন) আশ্রমের নিকট একটা মন্দিরে গিয়া থাকিবেন; অন্যান্য ভক্তেরা আশ্রমের নিকটেই একটা বাড়ীতে গিয়া থাকিবেন। ১৯শে বৈশাখ হইতে যজ্ঞ আরম্ভ হইবে। মা ১৮ই বৈকালে, জাঘম মন্দিরে (কিষণপুর) গিয়া রহিলেন। একটা খালি বাড়ী পড়িয়াছিল, অন্যান্য ভক্তেরা তাহাতে আশ্রয় লইল। কথা হইয়াছে, আগামী ২৬শে বৈশাখ, কৃষ্ণাচতুর্থীতে (মার জন্ম তিথি) মা নূতন আশ্রমে প্রবেশ করিবেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

আমরা এলাহাবাদ গেলাম, সেখানে গিয়া ৺কালীবাড়ীতে ছিলাম। সেখানকার হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় মার সব বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। একদিন সেখানে থাকিয়া ৺চিত্রকূট গেলেন। দুই দিন ৺চিত্রকূট নানাস্থানে বেড়াইলেন। তৃতীয় দিন সেখান হইতে পুনরায় এলাহাবাদ আসিয়া দুইদিন থাকিয়া আগ্রা রওনা হইলেন। সেখানে সন্ধ্যায় পৌঁছিলাম। সেখানকার প্রফেসর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মার পুরাতন ভক্ত। তিনিই মার জন্য সব বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আগ্রা আসিয়াও ৺কালীবাড়ীতে মা উঠিলেন। ৺কালীবাড়ীতেই মার থাকিবার স্থান হইয়াছে। ধীরে ধীরে অনেকে মার খবর পাইয়া মাকে দেখিতে আসিতেছেন। মার সহিত কথা বলিয়া অনেকে বেশ আনন্দিত হইতেছেন। একদিন সকলে মাকে একটা বাগানে নিয়া গেলেন। মা তথায় রহিলেন। কলেজের ছেলেরা, প্রফেসাররা, অনেকে সেখানে মাকে দেখিতে আসিলেন। কথাবার্ত্তা হইল। সকলের অনুরোধে প্রায় ৮।৯ দিন তথায় থাকা হইল।

এলাহাবাদ, চিত্রকূট ও আগ্রা গমন।

আগ্রা হইতে মা ৺মথুরায় গেলেন। তারপর ৺বৃন্দাবনে গেলেন। ২।৪ দিন ৺বৃন্দাবনে ছিলেন। তথায় বর্দ্ধমানরাজার মন্দির সংলগ্ন ধর্ম্মশালার মত একটি বাড়ীতেই আমরা ছিলাম। সেখানকার ম্যানেজার বীরেনদাদার বন্ধু। তিনি মাকে খুব যত্ন করিয়াছেন।

৺মথুরা, ৺বৃন্দাবন ও জয়পুর গমন।

গোপালজ্বা প্রভৃতি ভক্তেরা রোজই প্রায় আসিতেছেন। হরিরাম ও হংস এই আশ্রমের নির্ম্মাণ কার্য্যে খুব পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহাদের উৎসাহেই এই আশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছে। এখনও উৎসবের বন্দোবস্ত করিতে তাঁহারাই অগ্রণী। দেরাতুনের ভক্তদের মধ্যে হরিরাম যোশীই সর্ব্বাগ্রে রায়পুর যাইয়া মার সহিত পরিচিত হন। তাঁহার কাছে খবর পাইয়াই অনেকে মার চরণে আসিবার সুযোগ পাইয়াছেন। মার চরণপ্রান্তে কাহাকেও আনিতে পারিলে তাঁহার মহা আনন্দ। মার নামে তিনি যেন পাগল। দিল্লী হইতে কাশ্মিরী বৃদ্ধা মহিলাটি (মা দেরাতুন আসিবার সময় তিনি দিল্লীতেই ছিলেন) কন্যা জামাতা সহ আসিয়া উপস্থিত।

কিষণপুর আশ্রমের প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে প্রবেশ। (১৩৪৩, ২৫শে বৈশাখ, শেষরাত্রি)।

আজ ২৫শে বৈশাখ। হংস প্রভৃতি ভক্তগণ নানা ফুল পাতা, কাগজ দিয়া আশ্রম সাজাইতে ব্যস্ত। কলাগাছ ও মঙ্গল-কলস স্থাপিত হইয়াছে। মধ্যের হল ঘরটি কীর্ত্তনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই ঘরে মার বৃহৎ চিত্র রাখা হইয়াছে। শেষ রাত্রিতে (মার জন্ম সময়) মন্মথবাবু সেই চিত্রেই মার পূজা আরম্ভ করিবেন, স্থির হইয়াছে। সকলেই মহা ব্যস্ত। এত কষ্ট করিয়া মার জন্য আশ্রম তৈয়ার করিয়াছে, আজ তাহা সার্থক হইবে, মা সেই আশ্রমে পদার্পণ করিবেন। উদ্যোক্তাগণ সকলে ধন্য হইবেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতেই দেরাতুনের ভক্তরা আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

পাশ করিয়া চাকুরীর চেষ্টায় আছে, এখনও বিবাহ করে নাই। শিশুকালেই মাতৃহারা। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেরাতুনেই কাজ করেন। তাঁহারই একমাত্র পুত্র। মা ইহাকে সারদার ধর্ম্মপুত্র করিয়া দিয়াছেন।

দেরাডুন সহর হইতে এই স্থানটি প্রায় ৪ মাইল দূর। মার জন্ম সময় (অর্থাৎ শেষ রাত্রিতে) ভোলানাথ ও মার সহিত ভক্তবৃন্দ, নূতন আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ঘন ঘন শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি হইতে লাগিল। ভোলানাথ ও মাকে, মধ্যের কীর্ত্তনের ঘরটিতে বসান হইল। সকলে ফুলের মালা ও কর্পূরাদি দ্বারা আরতি করিতে লাগিলেন।

মন্মথবাবু পূজা আরম্ভ করিলেন। ষোড়শোপচারে মার পূজা হইল। সিন্দুরে, মালায়, নূতন বস্ত্রে মার রূপ ঝক ঝক করিতে লাগিল। রূপের ছটায় স্থানটি আলো করিয়া যেন এক অনিন্দ্যাসুন্দরী দেবীমূর্ত্তি প্রকট হইয়াছেন, মনে হইতে লাগিল! কি যে রূপ, কি আর বলিব! রূপ যেন ঝলসিয়া পড়িতেছে। যে দেখে নাই, সে জীবনে বড় একটি সুযোগ হারাইয়াছে।

উদ্বোধন উপলক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা।

বেলা হইল। ধীরে ধীরে অনেকে বিদায় লইল। নূতন অনেকে আবার আসিল। বহু লোক, মার চরণধূলি লইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। কিছুক্ষণ পর কীর্ত্তন সুরু হইল। মা কীর্ত্তনের ঘরেই বসিয়া আছেন। কখনও হাসিয়া হাসিয়া সকলের সহিত কথা বলিতেছেন। কখনও সমাধিস্থ অবস্থায় বসিয়া আছেন। সকলে চিত্রার্পিতের ন্যায় মার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন।

কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর মা শুইয়া শুইয়াই ভক্তদের সহিত কথা বলিতেছেন। ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হইতেছে। সারাদিন আনন্দ উৎসবের পর সকলেই প্রায় যার যার বাড়ী গিয়াছেন। গোপালজীর স্ত্রী, কাশী নারায়ণজীর স্ত্রী, (কাশীর নারায়ণবাবু কণ্ট্রাক্টর; তিনিই এই আশ্রম নির্ম্মাণের ভার নিয়াছিলেন।) প্রভৃতি কয়েকজন রহিয়া গেলেন। হরিরাম তাহার দুইটি শিশু পুত্রসহ রাত্রিতে আশ্রমেই রহিল।

পরদিন, ২৭শে বৈশাখ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেওয়া হইল। বাবা ভোলানাথ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ সমাগত ভক্তবৃন্দের মস্তকে শান্তি জল ছিটাইয়া দিলেন। আজ মার খাওয়ার দিন। দুপুর বেলা দক্ষিণ দিকের একটা কোনের ঘরে মার ও ভোলানাথের ভোগ হইল। পরে সকলে প্রসাদ পাইলেন।

যজ্ঞে পূর্ণাহুতি।
(১৩৪৩, ২৭শে বৈশাখ)

পরে মাকে একটু বিশ্রাম দিবার বন্দোবস্ত করা হইল, কিন্তু বিশ্রামের উপায় নাই; ভক্তগণ দলে দলে মার চরণ দর্শনে আসিতেছেন। মাও সকলের সহিত হাসিয়া হাসিয়া আলাপ করিতেছেন। ক্লান্তির লেশমাত্রও নাই। মার সবই অদ্ভুত। মাকে দিনরাত্রি এক ভাবে বসিয়া ভক্তদের সহিত আলাপ করিতে দেখিয়াছি, ক্লান্তির চিহ্নও দেখি নাই। ভক্তেরা দলে দলে যাইতেছে, আসিতেছে; রাত্রি ২টা। ৩ টায়ও বিরাম নাই। মা এক ভাবেই বসিয়া আছেন, দেখিয়াছি। এক দিন নয়, বহু দিন পর্য্যন্ত এই ব্যাপার চলিতে দেখিয়াছি।

উৎসবের ৩।৪ দিন পর খ্যাতনামা পালোয়ান শ্রীযুক্ত রামমূর্ত্তি মহাশয় মাকে তাঁদের "শক্তি-আশ্রমে" নিয়া যাইবার জন্য মোটর পাঠাইয়াছেন। মা বৈকালে তথায় গেলেন। পরে রামমূর্ত্তি নিজেও একদিন ভক্তদের নিয়া মার আশ্রমে আসিলেন। মা, "বাবা" বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন। জলখাবার দেওয়া হইলে, তিনি মাকে নিজ হাতে খাওয়াইয়া দিলেন; মাও তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতেছেন। মহা আনন্দ! আনন্দময়ীর সংস্পর্শে আসিয়া সকলেই আনন্দে মগ্ন। তারপর কীর্ত্তন শুনিতে চাওয়ায় ত্রিগুণাবাবু কীর্ত্তন শুনাইলেন। কিছুক্ষণ পর মাকে প্রণাম করিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের নিকট
রামমূর্ত্তি।

অষ্টবিংশ অধ্যায়

পূর্ব্ব ব্যবস্থামত ১৯শে বৈশাখ হইতে নূতন আশ্রমে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। ভোলানাথ অন্য ৪ জন ব্রাহ্মণ সহ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ১৮ই বৈশাখ মির্জ্জাপুর হইতে শ্রীযুক্ত উপেন ডাক্তার মহাশয় ও তুরীয়ানন্দ স্বামীজী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সেই দিন ঢাকা হইতে কমলাকান্ত ব্রহ্মচারীও আসিয়া উপস্থিত। তাহার মনটা খুব চঞ্চল হওয়ায় সে ঢাকা ছাড়িয়া মার কাছে চলিয়া আসিয়াছে। এখন মার যাহা আদেশ তাই করিবে। যজ্ঞে জপ করিবার ভার আমার ও উপেন ডাক্তার মহাশয়ের উপর পড়িল। ধীরে ধীরে নানা স্থান হইতে ভক্তেরা উৎসব উপলক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। শ্রীরামপুর হইতে প্রফেসার ত্রিগুণা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আগ্রা হইতে প্রফেসার বীরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কাশীধাম হইতে শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং নির্ম্মলবাবুর পুত্র ও পত্নী এবং মানিক, মির্জ্জাপুর হইতে শ্রদ্ধানন্দ স্বামী, কলিকাতা হইতে ভ্রমর ঘোষ, বীরেন মহারাজ, সব ধীরে ধীরে দেরাদুনে গিয়া মার চরণে উপস্থিত হইতেছেন।

দেরাদুন আশ্রম উদ্বোধনের প্রাক্কালে যজ্ঞ আরম্ভ। (১৩৪৩ ১৯শে বৈশাখ)।

মা কোন দিন প্রাতে একবার যজ্ঞ দর্শনে গিয়া আবার ফিরিয়া জাঘম মন্দিরে যান। খাওয়া-দাওয়া সবই জাঘম মন্দিরে নিয়া যাই। দেরাদুন সহর হইতেও বৈকালে সকালে বহু ভক্ত আসিয়া মাতৃদর্শন করিয়া যাইতেছেন। সারদা, নরসিংহ, * হরিরাম, হংস,

---

* এই ছেলেটিও খুব ভাল। মা ইহাকে খুব স্নেহ করেন। এম, এ,

৺নির্ম্মলবাবুর পুত্র, বাবুরাম, মা চলিয়া যাইবেন শুনিয়া সঙ্গে যাইবার জন্য মহা কান্নাকাটি আরম্ভ করিল। সে তাহার মায়ের একমাত্র পুত্র; তাহার মা ছাড়িয়া দিতে চায় না। কিন্তু সে এমন অবস্থা আরম্ভ করিল, যে মা তাকে ফেলিয়া আসিতে পারিলেন না। সেও সঙ্গে আসিল। বীরেনদাদা মাকে বলিতেছেন, "আমরা ত এর অর্থ কিছুই বুঝি না। ২।৪ দিন পর ভোলানাথ ভাল হইলে আমরা সকলে একত্রে যাইতাম, তাতে তোমার কি ক্ষতি হইত? আজই তোমার যাওয়া চাই এর অর্থ কি?" মা তাঁর স্বাভাবিক ধীর মূর্ত্তিতে হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন, "আমিও এর অর্থ তোমাদের কিছু বুঝাইতে পারি না। এটা জানিও, আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না। যখন যাহা হইয়া যায়, তোমাদের মঙ্গলের জন্যই। তোমরা চিন্তা কর কেন? ভোলানাথ ভাল হইলেই তোমরা ভোলানাথকে নিয়া সোলন চলিয়া যাইও। আমি আজই যাইব।" মার আদেশ অমান্য করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই; তখনই বন্দোবস্ত হইল।

সোলনের রাজাসাহেব, দুর্গা সিং মার পরম ভক্ত। তাঁকে ফোন করিয়া দেওয়া হইল কাল্‌কা ষ্টেশনে মোটর রাখিবার জন্য। দেরাদুনে কেহ এই খবর জানে না। হরিরাম, সারদা, লছমী (কাশী নারায়ণের স্ত্রীর নাম, মা দিয়াছেন), গোপালজী প্রভৃতি খবর পাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সকলেই ম্লান মুখে মাকে বিদায় দিতেছেন। এই এত উৎসবের মধ্যে মা চলিয়া যাইতেছেন, কে জানে কবে ফিরিবেন! মার ত কিছুই ঠিক থাকে না। কিন্তু উপায়ও কিছু নাই। মা যখন যাহা করিবেন বলেন, প্রায়ই তাহার অন্যথা হয় না। তবে ভোলানাথের আদেশ রক্ষার জন্য মাঝে মাঝে অন্য রকম হইয়া যায়। কিন্তু ভোলানাথও মার ইচ্ছায় বাধা দেন না।

সোলনে আগমন।

আমরা সন্ধ্যায় দেরাদুন হইতে রওনা হইয়া ভোরে কাল্‌কা পৌঁছিলাম। রাজাসাহেবের মোটর তখনও পৌঁছায় নাই। মা স্নান করিবেন বলিয়া, আমি মাকে কলের নীচে স্নান করাইলাম। মার খাওয়ার দিন। সঙ্গে সামান্য ফল ছিল। তাই মাকে রাস্তার ধারে বসিয়া খাওয়াইয়া দিলাম। ইতিমধ্যে গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। আমরা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে সোলন পৌঁছিলাম। সেখানে "শোগীবাবা" বলিয়া এক অতি বৃদ্ধ সাধু ছিলেন। মা তাঁকে পূর্ব্বে সোলন আসিয়া দেখিয়া গিয়াছিলেন। মা আরও ২।৩ বার সোলন আসিয়াছেন। এখানে অসিয়া মা এক গুহায় থাকিতেন। শোগীবাবাই রাজার রাধা-কৃষ্ণের মন্দিরের সংলগ্ন আরও দুইটি মন্দির করিয়া ৺শিব ও ৺দুর্গামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এবং তৎসংলগ্ন আরও কতগুলি ঘর তৈয়ার করিয়া গিয়াছেন। অনেকগুলি ঘরই খালি পড়িয়াছিল। মা কোন গৃহস্থের ঘরে যাইবেন না। তাই রাজাসাহেব এই ঘরগুলিই মার থাকিবার জন্য পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। আমরা আসা মাত্রই রাজকর্ম্মচারীরা সব বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে। হরিরামের ছোট ভাই মদন মোহন যোশী এই ষ্টেটের ডাক্তার। সেও আসিল। কিছুরই অভাব নাই। রাজা-সাহেব মার জন্য সব বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

একটু পরেই রাজাসাহেব আসিয়া মার চরণ বন্দনা করিলেন। অতি শান্ত মূর্ত্তি। মা রাজার নাম দিয়াছেন "যোগীরাজ"। শুনিলাম, রাজাদের মধ্যে এমন সচ্চরিত্র বড় দেখা যায় না। দুঃখ এই, রাজা নিঃসন্তান, কিন্তু এমন ধর্ম্মভীরু যে সকলে বলা সত্ত্বেও রাজাসাহেব পুনরায় দার পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক নন। রাজবাড়ী হইতে খাবার আসিবে কি না

সোলনের রাজা, রাজমাতা, রাণী প্রভৃতির মায়ের চরণ-বন্দনা।

জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু আমার কাহারও হাতে খাওয়া নিষেধ। তাই এখানেই পাক করিব বলিয়া দেওয়া হইল। খাদ্য সামগ্রী সবই রাজকর্ম্মচারীরা দিয়া গেল। এই পাহাড়েও এই বাঙ্গালী মাতাজীর অসীম ক্ষমতা দেখিয়াছি। রাজা, উজীর, ডাক্তার, সবাই যেন মার আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। বৈকালে পর্দ্দায় রাস্তা ঘেরাও করিয়া রাণী, রাজমাতা আসিয়া মার চরণ দর্শন করিলেন। পরিচারিকারাও সব আসিয়াছে। সকলেই মাকে দেখিবে। মা'ও সকলের সহিত হাসিয়া হাসিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আজ মার খাওয়ার দিন। রাণী নিজে কিছু ফল নিয়া আসিয়াছেন। মাকে নিজ হাতে কিছু খাওয়াইয়া দিলেন।

সন্ধ্যায় সকলে চলিয়া গেলে অপরাপর ভক্তরা ধীরে ধীরে আসিতেছেন। মার নাম শুনিয়া দিন দিনই নূতন নূতন লোক মার চরণ দর্শনে আসিতেছেন। পাঞ্জাবী ভক্তেরা মার ভোগ নিয়া আসিতেছে। মাকে নিজেরা খাওয়াইয়া দিতেছে। মা'ও যেন তখন সেই দেশেরই লোক। তাদের তরকারি খাইয়া বলিতেছেন, "খুব চমৎকার হইয়াছে।" তাহারা মহা খুসি।

৭ দিন পর ভোলানাথ, অখণ্ডানন্দ স্বামী, বীরেনদাদা, বাচ্চুর মা আসিয়া পৌছিলেন। শুনিলাম, জ্যোতিষদাদাকে মা দেরাদুন আশ্রমেই থাকিতে বলিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী থাকিবে। আজ প্রায় ৩৪ বৎসর জ্যোতিষদাদা সঙ্গে সঙ্গে আছে, হঠাৎ তাঁহার উপর কেন এই আদেশ হইল, মা'ই জানেন।

ভোলানাথ প্রভৃতির আগমন। জ্যোতিষদাদার অসুস্থতার কথা।

জ্যোতিষদাদার মনের অবস্থা এই আদেশে খুব খারাপ হইল। কিন্তু কি করিবেন? মার আদেশ পালন করিতেই হইবে। তাঁহার শরীরটা বড়ই দুর্ব্বল, রক্তশূন্য হইয়াছিল। মা নিয়মমত চিকিৎসা করিতে বলিয়াছেন। ইন্‌জেক্‌সন নিতে আরম্ভ করিয়াছেন, খবর দিয়াছেন।

ত্রিংশ অধ্যায়

প্রায় পনের দিন সোলনে থাকিয়া মা সিমলা যাইবার কথা বলিলেন। সিমলায় কেহ পরিচিত নাই। মা বলিতেছেন, "গেলেই একটা বন্দোবস্ত হইবে।" দেখিয়াছি, তাহাই হয়। মার কৃপায় কিছু আটকায় না! কত অচেনা জায়গায় এই ভাবেই চলিয়াছেন, বন্দোবস্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ভক্তগণ নিজেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বে কোনও বন্দোবস্ত করিলে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পরে তাহারা মার উপরই নির্ভর করিয়া অনেক সময় চলিয়াছে; দেখিয়াছি, বিশেষ অসুবিধা ত হয়ই না, বরং আশাতীত সুবন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারিলে কিছুরই অভাব হয় না। কিন্তু আমরা নির্ভর করিতে পারি কই?

সোলন হইতে সিমলা যাত্রা।

সোলন হইতে রাজা তাঁহার সিমলাস্থ এজেণ্টকে ফোন করিলেন, মার জন্য একটা বন্দোবস্ত করিতে। তিনি সিমলা কালীবাড়ীতে মার বন্দোবস্ত করিবেন, খবর দিলেন। আমরা রাজাসাহেবের মোটরে সিমলা রওনা হইলাম।

পার্ব্বত্য পথ; ২ ঘণ্টার রাস্তা। পাহাড় ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাস্তা গিয়াছে; অতি সুন্দর দৃশ্য। কেন সিমলা যাইতেছেন, মা-ই জানেন। কেন এই দেশ বিদেশে ঘোরাঘুরি করিতেছেন, কে বলিবে? মাও কিছু বলেন না। শুধু বলেন, "যা হইবার হইয়া যাইতেছে। তোমরা যেমন করাইয়া নিতেছ; আমিত কিছু জানি না" বাস্তবিক যার সঙ্কল্প বিকল্প কিছুই নাই তিনি আর কি বলিবেন?

সিমলা পৌঁছিবার রাস্তায় দুইটি মৃত্যুর পূর্ব্বাভাস। ৺কালী বাড়ীতে অবস্থান।

কিছুক্ষণ পর মা হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন, "দুইটি মৃতদেহ দেখিতেছি"। এই বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, দৃষ্টি বাহিরের দিকে। আমরা ভাবিলাম, এ আবার কার মৃতদেহ দেখিতেছেন। আমরা বেলা দুইটার সময় রওনা হইয়াছিলাম। ৪ টায় সিমলা পৌছিয়া কালী-বাড়ীতে গেলাম। অতি সুন্দর কালীবাড়ী, বহুলোক থাকিবার বন্দোবস্ত। থিয়েটার হল, লাইব্রেরী, ক্লাব সবই আছে। খুব পাকা বন্দোবস্ত।

৺কালীবাড়ীতে সাধু "দয়াল বাবার" মৃত্যু সংবাদ।

আমরা ৺কালী বাড়ী পৌছিতেই সুধীর সেন সেক্রেটারী মহাশয় আসিয়া খবর দিলেন, এই মাত্র "দয়াল বাবা" নামে একটি ৮৪ বৎসরের সাধু এখানে দেহ-রক্ষা করিলেন। আজ বহু বৎসর যাবৎ তিনি এই ৺কালী-বাড়ীতে আসা যাওয়া করিতেন। সকলেই তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। মা একেবারে সেই মৃতদেহ যে ঘরে ছিল, সেই ঘরে গিয়া উপস্থিত। আমরাও সঙ্গে গেলাম। দেখি সাধুটী কাত হইয়া যেন ঘুমাইয়া আছেন। একটী ব্রহ্মচারী ঘরে ৺গীতাপাঠ আরম্ভ করিলেন। ধীরে ধীরে বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা উপস্থিত হইতেছেন। মাতৃদর্শনেও আসিতে-ছেন। সাধুটিরও আবার সৎকারের ব্যবস্থা করিতেছেন। অনেকে বলিতেছেন, সাধুটি মৃত্যুর পূর্ব্বেও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "আনন্দময়ীর যে আসার কথা ছিল, তিনি কি আসিয়াছেন?" রাজার এজেন্ট আসিয়া যে মার জন্য ঘর ঠিক করিয়া গিয়াছে, তাহাতেই কেহ কেহ খবর পাইয়াছেন যে "আনন্দময়ী মা" আসিতেছেন।

আমরা তখন সমাগত ভদ্রলোকদের বলিলাম, মা আসিবার সময় রাস্তায় বলিয়াছিলেন, "দুইটি মৃতদেহ।" একটি ত দেখিলাম। তাঁহারা অমনি বলিলেন, "আজ মাসখানেক হয়, ৺কালীবাড়ীর প্রধান

পুরোহিতটি এইখানেই মারা গিয়াছেন।” মার মুখেও শুনিয়াছিলাম একটি একটু পুরাণো আর একটি সত্ত মৃত। মা এমন অনেক কথা অস্পষ্টভাবে পূর্ব্বেই বলিতেন। কিন্তু আমরা সব সময়ে ধরিতে পারিতাম না। পরে কোন ঘটনা ঘটিলে মা বুঝাইয়া দিতেন।

৺কালীবাড়ীর প্রধান পুরোহিতের মৃত্যু-সংবাদ

আমরা সিমলা যেদিন পৌছিলাম সেইদিন রাত্রিতেই ২।৪টি বাঙ্গালী ভদ্রলোক আসিয়া মার কাছে বসিয়া একটু আলাপ করিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন ভোরবেলা মা একটু বেড়াইয়া আসিলেন। দেখিতেছি ধীরে ধীরে ক্রমশঃ ২।৪টি লোক আসিতেছেন। মাকে বলিতেছেন, “এই দয়াল বাবা দেহ রক্ষা করিলেন, ইঁহাকে আমরা খুব শ্রদ্ধা করিতাম ও ভালবাসিতাম। এঁর মৃত্যুতে আমাদের খুবই আঘাত পাইবার কথা ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনি আসায় আমরা সেই আঘাতটা অনুভব করিলাম না। আপনাকে পাইয়া আমাদের বড়ই আনন্দ হইতেছে”। মাও যেন সকলেরই পূর্ব্বের পরিচিত, এইভাবে সকলের সহিত আলাপ করিতেছেন, বলিতেছেন, “আমি যে তোমাদের ছোট্ট মেয়ে। মেয়েকে দেখিয়া বাবার ত আনন্দ হওয়ারই কথা, এতদিন পর মেয়েটা আসিয়াছে।” বাস্তবিকই যেন কত কালের মেয়ে সাজিয়া বসিলেন। কেহ আর উঠিতে চায় না। ধীরে ধীরে লোকসংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ছোট ঘর, স্ত্রী পুরুষে ভরিয়া যাইত। রাত্রিতেও ধীরে ধীরে লোকসমাগম বাড়িতে লাগিল। শেষে এমন হইল, রাত্রি ১ টায়ও অনেকে বসিয়া আছেন, বাড়ী যাইতেছেন না। ভোর বেলাও অফিসের পূর্ব্বে কেহ কেহ আসিয়া মাকে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। কি আকর্ষণই যে

সিমলাতে মাতৃদর্শনে বহু ভক্ত সমাগম।

মায়ের চোখে আছে, যে অফিসের বেলা হইয়া যায়, তবু বাবুরা যাই যাই করিয়াও যাইতে পারিতেছেন না। অনেকে বলিতেছেন, "সিমলায় এতদিন যাবৎ ৺কালীবাড়ী করিয়া কীর্ত্তন করিয়া আজ এই ফল হইল। দেখ মা নিজে হইতেই এখানে উপস্থিত।" সকলে যেন দিন দিন মাকে দেখিয়া, মার সহিত আলাপ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

তুপুর বেলা মেয়েরা আসিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সংখ্যাও দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। পাহাড়ীরা সব মার খবর পাইয়া দেখিতে আসিতেছেন ও আসিয়া এমন মুগ্ধ হইতেছেন, যে পাহাড় ভাঙ্গিয়া বহুদূর হইতেও রোজ দ্বিপ্রহরে মার চরণে উপস্থিত হইতেছেন। বলিতেছেন, "মা, না দেখিয়া থাকিতে পারি না, তাই এতদূর হইতে রোজ রোজ আসি।" বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরাও বহুদূর হইতে রোজই আসিতেছেন; পাহাড় চড়াইয়ের কষ্ট বা বৃষ্টি, কিছুতেই তাঁহাদের বাধা দিতে পারিতেছে না। মা যেন সকলকে টানিয়া আনিতেছেন। মার সেই ছোট্ট ঘরখানিতে দিন রাত আনন্দের হাট বসিয়া আছে। মা স্ত্রীলোকদের বলিতেছেন, "মা কি মেয়েকে না দেখিয়া থাকিতে পারে? তাই এত কষ্ট করিয়াও আসিতে হয়।" সকলেই বলে, "কষ্ট ত কিছুই বুঝি না। মা, বাবুদের খাওয়াইয়া অফিসে পাঠাইয়া কতক্ষণে আসিব, এই চিন্তায়ই আমরা অস্থির।" কি ব্যাকুলতা! তুই দিনের পরিচয়ে কি এই ব্যাকুলতা সম্ভব? বীরেনদাদা বলিতেছেন, "মা, গোপীগণ বোধ হয় এইরূপই স্বামীদের কোন প্রকারে বাহিরে পাঠাইয়া, কৃষ্ণের সঙ্গে আসিয়া মিলিতে ব্যাকুলা হইতেন।" সকলের এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন ব্যাকুলতা দেখিয়া আমরাও মুগ্ধ। মার কৃপা যেন সকলের উপর ছড়াইয়া পড়িল। সকলেই মাকে পাইয়া কৃতার্থ।

পার্ব্বত্য প্রদেশ; চারিদিকেই পাহাড়ের সুন্দর দৃশ্য। মা সকাল

সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হইতেন। বৈকালে অনেক ভক্তও সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। মার অমূল্য উপদেশ শুনিয়া সকলেই খুব আনন্দিত হইতেছেন।

গৃহস্থগণের সহজ সাধনা।

একদিন দুপুর বেলা আহারাদির পর বিশ্রাম করিয়া মা বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছেন। কয়েকটি পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক আসিয়াছেন। মাকে বলিতেছেন, "আচ্ছা, মা, গৃহস্থের সাধনার কি উপায়?" মা বলিলেন, "সেবা ও মন্ত্র জপই গৃহস্থের সাধনার উপায়।" সেই স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আচ্ছা মন্ত্র জপ কি এক বেলাই করিব? কি দুই তিন বেলাই করিতে হয়?" মা বলিলেন, "রোজ দুই বেলা শরীর রক্ষার জন্য খাইতেই হয়। তেমনই প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় স্মরণ ও ক্রিয়াদি নিয়মিতভাবে যথাসাধ্য অবশ্যই করিতে হয়। তার পর, সারাদিন মধ্যে মধ্যে যেমন জল খাও, পান খাও, ফল খাও, তেমনই সব সময় যতটুকু পারা যায়, তাঁকে স্মরণ করা কিম্বা নাম জপ করা দরকার। তাতেও সৎপথের সহায়তা করে।"

স্ত্রীলোকটি আবার বলিতেছেন, "এক এক দিন মনটা বেশ নাম করিবার সময় জমিয়া যায়। আর এক এক দিন মোটেই জমে না কেন?" মা বলিতেছেন, "দেখ, এর মধ্যে অনেক কথা থাকে। তোমাদের

শ্রীশ্রীমার উপদেশ—একান্তে অবস্থান, সৎসঙ্গ, সদালোচনা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

আহার বিহারের মধ্যে এমন কোন দোষ নিশ্চয়ই থাকে, যাহাতে তোমার মনটা বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়; নামে বসিতে দেয় না। এমন কি, কোন দৃশ্যবস্তুর দোষে, কি কোন লোকের সংস্পর্শে, কি তাহাদের সহিত কথা বার্ত্তায়, ও সব রকমেই তোমার অজ্ঞাতসারেও তোমার মনটা বিক্ষিপ্ত হইবার কারণ ঘটিয়া যাইতে পারে। তাই আমি বলি, যদি কাহারও এই

দিকে যাইতে হয়, তাহার সকলের সঙ্গ-বর্জ্জিত হইয়া একান্তে থাকা নিতান্ত দরকার। প্রথম প্রথম সর্ব্বদা তাহার লক্ষ্য রাখা দরকার, যেন মনটা যাহাতে তাঁর দিকে যাইতে বাধা না পায়। অবশ্য সংসারীর পক্ষে সকলের সঙ্গ বর্জ্জিত হইয়া থাকা সম্ভব নয়। তাহারা সর্ব্বদা সৎসঙ্গ করিবে, সদালোচনা করিবে। সৎলোকের সঙ্গ করিলে বা তাঁহাদের জীবনী পড়িলেও মন শুদ্ধ হয়; তাঁর দিকে যাইবার সহায়ক হয়।"

"অনেক সময় পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মও এই জন্মে সৎপথে যাইবার বাধা বা সহায়ক হইয়া দাঁড়ায়। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের প্রভাবও এই জন্মে প্রকাশ হয়। তাহাতেও এক এক সময় এক একটা ভাব প্রবল হইয়া দাঁড়ায়।"

"সর্ব্বদাই যদি যে কোন কাজ করিতেছি, তাঁহারই সেবা করিতেছি, এইভাবে তাঁহাকে স্মরণে রাখা যায়, তবে গাছের নূতন পাতা গজাইবার সময় যেমন পুরান পাতাগুলি আপনিই ঝড়িয়া যায়, তেমনিই সংসার আসক্তি দূর হইয়া তাঁর প্রতি আসক্তি জাগাইয়া, বহির্ম্মুখী ভাবগুলি অন্তর্ম্মুখী করিয়া দেয়। ইহাই তাহার স্বাভাবিক গতি। আবার দেখনা, পুরান পাতাগুলি মাটিতে পড়িয়া আবার গাছেরই সার হইয়া থাকে। বৃথা কিছুই যায় না জানিও।"

একদিন দুপুর বেলা অনেক স্ত্রীলোক আসিয়াছেন। মা সকলের সহিত হাসিয়া হাসিয়া কথা বলিতেছেন। একটি স্ত্রীলোক বলিতেছেন, "মা, মন ত কিছুতেই স্থির হয় না। মন স্থির হওয়ার উপায় কি?" মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কলসী ভরা জল থাকে, যতক্ষণ কলসীটা নাড়াচাড়া কর, ততক্ষণ ভিতরের জলও নড়িতে থাকিবে। কলসীটা কিছুক্ষণ এক জায়গায় স্থিরভাবে রাখিয়া দাও; দেখিবে, ভিতরের জলও স্থির হইয়া গিয়াছে। সেই রকম শরীরটা বেশীক্ষণ

মন স্থির করার উপায়।

স্থির ভাবে রাখিতে চেষ্টা কর, যত বেশী সময় এক লক্ষ্যে স্থিরভাবে বসিতে পারিবে, ততই মনও স্থির হইয়া আসিবে। একদিকে মনের যেমন চঞ্চল স্বভাব, অন্য দিকে আবার শান্ত স্থিরভাবও মনেরই স্বভাব। যে যত বেশী সময় বসিয়া তাঁর নাম নিতে পার, তার চেষ্টা কর। মনটা ছুটাছুটি করুক; তোমার চেষ্টা তুমি ছাড়িবে না। মনও তার ধর্ম্ম ছাড়িতেছে না, তুমি কেন তোমার ধর্ম্ম ছাড়িবে?"

বৈকাল বেলা অফিস হইতে ভদ্রলোকেরা সব আসিয়াছেন। কেহ কেহ জল খাইতে বা কাপড় ছাড়িতে পর্য্যন্ত বাড়ী যান না। মা আমাদের বলিতেছেন, "কিছু খাবার থাকিলে ওদের আনিয়া দাও"।

শ্রীশ্রীমায়ের আকর্ষণ।

ফল, মিষ্টি যাহা আছে তাহাই সকলে একটু একটু খাইয়া মার কথা শুনিবার জন্য মার কাছে আসিয়া বসিলেন। মাকে পাইয়া যেন কাহারও আর কিছু মনে নাই। মা বলিতেছেন, "তোমরা সব পাগল হইলে নাকি? কোথায় অফিস হইতে যাইয়া জলটল খাইবে, বেড়াইতে বাহির হইবে, সব দেখি তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ। আমি ত তোমাদের মেয়ে। আমারও রক্ত-মাংসের শরীর। তোমাদেরই একজন আমি; কি দেখিতে আস?" তাঁহারা এ কথার কি উত্তর দিবেন? মার মুখের দিকে সব চাহিয়া আছেন। কি আকর্ষণে যে তাঁহারা আসেন, তা' তাঁহারাও যেন বোঝেন না। সকলেই বলেন, "কি যে এক নেশায় পড়িয়াছি, বলিতে পারি না।"

একদিন বৈকালে সকলে বসিয়া আছেন। মাও বিছানার উপরই বসিয়া আছেন, একখানা কম্বলের উপর ছোট একখানি চাদর পাতা। জানালাগুলি খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাহাড়ের পর পাহাড়, আর মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের গায়ে ঘরবাড়ী সব দেখা যাইতেছে। দূরে যেন

পাহাড় ও আকাশ মিলিয়া গিয়াছে। সকলে চুপ করিয়া মার আলোকসামান্য আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখিতেছেন। কখনও কখনও এতগুলি লোক থাকা সত্ত্বেও ঘর যেন নীরব, নিস্তব্ধ। আবার কখনও কখনও মার ও ভক্তদের আনন্দধ্বনিতে ছোট ঘরখানি মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। সব অবস্থায়ই যেন মনটাকে পবিত্র করিয়া দেয়। সকলেই মার কাছে আসিয়া যেন সংসার ভুলিয়া বসিয়া আছেন। নানা কথা হইতে আরম্ভ হইল। একজন বলিলেন, "সমাধি কাকে বলে, মা?" মা বলিলেন, "আমি ত বলি বাবা, ভাব ও কর্ম্মের সম্পূর্ণ সমাধানের বা সমাপ্তির নামই সমাধি"। আবার বলিতেছেন, "জাগতিক হিসাবে বলি, তোমরা যেমন সারাদিন কাজ কর, কর্ম্ম কর; খাও দাও; তারপর গাঢ় নিদ্রা যাও"।

'সমাধি' পদের অর্থ।

———

একত্রিংশ অধ্যায়

২৯শে জুন, ৭ই আষাঢ়। রবিবার বলিয়া আজ ভদ্রলোকেরা অনেকে দুপুরেই মার কাছে আসিয়াছেন। মা তাঁহার ছোট্ট বিছানা-টুকুর উপর বসিয়াই ভক্তদের সহিত স্বাভাবিক হাসি হাসি মুখে কথা বলিতেছেন। হারাণবাবু বলিতেছেন, "আমাদের কি উপায় বলে দাও মা"। আবার একটু পরেই বলিলেন, "আচ্ছা মা, তিনি ত স্বয়ম্প্রকাশ; তবে আমরা তাঁকে ডাকব কেন"? মা বলিতেছেন, "আমি ত কিছু জানি না, বাবা। তবে যা বলাও, তাই বলিতেছি। দেখ না মাটির ভিতর বীজটি থাকাকালীন এমন একটা শক্তির প্রকাশ হয়, যাহাতে মাটিরও একটা স্পন্দন হয় ও গাছটি বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মাটিটাও ফাটিয়া যায়। সেইরূপ তোমাদের 'আমার কি উপায়' এই যে হৃদয়ের ব্যাকুলতা, ইহাও জানিও জমির স্পন্দন। এই স্পন্দন তিনি স্বয়ং প্রকাশ হইবেন বলিয়াই হয়। জীব মাত্রেরই স্বভাব তাঁকে চাওয়া।"

শ্রীশ্রীমার উপদেশ।

আবার একদিন সকলে আসিয়াছেন কুলগুরুর নিকট দীক্ষা নেওয়া সম্বন্ধে নানা কথা উঠিয়াছে। অনেকে কুলগুরু কিছু জানেন না বলিয়া, তাঁহার নিকট মন্ত্র নিতে অনিচ্ছুক। আবার কুলগুরু ত্যাগ করিতেও ভয় পান। বীজমন্ত্রের কথাও উঠিয়াছে। মা ঐ সব কথায় বলিতেছেন, "দেখ না, যেমন বীজটি মাটিতে পুঁতিয়া মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়; বীজটি যদি বারে বারে উঠাইয়া দেখ, তবে আর তাহা হইতে গাছ বাহির হয় না। যাঁহার নিকট হইতেই

গুরু নির্ব্বিশেষে বীজমন্ত্র জপের উপযোগীতা।

যদি তুমি বীজমন্ত্রটি পাও, আর তাহা মনের ভিতর গোপনে রাখিয়া নিয়ম মত কাজ করিয়া যাও, তবে সময়ে নিশ্চয়ই তোমার সেই বীজ হইতে গাছ হইয়া ফুল ফল প্রসব করিবে। গাছের বীজের মত তাকে গোপনে রাখিয়া জল দিতে থাক। সময়ে গাছ বাহির হইবেই। গুরু যেমনই হউক, তুমি যে বীজ পাইয়াছ, তাহা ত তাঁর নাম ঠিকই। তবে কাজ হইবে না, কেন? একটি শিশু যদি একটি বীজ তোমার হাতে দিয়া যায়, শিশু জানে না, কিসের বীজ, তুমিও হয়ত জান না। কিন্তু তুমি মন-প্রাণ দিয়া যত্ন করিলে, সময়ে যখন গাছ বাহির হইয়া ফুল, ফল হইবে, তখনই তুমি জানিতে পারিবে, কিসের বীজ ছিল। বীজের খবর জান নাই বলিয়া, কি নিয়ম মত কাজ করিলে, গাছ বাহির হইবে না? গুরু যেমনই হউক, তুমি যদি বীজটি নিয়া নিয়ম মত কাজ কর, নিশ্চয়ই ফল হইবে।"

এই কথায় একটি গল্পও বলিলেন :—"একটি লোক একবার দীক্ষা নিবার জন্য খুব উৎসুক হইয়া এক সাধুর কাছে যায়। সাধুটি কিছুতেই দীক্ষা দিবেন না। ঐ লোকটিও ছাড়িবে না। শেষে সাধুটি একরূপ রাগ করিয়াই বলিয়া দিলেন, "যা, নে গোপীয়ানন্দন"। লোকটি পরম শ্রদ্ধাভরে সাধুটিকে প্রণাম করিয়া "গোপীয়ানন্দন" নাম দিনরাত জপ করিতে লাগিল। সে খাওয়া-দাওয়া ভুলিয়া গেল; নিদ্রা নাই। শুধু বসিয়া বসিয়া জপিতেছে, গোপীয়ানন্দন"। সকলে দেখিল, এইরূপ আহার-নিদ্রা না করিলে, লোকটা পাগল হইয়া যাইবে। একজন আত্মীয় যাইয়া তাহাকে বলিল, 'তোমার নাম আমি জপিতেছি। তুমি একটু খাইয়া ঘুমাইয়া লও। আমি ততক্ষণ বসিয়া তোমার "গোপীয়ানন্দন" নাম জপিতেছি'। সে কিছুতেই ছাড়িবে না। শেষে

গুরুভক্তির একটি গল্প।

অনেক পীড়াপীড়িতে তাহাই করিল। নামটি ঐ আত্মীয়ের কাছে দিয়া, সে এই কয়দিন পর একটু খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। আত্মীয়টি দেখিল, সে ঘুমাইতেছে। সে ভাবিল, এখন আর কি নাম করিব? "গোপীয়ানন্দন" কি আবার একটা বীজ নাকি? আমি উঠিয়া যাই।

"এই ভাবিয়া যেই সে নাম ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়াছে, অমনি সাধকটি উঠিয়া বসিয়া দেখে, তাহার নাম বন্ধ হইয়াছে। সে পাগলের মত ঐ আত্মীয়টির কাছে গিয়া বলিতেছে, "আমার নাম আমায় দাও"। একবার যে নাম তাহাকে দিয়াছে, আবার সে সেই নাম না ফিরাইয়া দিলে, সে নিতে পারিবে না; এই তার বিশ্বাস। আত্মীয়টি খুবই অবজ্ঞাভরে বলিল, "নে, তোর ঘণ্টানন্দন।" সে কিন্তু এই অবজ্ঞা বুঝিল না। যাহাকে নাম দিয়াছিল, তাহার নিকট হইতে যাহা পাইয়াছে, তাহাই সে মহানন্দে জপিতে লাগিল।

সে লোকালয় ছাড়িয়া এক বৃক্ষতলে বসিয়া জপিতেছে "ঘণ্টানন্দন।" এদিকে শ্রীকৃষ্ণের আসন টলিতেছে। তিনি রাধাকে বলিতেছেন, "চল আমার এক ভক্তকে তোমায় দেখাইয়া আনি। এত বড় ভক্ত আমার আর নাই।" রাধাও ভাবিলেন, "দেখে আসি, কে এত বড় ভক্ত।" দুই জনে চলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব লুকাইয়া থাকা। তিনি দূরে এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাধা এক সাধারণ স্ত্রীলোকের বেশে ঐ সাধুটির কাছে গিয়া দেখিলেন, সে চোখ বুজিয়া জপিতেছে "ঘণ্টানন্দন।" রাধা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাহার নাম জপিতেছ?" পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায়, সাধুটি চোখ মেলিয়াই রাধাকে চিনিতে পারিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "তোমার পতির নাম জপ করিতেছি।" রাধা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "বল ত আমার পতি কোথায়"? নামের প্রভাবে তাঁহার

তখন দিব্যদৃষ্টি হইয়াছে। সাধুটি হাসিয়া দেখাইয়া দিতেছেন, "ঐ যে বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া আছেন।" পরে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির দর্শন পাইয়া তখনই সাধুটি মুক্তি লাভ করিলেন। এই গল্পটি বলিয়া মা বলিতেছেন, "দেখ একাগ্রতা ও সরল বিশ্বাসই তাঁহাকে পাওয়ার উপায়। 'গোপীয়ানন্দন', 'ঘণ্টানন্দন', জপিয়াও সাধুটি মুক্তিলাভ করিল।"

বৈকালেই ভদ্রলোকেরা বেশী আসিতেন। মাও দুপুরে একটু শুইয়া থাকিতেন। কোন কোন দিন মেয়েরা আসিয়া পড়িলে আর শুইতেন না। তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন। ৪টায় তাঁহারা চলিয়া যাইতেন; বাবুরা আসিয়া বসিতেন। প্রায় ৬টায় মা একটু বেড়াইতে বাহির হইতেন। বেড়াইয়া আসিয়া ছোট ঘরখানিতে বিছানার উপর বসিতেন; আর দলে দলে ভক্তেরা আসিত। ঘরে সকলের বসিবার জায়গা হইত না, অনেকে দাঁড়াইয়া থাকিত। দরজা, বারান্দা সব ভরিয়া যাইত। মা তখন হাসিয়া হাসিয়া নানা কথা বলিতেন। সকলেই ভিড়ের মধ্য দিয়া মাকে একটু দেখিবার জন্য কত ব্যস্ত। রাত্রি প্রায় ১টা পর্য্যন্ত এইরূপ চলিত।

একদিন নানা কথা হইতেছে, মা বলিতেছেন, "দেখ, 'ঋষি' আমি ত বলি, যিনি তাঁহার রসে রসবান্, তিনিই 'ঋষি'। আর 'মুনি', যাঁর মন তাঁহাতে লয় হইয়া এক হইয়া গিয়াছে, আমি ত বলি তিনিই 'মুনি'। 'দুনিয়া' সম্বন্ধে বলিতেছেন, 'যা দুই নিয়া', তাকেই বলে 'দুনিয়া'। তোমরা এই দুই নিয়া ভাবটা ছাড়িয়া, এক ভাব নিয়া থাকিতে চেষ্টা কর; তবেই ক্রমশঃ শান্তি দেখা দিবে। এক ভাবে থাকিলে ত আর অভাব থাকে না, থাকিলে অশান্তিও আসিতে পারে না।

'ঋষি', 'মুনি', 'দুনিয়া', 'সংসার', 'বাড়ী' পদগুলির মাতৃপ্রদত্ত অর্থ।

তাই এক মন্ত্র, একেতেই সত্য, শান্তি ও আনন্দ। 'সংসার' অর্থ 'সং+সার' অর্থাৎ সং যার সার, তাই 'সংসার'। যতদিন তুমি নিজে কি তাহা ভুলিয়া সং সাজিয়া থাকিবে, ততদিন কি শান্তি আসিতে পারে? তুমি প্রকৃত যাহা, তা না হওয়া পর্য্যন্ত শান্তি কোথায়? তাই বলি নিজেকে চিনিতে চেষ্টা কর।"

সকলকেই প্রায় হাসিয়া হাসিয়া মা জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার বাড়ী কোথায়?" কেহ কেহ এই কথার প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া জাগতিক হিসাবে নিজেদের বাড়ীর কথা বলিতেছে। মা অমনি হাসিয়া বলিতেন, "ও ত শ্বাসের ঘর, যতদিন শ্বাস আছে, ও ঘরে থাকিতে দিবে। তারপর? নিজের ঘরের খবর কিছু কর কি?" এইরূপ সাধারণ কথায় গভীর কথা বুঝাইয়া দিতেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় সকলে আসিয়া বসিয়াছেন, চারুবাবু প্রভৃতি নানা প্রশ্ন করিতেছেন। আত্মা ও পরমাত্মার কথায় মা বলিতেছেন, "দেখ যেমন গাছ ও ছায়া, যদি এক লক্ষ্য হইয়া গাছ দেখ, তবে আর ছায়া দেখিবে না। আবার ছায়া দেখিলে গাছ দেখিবে না। আমার লক্ষ্য স্থির না হইলে, গাছ ও ছায়া দেখিবে। তেমনি যতক্ষণ পর্য্যন্ত গাছ, ছায়া ও দেহাত্মবুদ্ধি আছে, ততক্ষণ আত্মাও বলিতেছ; তাই গতাগতি, আসা যাওয়া চলিতেছে। যখন লক্ষ্য স্থির হইবে, তখন দেখিবে, এক ছাড়া দুই নাই, গাছেরই ছায়া, আর কিছুই নয়।"

আত্মা ও পরমাত্মা ব্যাখ্যা।

একজন বলিতেছেন, "মা আমার পূজা, জপ ইত্যাদি কিছুতেই মনটা গলিতেছে না।" মা হাসিয়া বলিতেছেন, "দেখ না, খেজুর গাছ প্রথমে কাটিলেই কি আর রস বাহির হয়? কাটিতে কাটিতে পরে

ভক্তিশ্রদ্ধা ও নামজপে মন ধীরে ধীরে বিগলিত হয়

তাহা হইতে ঝর ঝর করিয়া রস বাহির হয়। সেই রসে আবার কত শক্ত জিনিষও তৈয়ার করা হয়। তেমনই ভক্তি শ্রদ্ধায় নাম জপেই মন ধীরে ধীরে গলিবে। তোমরা নিয়ম মত কাজ করিয়া যাও।"

———

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

২২শে জুন, ৮ই আষাঢ়, সোমবার। মার কাছে ভক্তেরা সকলে আসিয়াছেন। কথা হইয়াছে, আগামীকল্য 'নামযজ্ঞ' হইবে। প্রতি বৎসর এখানে ভক্তেরা মিলিয়া একদিন ৺কালীবাড়ীতে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অখণ্ডভাবে নাম করেন। আগামীকল্য সেই 'নামযজ্ঞ' হইবে। আজ সন্ধ্যায় তাহার জন্য অধিবাস করা হইবে। মাকে সেইদিন উপস্থিত রাখিবার জন্য সকলে মিলিয়া মাকে যাইতে দেন নাই। ভক্তেরা অনেক অনুরোধ করিয়া মাকে রাখিয়াছেন।

বাবা ভোলানাথ কীর্ত্তনে মহা আনন্দ পান। তাঁহাকে নিয়া সকলে কীর্ত্তন করিবেন। আজ সন্ধ্যায় অধিবাস আরম্ভ হইল। মাকে নিয়া তথায় বসান হইল। কীর্ত্তনের ঘরের মধ্যস্থলে নানা ফুল পাতা দিয়া মঞ্চ সাজান হইয়াছে। তাহার চারিদিকে ৺কৃষ্ণের ও ৺গৌর নিতাইয়ের নানা ভাবের ছবি বসান হইয়াছে।

৺কালী মন্দিরের সম্মুখেই কীর্ত্তনের ঘর। ৺কালীমায়ের মন্দিরও নানা ফুল পাতায় সাজান হইয়াছে। ভিতরে ভিতরে লাইট দেওয়া হইয়াছে। মার আগমন-স্মৃতি রক্ষার জন্য শ্রীযুত দেবেনবাবু কীর্ত্তনের ঘরে খুব বড় একটা ঝাড়লণ্ঠন দান করিয়াছেন।

মা ৺কালী মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। ভক্তেরা কীর্ত্তনের ঘরে মঞ্চ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাল যে নাম সারাদিন চলিবে, সেই নাম করিতেছেন ও বৈষ্ণবদের বন্দনা গাহিতেছেন। সকলেই বৈষ্ণবদের সাজে সাজিয়া গাহিতেছেন—

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ।

হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, শ্রীরাধে গোবিন্দ॥

ভোলানাথও সকলের সহিত যোগ দিয়া নাচিতেছেন। রাত্রি প্রায় ৯টায় অধিবাস আরম্ভ হইল। হারাণবাবু খুব সুন্দর নাম করেন, সঙ্গে সঙ্গে বীরেন ও অন্যান্য ভক্তরা নাম করিতেছেন। মা উপস্থিত, পার্ব্বত্য প্রদেশ, রাত্রিকাল, ভক্তদের মুখে নাম অতি মিষ্ট শুনাইতেছিল। সকলের বেশভূষা ও ঘরের সজ্জা, সবই যেন অতি সুন্দর মানাইতেছিল। কিছুক্ষণ নাম করিয়া নাম বন্ধ করিল। আগামীকল্য ভোর ৬টা হইতে পুনরায় আরম্ভ হইবে। সকলে মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। মাও ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন।

২৩শে জুন, ৯ই আষাঢ়, মঙ্গলবার। আজ ভোর ৬টা হইতে নাম আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা কখনও প্রাতে উঠিতে পারেন না, প্রতি বছর দুপুরে আসিয়া নামে যোগ দেন, তাঁহারাও আজ ৬টায় আসিয়াই নামে যোগ দিয়াছেন। মা কাল রাত্রে যাইবার সময় বলিয়া দিয়াছেন, "বাবা, কাল সকালেই আসিও, একদিন কষ্ট করিতে হয়।

সিমলায় নামযজ্ঞ

এও ত তপস্যা। তপস্যার অর্থ-ই হইল তাপ-সহা।" মা গিয়া বারান্দায় বসিয়াছেন। মাকে ও ভোলানাথকে প্রণাম করিয়া আজও নূতন মালা চন্দনে সকলে সাজিয়া নামে যোগ দিতেছেন। ভোলানাথও সকলের সঙ্গে সঙ্গে ভাবে বিভোর হইয়া নাচিতেছেন। তাঁহাকে পাইয়া সকলের মহা আনন্দ। নামের ধ্বনি চারিদিক মধুময় করিয়া তুলিতেছে। দলে দলে লোক আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিতেছেন। স্ত্রীলোকেরা চিকের আড়ালে মন্দিরের বারান্দায় বসিয়াছেন। নাম হইতেছে—

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, শ্রীরাধে গোবিন্দ ॥"

ওদিকে সন্ধ্যায় সকলের আহারের বন্দোবস্ত হইতেছে। খাওয়া

দাওয়ার বিরাট আয়োজন। উপরের ঘরে ৺গৌর-নিতাইয়ের ভোগের আলাদা বন্দোবস্ত হইতেছে। বৈষ্ণবদের মত মালসা ভোগ ইত্যাদি কিছুরই ত্রুটী নাই। সব শিক্ষিত বড় বড় পদস্থ ব্যক্তিগণ মিলিয়া কীর্ত্তন করেন। কাজেই নিয়মাদি সবই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়। মা উপস্থিত থাকায় আনন্দ যেন আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে।

মার শরীরের একটু পরিবর্ত্তনের আভাস পাইয়া, বাবা ভোলানাথ মাকে উঠাইয়া নিয়া আসিতে বলায়, আমরা মাকে উঠাইয়া আনিলাম। মার আজ খাওয়ার দিন ছিল। মাকে মুখ ধোয়াইয়া সামান্য একটু খাওয়াইয়া দিলাম। দেখিলাম, মার শরীর যেন কাঁপিতেছে, পা ঠিক ফেলিতে পারিতেছেন না।

প্রায় ৫ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা, কলিকাতা, ৺কাশী প্রভৃতি স্থানে কীর্ত্তনে মার নানা ভাবের প্রকাশ হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু এ কয় বৎসর আর এ ভাব বড় হয় নাই। আজ আবার একটু একটু সেই ভাবের আভাস দেখা যাইতেছে। মা কিন্তু এই ভাবটা সামলাইয়া নিবার জন্য একবার বসিয়া নানা কথা বলিতেছেন, একবার রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন, একবার আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িতেছেন, কিন্তু মুখ ও চক্ষু অস্বাভাবিক ভাবে লাল হইয়া উঠিতেছিল। সমস্ত ব্যবহারে ও চেহারায় যেন একটা বিদ্যুৎ চমকিতেছিল, নিজেকে যেন আর সামলাইতে পারিতেছেন না। বেলা প্রায় ১টার সময় মাকে খাওয়াইতে বসাইলাম; কিন্তু কিছুই খাইতে পারিতেছিলেন না। বলিলেন, "খাইতে পারিতেছি না, শরীরটা যেন কেমন হইতেছে, ঠিক নাই।" দুই-বার পা কাঁপিয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন। উঠিয়া একবার কীর্ত্তনের কাছে যাইয়া বসিতেছেন, একবার ঘরে আসিয়া বসিতেছেন। একবার

নামযজ্ঞে শ্রীশ্রীমায়ের অপূর্ব্ব ভাবাবেশ।

কীর্ত্তনের কাছে মেয়েদের মধ্যে গিয়া মা চারুবাবুর স্ত্রীর কোলে বসিয়া পড়িলেন। তিনি মাকে কোলে জড়াইয়া ধরিলেন। যেন শিশু মেয়েটি। মার চোখ ভরা জল টল টল করিতেছে; মুখে হাসিটুকু লাগিয়াই আছে। মার অবস্থা দেখিয়া ভোলানাথ ভয় পাইলেন। কারণ, তিনি জানেন, এই ভাব-সমাধিতে মার এক একবার কি ভয়ানক অবস্থা হয়। মাকে উঠানই দায় হয়।

পূর্ব্বে এক এক সময় এমন হইয়াছে, যে মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ শরীরে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ভয়ে অস্থির; সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে শুধু নাম করিয়াছিল। কেহ কেহ মার পায়ের গোড়ায় বসিয়া মনে মনে ৺ইষ্টনাম জপিতেছেন। কিন্তু শরীরের পরিবর্ত্তন করা যায় নাই। এই জন্যই ভোলানাথ ঘরে আসিয়া মাকে বলিতেছেন, "দেখ, তুমি কীর্ত্তনের ধারে বেশী যাইও না; তোমার ঐরূপ ভাব যেন হয় না"। মা বলিতেছেন, "তুমি ত বরাবর দেখিয়া আসিতেছ আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না তবে কেন এরূপ বলছ"। তিনি বলিলেন, "তা'ত জানি; তবে ঐরূপ ভাব হইবে আভাস পাইলেই উঠিয়া আসিও"। মা বলিলেন, "আমি ত তাই করিতেছি, তবে আপনা হইতে যদি ঐরূপ হইয়া যায়"।

এদিকে নামের ধ্বনি অতি সুন্দরভাবে জমিয়া উঠিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ভক্তেরা খোল করতালের তালে তালে নাচিতেছেন। সারাটা দিন মা, বাহিরের দিক দিয়া দেখিলে একটা চঞ্চল ভাবে কাটাইয়া দিলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মা কীর্ত্তনের মেয়েদের মধ্যে গিয়াছেন। সুরেশবাবুর স্ত্রী (শেষে জানিলাম, ইনিই মেয়েদের মধ্যে একটি গীতা-সমিতি করিয়াছেন। মেয়েদের নিয়া একটু ভাল আলোচনা করার কার্য্যে ইনিই অগ্রণী; সকলেই এঁকে শ্রদ্ধা করেন) মাকে

ডাকিয়া কোলে বসাইলেন, মা'ও যাইয়া শিশুর মত তাঁহার কোলে বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ তথায় বসিয়া মা আসিয়া নিজের আসনে বসিলেন।

কয়েকদিন পূর্ব্বে ঢাকায় যে মার আদেশে মেয়েরা সুন্দর কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং আজও তাঁহারা সকলে মিলিয়া প্রতি রবিবার কীর্ত্তন রক্ষা করেন, সেই কথা মা ভদ্রলোকদের কাছে বলিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ বড় কিছু বলেন নাই। কারণ, মেয়েদের কীর্ত্তন কেহ বড় শুনেন নাই। মা কিন্তু বলিলেন, "দেখ মেয়েদের বাদ দিয়া যাইও না, তবে তোমরাও কাজে বাধা পাইবে। তাহাদেরও এই কাজে যোগ দিতে শিক্ষা দাও। তোমরাও বল পাবে"। তাই মা জায়গায় জায়গায় মেয়েদের মধ্যেও কীর্ত্তনের ভার দিয়া আসিয়াছেন। ঢাকা, কলিকাতায় মেয়েরা বেশ কীর্ত্তন করে।

সিমলায় মহিলা কীর্ত্তনের সূত্রপাত।

সুরেশবাবুর স্ত্রী নিজেই বলিয়াছিলেন, "মা আজ তোমার ছেলেরা তোমায় নাম শুনাইল, কাল আমরা মেয়েরা তোমায় নাম শুনাইব"। মা বলিতেছেন, "কখন শুনাইবে"? তাঁহারা সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন, কাল দুপুরবেলা ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত সকলে মাকে নাম শুনাইবেন। সকল স্ত্রীলোকদের তখনই বলিয়া দেওয়া হইল। তাঁহারা সকলেই আনন্দে স্বীকৃত হইলেন।

তারপর মা চুপ করিয়া আসনে বসিয়া নাম শুনিতেছেন। হঠাৎ মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কেহ দেখিতে না দেখিতে, যেন বিদ্যুতের মত ছুটিয়া, নিজের শুইবার ঘরে গিয়াই শুইয়া পড়িলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছি। আমাকে শুধু অস্পষ্টভাবে বলিলেন, "দরজাটা বন্ধ করিয়া দাও"। আমি মৌন। দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। কিন্তু

পরেই স্বামী অখণ্ডা-নন্দজী ও বাচ্চুর মা ঘরে আসিলেন। আসিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে না করিতেই, মা বিছানার উপরেই গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিলেন। অদ্ভুতভাবে শরীরে নানা অবস্থা হইতে আরম্ভ হইল। বীরেনদাদা অন্য ঘর হইতে খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের শরীরে অস্বাভাবিক ক্রিয়া।

মার এই অবস্থা দেখিয়া তিনি দরজা খুলিয়া দিলেন। বাচ্চুর মা ছুটিয়া ভক্তদের খবর দিলেন, "মার অবস্থা আসিয়া দেখুন," তাঁহারা খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিতে না আসিতেই মার শরীর যেন চক্রাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্ত্তনের ঘরের দিকে যাইতে লাগিল। কাপড়, চুল সব ছড়াইয়া যাইতেছে। আমরা ঠিক করিতে পারিতেছি না। কারণ, শরীর চক্রাকারে অতি দ্রুত ঘুরিতেছে, আর প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছে, পড়িয়া চোট পাইবেন। কিন্তু মাটি স্পর্শ করিয়াই শরীর আবার ঘুরিয়া উঠিতেছে। এইভাবে বীরেনদাদা ও আমি দুই ধারে চলিয়াছি। মার শরীর ঐভাবেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া সিঁড়ি পার হইয়া, যেন নামের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে কীর্ত্তনের ঘরের দরজায় গিয়া, মাটীতে শুইয়া পড়িলেন।

তখন প্রায় ৭৷৷০টা। সমাগত ভক্তবৃন্দ এই অবস্থা দেখিয়া অবাক ও মুগ্ধ! তাঁহারা আরও উৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে নাম করিতে লাগিলেন। মার শরীরও ধীরে ধীরে তালে তালে উঠিতে লাগিল। আবার পড়িয়া গেলেন। মাটিতে অতি দ্রুত গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। যেন বাতাসে উড়ানো কাপড়খানির মতই শরীর কখনও পড়িতেছে, কখনও উঠিতেছে, কখনও মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছে, কখনও ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিতেছে। শরীরে এইভাবে নানারূপ ক্রিয়া হইতে লাগিল।

ওখানকার কেহ আর এরূপ দৃশ্য দেখেন নাই। কিন্তু অনেকেই

প্রায় উচ্চ শিক্ষিত; এবং ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ ভাল-রূপই পড়িয়াছেন। তাঁহারা বুঝিতেছেন, এ ভাব সামান্য নয়। অবাক হইয়া তাঁহারা মার এই অবস্থা দেখিতেছেন, আর ভিড় ঠেলিয়া রাখিতেছেন। মাকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলে কীর্ত্তন করিতেছেন। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গেই যেন দাঁড়ান অবস্থা হইতে একেবারে চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে মাটিতে পড়িয়া চক্রাকারে ঘুরিতেছেন। আমি শরীর রক্ষার জন্য কাছে আছি, আমার শরীরের উপরই বেশী সময় পড়িতেছেন। কিন্তু মার শরীর এত হালকা, যে এত জোরে পড়িতেছেন, তাহাতে গুরুতর আঘাত পাইবার কথা; কিন্তু কিছুই লাগিতেছে না। কিছুক্ষণ পর মা বসিয়া পড়িলেন।

তারপর পূর্ব্বের মত স্তোত্রাদি অনর্গল ভাবে মুখ দিয়া বাহির হইতে লাগিল। কি সুন্দর তাহার উচ্চারণ। অতি স্পষ্টভাবে বাহির হইতেছে। কিন্তু ঐ ভাষা কেহ বুঝিতেছেন না। উচ্চারণ করিতে মার জিহ্বা নানা রকম হইয়া যাইতেছে। মা বলিতেছেন, ইহা আপনা আপনি ভিতর হইতে ঠেলিয়া যেন বাহির হয়; আবার ধীরে ধীরে আপনিই বন্ধ হইয়া যায়। অনর্গল স্তব হইতেছে। মা পা ছড়াইয়া দিয়াছেন, সমস্ত শরীর ছাড়িয়া বসিয়াছেন। ধীরে ধীরে ডান হাত উঠিয়া গেল। ভ্রূমধ্য আঙ্গুল দিয়া চাপিলেন। স্তবও ধীরে ধীরে বন্ধ হইল। মা বলিয়াছেন, এই যে হাত উঠিয়া যায় বা ভ্রূমধ্য আঙ্গুল দিয়া চাপিয়া ধরা, ইহা কিছুই মা ইচ্ছা করিয়া করেন না। যেমন আপনা হইতে স্তব আরম্ভ হয়, তেমনই বন্ধ হইবার সময় আপনা হইতেই হাত উঠিয়া যায় ঐ ভাবে কোনও ক্রিয়া হয়। আবার আপনিই স্তোত্রাদি বন্ধ হইয়া যায়।

স্বতঃই স্তোত্রাদি নির্গমন।

আজ পর্য্যন্ত এই স্তোত্রাদির ভাষা কেহ বুঝিতে পারিতেছেন না। আপনা হইতেই ইহা বাহির হইত। আবার নিজেই বন্ধ হইত। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন, ইহা বর্ত্তমান যুগের সংস্কৃত ভাষা নয়, দেব ভাষা।

মার মুখ হইতে যখন আপনা হইতেই স্তোত্রাদি বাহির হইতে লাগিল তখন সর্ব্বপ্রথম প্রণব বাহির হয়। মা বলেন, "ছোট বেলায় শুনিতাম ওঁ শব্দ স্ত্রীলোকে উচ্চারণ করে না আমিও গুরুজনদের আদেশ মত প্রণব উচ্চারণ করিতাম না। পরে ঐ শব্দ ভিতর হইতে যেন ঠেলিয়া বাহির হইত। শব্দের সুরও ভিতর হইতেই আসিত। তখন আর ইহা উচ্চারণ করিতে নাই, এ ভাবই জাগিত না।"

মা অনেকবার বলিয়াছেন, "আমি যেন কোথায় বসিয়া শরীরের এই সব ক্রিয়া দেখি। কীর্ত্তনে যে সব ভাব হয়, তাও শুধু শরীরের ক্রিয়া। আমি নিজেই যেন শরীরটাকে এই ভাবে দেখিতে পাই। শরীরের ক্রিয়া হইয়া যাইতেছে আমি ত স্থির, এক ভাবেই আছি। আমি যেন দেখি শরীরটায় এই ভাবে নানা ক্রিয়া হইয়া যাইতেছে"। মা সব বিষয়েই বলেন, "শরীরটার ভিতর হইয়া যাইতেছে"; নিজের হাসি, কান্না, চলা ফেরা সবই আমাদের এই ভাবেই বুঝাইয়াছেন, যে শুধু শরীরের ক্রিয়া হইয়া যাইতেছে। দেহাত্ম-বুদ্ধি যে তাঁর নাই, ইহা অনেক ব্যবহারে দেখিয়াছি কিন্তু আমরা বুঝি না।

সর্ব্বদা একই ভাবে অবস্থিত।

স্তোত্রটি বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে নমস্কারের জন্য হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। যাঁহাদের পরিবারবর্গ উপস্থিত ছিলেন না তাঁহারা বাড়ীতে লোক পাঠাইলেন, কেননা সকলকে মায়ের পায়ের ধূলা নেওয়াইবেন। মা ধীরে ধীরে পা উঠাইয়া দিলেন; চোখ বুজিয়াই আছেন; মধ্যে

মধ্যে চোখ খুলিতেছেন, কিন্তু পলকহীন কি সুন্দর সে দৃষ্টি! না দেখিলে বুঝাইবার উপায় নাই। একেই ত মার দৃষ্টি অতি প্রাণস্পর্শী। তাঁর মধ্যে ভাবের এই অবস্থায় আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। মুখের রং রক্তাভ। ভাবের এই অবস্থায় কখনও কখনও কালোও হইয়া যাইতেন।

ভাবাবস্থায় শ্রীশ্রীমায়ের মূর্ত্তির বাহ্যিক বিভিন্নতা।

কিছুক্ষণ পর মা মাটিতে শুইয়া পড়িলেন। অসাড় হইয়া পড়িলেন। ঠাণ্ডা দেশ, তার মধ্যে পাথরের উপর শুইয়াছেন। সকলে ধরাধরি করিয়া বিছানায় আনিয়া মাকে শোয়াইয়া দিল। চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছেন; শরীর ঠাণ্ডা। কেহ হাতে, কেহ পায়ে হাত বুলাইতেছেন। অনেকক্ষণ পর মা চোখ খুলিলেন; কিন্তু দৃষ্টি তেমনই পলকহীন। একটু পরে চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। চোখ বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। সমস্ত শরীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বহুক্ষণ পর মা উঠিয়া বসিয়াছেন। ঘরে লোক ধরে না, ভদ্রলোকেরা বলিতেছেন, "এত দিন যাবৎ আমরা যে এই ৺কালীবাড়ীতে কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছি, আজ তাহা সার্থক হইল। সিমলাবাসীদের মহাসৌভাগ্য যে মা নিজে দয়া করিয়া সকলকে দর্শন দিতে, সিমলা পবিত্র করিতে আসিয়াছেন। আমরা আজ ধন্য হইলাম।"

মা বসিয়াই আছেন। দৃষ্টি তখনও একই ভাবে আছে। সমস্ত লোক মার মুখের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন। মার জিহ্বা আড়ষ্ট, কথা বাহির হইতেছে না। আমরা কথা বলাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। সকলকে বলিলাম, "মাকে ডাকুন"। হারাণবাবু, দুর্গাদাসবাবু, চারুবাবু প্রভৃতি মাকে জোরে জোরে বারবার ডাকিতে

শ্রীশ্রীমায়ের ব্যুত্থানের পূর্ব্বাবস্থা।

লাগিলেন। মা ছল ছল চোখে, হাসি হাসি মুখে তাঁহাদের দিকে এক একবার চাহিতেছেন, কিন্তু শব্দ বাহির হইতেছে না। আবার কেমন আবিষ্টভাবে আপনা আপনিই যেন চোখ বুজিয়া যাইতেছে কিছুক্ষণ এই অবস্থায় কাটিল। পরে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট ভাবে ২।১টি কথা বলিতে লাগিলেন। বেশী বোঝা যায় না, কিন্তু শিশুর মতই সে সরল দৃষ্টি ও আধ আধ বুলি; সকলে যেন মুগ্ধ হইয়া দেখিতে ও শুনিতে লাগিলেন। মুখ তখনও লাল, একটা অলৌকিক জ্যোতিতে তখনও মুখখানি উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। কিছুক্ষণ পর আবার মা শুইয়া পড়িলেন। সকলে প্রায় রাত্রি ১২টায় উঠিয়া গেলেন।

রাত্রি ১টায় মাকে একটু খাওয়াইবার চেষ্টা করা হইল। ভক্তেরা মার ভোগের সব উঠাইয়া রাখিয়াছেন। মাকে একটু খাওয়াইবেন এই আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু মা কিছু গিলিতেই পারেন না, আমরা অনেকবার ইহা দেখিয়াছি। নূতন যাঁহারা দেখিতেছেন, তাঁহারা বলিতেছেন, "একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে দেখুন না কি হয়"। আমি একটু মিষ্টি মুখে দিয়া দিলাম, কিন্তু তাহা গিলিতেই পারিতেছেন না, মুখে করিয়াই বসিয়া আছেন। ফেলিতে বলিতেছি, তাহাও যেন পারিতেছেন না; বা কথাই যেন বোঝেন নাই, এইভাবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া মুখের দিকে তাকাইতেছেন। এমন ভাবে চাহিতেছেন যেন কি করিতে হইবে, তাহা বুঝিয়া উঠিতেছেন না। অদ্ভুত অবস্থা! অনেক কষ্টে মুখের মিষ্টিটুকু বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলাম। পরে উঠাইয়া শোয়াইয়া দিলাম। ক্ষুদ্র শিশুটির মত "আমি তবে শুই" বলিয়া শুইয়া পড়িলেন।

কাল আবার কিছু খাইবেন না, কেননা কাল উপবাসের দিন। তাই রাত্রি ২টার সময় আবার একটু গরম দুধ খাওয়াইবার চেষ্টা

করা হইল। অনেক বার ধাক্কা দিয়া ঘুম ভাঙ্গাইবার মত ডাকিতে ডাকিতে একটু সামান্য দুধ মুখে নেন, আবার যেন ঘুমাইয়া পড়েন, এই অবস্থা। সারা রাত্রি ও পর দিন বেলা প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত পাথরের মত পড়িয়া রহিলেন।

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়

১০ই আষাঢ়, বুধবার। আজ মেয়েরা মাকে নাম শুনাইবেন, কথা হইয়াছে। বেলা প্রায় ১১টা হইতেই বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে মেয়েরা আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। ১২টা বাজিতেই মা সকলকে নিয়া কীর্ত্তনের ঘরে গেলেন। এত স্ত্রীলোক আসিল যে ঘরে ধরে না। আজও সব মেয়েদের মালা-চন্দন দেওয়া হইল। ছোট ছোট ২।৩টি ছেলে খোল করতাল বাজাইতেছে। আজও মা মঞ্চ তৈয়ার করাইলেন। প্রথমে নাম বেশী জমিতেছিল না। কারণ কীর্ত্তন করিতে মেয়েরা জানে না। শেষে মা উঠিয়া দাঁড়াইয়া নাম করিতেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা তাহাই করিতে লাগিলেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

শ্রীশ্রীমায়ের নেতৃত্বে সিমলায় মহিলা কীর্ত্তন।

নাম জমিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পর এমন অবস্থা হইল, যে কিছু সময়ের জন্য সকলেই নিজেকে ভুলিয়া গেলেন, লজ্জা সরম নাই; দুই হাত তুলিয়া গলা জড়াইয়া নাচিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে নাম করিতেছেন; ঝর ঝর করিয়া ঘাম পড়িতেছে। কুলবধূদের এইরূপ নাম কীর্ত্তন, আর বোধ হয় কেহ দেখেন নাই। মা নাচিতেছেন, নামের তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া যেন শিক্ষা দিতেছেন, কাহারও গলা জড়াইয়া ধরিতেছেন সে কৃতার্থ হইয়া যাইতেছে। আবার তাহাকে দেখিয়া আর সকলে মার হাতের কাছে নিজেদের মাথা আগাইয়া দিতেছে; মাও কাহারও ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিতেছেন না।

ঘরে লাইটগুলি জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছে। এমন অপূর্ব্ব দৃশ্য আর কেহ দেখে নাই। অনেকে বলিতেছেন, "মা, রাসলীলার কথা শুনিয়াছিলাম, তুমি আজ রাসলীলা দেখাইলে"। সকলেই আনন্দে মগ্ন। ৪টা বাজিয়া গেল তথাপি নাম বন্ধ হয় না, প্রায় ৪॥টায় নাম বন্ধ হইল। লুট দেওয়ার পর সকলে মাকে প্রণাম করিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। এর মধ্যে একটা কথা হইল, যদি সকলে ইচ্ছা করেন, তবে মার সিমলা আসিবার স্মৃতিরক্ষার্থ প্রতি বৎসরই "নামযজ্ঞের" পর এইভাবে মেয়েরাও একদিন কীর্ত্তন করিবেন। সকলেই আনন্দে এই প্রস্তাবে যোগদান করিলেন।

মেয়েরা চলিয়া যাওয়ার পর মা আসিয়া বিছানায় বসিয়াছেন। ভদ্রলোকেরা সব অফিসের পর আসিয়াছেন। মা কথায় কথায় বলিতেছেন "আজ মেয়েরা খুব সুন্দর কীর্ত্তন করিয়াছে কিছু সময়ের জন্য কাহারও জ্ঞান ছিল না যে তাহারা কি ভাবে নাচিতেছে। কাহারও মাথায় কাপড় পর্য্যন্ত ছিল না"। ভদ্রলোকদের যাঁহাদের অফিস নিকটেই, তাঁহারা অফিসে বসিয়াই নাম শুনিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, "মা, আমরা অফিসে বসিয়াই কীর্ত্তন শুনিয়াছি; বেশ সুন্দর হইয়াছিল"।

"সবিকল্প সমাধির" অবস্থা ও কাল নির্দ্দেশ।

রাত্রি ১০টায় অনেকে উঠিয়া গিয়াছেন। চারুবাবুর সহিত মার কথা হইতেছে। মা বলিতেছেন, "দেখ, যখন অখণ্ড দর্শন হয় এবং অখণ্ড ভাব বোধে আসে, তাহার পরেই অখণ্ড সত্ত্বা বোধে অখণ্ড স্থিতি হয়। তখনই তার সবিকল্প সমাধির প্রকাশ। যেমন ভাব ও কর্ম্মের পূর্ণ সমাধান। ডুব দিয়া স্নান করা আর কি। কোন অঙ্গই শুক্‌না থাকে না"।

১১ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার। আজও মা বিছানায় বসিয়া আছেন।

দুপুরবেলা মেয়েরা আসিয়া মার কাছে একত্র হইয়াছেন। যাঁহারা কীর্ত্তনে যোগ দিতে পারেন নাই তাঁহারা আসিয়া খুব দুঃখ করিতেছেন। আজও মার কথা জড়ান। মেয়েদের আজও কীর্ত্তনের ঝোঁক খুব আছে। তাঁহারাই বলিতেছেন, "মা, আজও একটু কীর্ত্তন হউক"। মা হাসিয়া বলিলেন, "বেশ ত কর"। সকলে বলিতেছেন, "মা, তুমি বলিয়া দাও, আমরা সঙ্গে সঙ্গে করিব"। মা মধুর স্বরে "হরিবোল" বলিয়া দিতে লাগিলেন। মেয়েরাও সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন। অনেক-ক্ষণ নাম করা হইল। যাঁহারা কাল কীর্ত্তনে যোগ দিতে পারেন নাই তাঁহাদের আজ কিছু দুঃখ মিটিল।

মা মিষ্ট ভাষায় তাঁহাদের বুঝাইয়া দিতেছেন, কাল যাওয়াই ঠিক। তাঁহারা কখনও বিনয় করিয়া, কখনও গম্ভীর হইয়া, কত রকমেই না মাকে থাকিবার জন্য বলিতেছেন।

কেহ কেহ বলিতেছেন, "আমাদের নিয়া যাও, নতুবা আমরা তোমার যাওয়ার পথে শুইয়া পড়িব, তোমায় যাইতে দিব না"। ভাবের যেন ছড়াছড়ি, দুই দিনের পরিচয়েই যেন মা তাঁহাদের কত আপনার জন হইয়া পড়িয়াছেন। কিসের আকর্ষণে সকলে এইরূপ পাগল হইয়াছে? মার অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি। সকলেই যেন মার সঙ্গ পাইবার জন্য পাগল।

শ্রীশ্রীমার সোলন গমনের প্রস্তাব।

সন্ধ্যাবেলায় মা একটু বেড়াইয়া আসিয়া ছোট বিছানাটুকুর উপর বসিয়া আছেন। ভক্তেরা সব আসিয়া ঘিরিয়া বসিয়াছেন। আগামী কল্য সোলন যাইবার কথা উঠিয়াছে, সকলেই মহা আপত্তি তুলিয়াছেন কিছুতেই মাকে এত তাড়াতাড়ি যাইতে দিবেন না।

যখন দেখিলেন, মা থাকিবার কোন আভাসই দিতেছেন না,

তখন হারাণবাবু প্রস্তাব করিলেন, "মা কাল যাইও না। আমরা শনিবার সকলে মিলিয়া তোমার সঙ্গে সোলন যাইব এবং সন্ধ্যা ৬টা হইতে ভোর ৬টা পর্য্যন্ত ১২ ঘণ্টা তোমায় নাম শুনাইব"। ভোলানাথ কীর্ত্তনের নাম শুনিয়াই থাকিতে রাজি হইলেন; মাও অগত্যা রাজি হইলেন। স্থির হইল আগামী শনিবার সকলে মার সঙ্গে যাইয়া সারারাত্রি কীর্ত্তন করিয়া রবিবার চলিয়া আসিবেন। সোলন রাজাকে ফোনে সংবাদ দেওয়া হইল। আরও ২।৩ দিন মার সঙ্গ পাইবেন ভাবিয়া সকলের মহা আনন্দ। এই সব কথা ঠিক করিয়া রাত্রি প্রায় ১টায় মা ও ভোলানাথকে প্রণাম করিয়া সকলে বাড়ী ফিরিলেন। মাও শুইয়া পড়িলেন।

১২ই আষাঢ়, শুক্রবার। আজ ভোরে উঠিয়া মা চারুবাবু প্রভৃতির সহিত একটু বেড়াইয়া আসিলেন। আজ মার উপবাসের দিন। বেড়াইয়া আসিয়া, মা বিছানায় বসিয়া আছেন। ভক্তেরা ২।১ জন আসিতেছেন, যাইতেছেন। অফিস যাইবার পূর্ব্বে কেহ কেহ আসিয়া পায়ের ধূলা নিয়া যাইতেন। ক্রমে সকলে চলিয়া যাওয়ায় মা উপরে গিয়া আপন মনে পায়চারী করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। একটু পরেই মেয়েরা আসিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে ঘর ভরিয়া গেল। মা উঠিয়া বসিয়াছেন। মেয়েরা মার সঙ্গে সোলন যাইতে পারিবেন না বলিয়া দুঃখ করিতেছেন। আজও সকলে মিলিয়া মার কাছে একটু কীর্ত্তন করিলেন। মা বলিলেন, "শুধু মুখে বসিয়া থাকিতে নাই একটা কিছু কর। হয়, নাম কর, পাঠ কর, নয়ত, কিছু সৎ আলোচনা কর; কিছু করা দরকার বাজে কথায় সময় নষ্ট করিতে নাই"। প্রায় ৪টার সময় মেয়েরা উঠিয়া গেলেন ও ভদ্রলোকেরা আসিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রায় ৫টায় মা একটু বেড়াইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে অনেকেই চলিলেন। সন্ধ্যার সময় মা ফিরিয়া আসিয়া বিছানার উপর বসিয়াছেন, প্রতি দিনের মতই ভক্তেরা ঘিরিয়া বসিয়াছেন। প্রায় ৩০।৩৫ জন সোলন যাইবেন স্থির হইয়াছে। সকলেরই মহা আনন্দ। মার সঙ্গে কীর্ত্তন করিতে যাইবেন। মা বলিতেছেন, "তোমাদের দেরাদুনের কীর্ত্তনের ঘরও বেশ হইয়াছে। সেখানে তোমাদের মত কীর্ত্তন করিতে কেহ জানে না; দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন করিতে হয়। তোমরা বেশ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন কর। বেশ ত! সুবিধা হইলে তোমরা একবার সকলে দেরাদুনে তোমাদের আশ্রমে যাইয়া কীর্ত্তন করিয়া আসিও"। সকলেই বলিতেছেন, "মা আমরা ত ইহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছি যে দিল্লী ফিরিয়া গিয়া তোমার দেরাদুন যাওয়ার খবর পাইলেই আমরা দেরাদুন যাইয়া প্রাণ ভরিয়া কীর্ত্তন করিয়া আসিব। আবার তোমাকেও দিল্লী নিব"। মা বলিতেছেন, "শরীরটা যদি ঠিক থাকে, সময় আসুক, যা হইবার হইবেই। তোমরা সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন করিবে, সে ত আনন্দের কথা"। নানা কথার পর রাত্রি প্রায় ১টায় সকলে চলিয়া গেলেন। মাও একটু বিশ্রাম করিতে শুইয়া পড়িলেন।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

১৩ই আষাঢ়, শনিবার। আজ সকলকে নিয়া মার সোলন যাওয়ার কথা। রাজাসাহেব ৩ খানা মোটর পাঠাইয়াছেন। খাওয়া-দাওয়ার পর বেলা প্রায় ৩টায় মা প্রায় ৩০।৩৫ জন ভক্ত সহ সোলন রওনা হইলেন। মোটরে সকলের জায়গা হইল না; অনেকে ট্রেণে গেলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মা সোলন পৌঁছিলেন। রাজাসাহেব আসিয়া চরণ বন্দনা করিলেন।

শ্রীশ্রীমা সোলন গমন করিলেন।

মন্দির সংলগ্ন একটা বড় কোঠায় কীর্ত্তনের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ফুল পাতা দিয়া সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছে ও মধ্যস্থানে বেদীর উপর ৺রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি। ভক্তদের থাকিবার জন্যও অন্যান্য ঘরে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। খাওয়া দাওয়া সব প্রস্তুত। রাজকর্ম্মচারীরা সব আনিয়া মন্দিরে পৌঁছাইতেছেন। সকলে মিলিয়া কীর্ত্তনের ঘরে গেলেন। মার জন্য আসন পাতা হইল। মা গিয়া কীর্ত্তনে বসিলেন। মাকে প্রণাম করিয়া মালা চন্দন পড়িয়া সকলে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

রাজাসাহেবও প্রজাদের নিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছেন। উজির-সাহেব ছেলেকে নিয়া আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছেন। রাণী, রাজমাতা ও রাজপরিবারস্থ মেয়েদের নিয়া চিকের আড়ালে মন্দিরের ভিতর বসিয়াছেন। সিমলার কীর্ত্তনে কীর্ত্তন করিতে করিতে কেহ বসেন না, আগাগোড়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন করেন। আজও

সোলনে বিপুল কীর্ত্তনানন্দ।

কখনও বেদী ঘুরিয়া ঘুরিয়া, কখনও স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া সকলে কীর্ত্তন করিতেছেন। বাহিরে খুব বৃষ্টি হইতেছিল। মাও সমস্ত রাত কীর্ত্তনে বসিয়া আছেন। ভোলানাথ সকলের সঙ্গে কীর্ত্তনে নাচিতেছেন! তিনি আজ প্রায় ৪ বৎসর বাক্ সংযম করিয়াছেন। কাজেই শব্দ করিয়া নাম করেন না। মহা আনন্দে সারা রাত কীর্ত্তন হইল।

এদিকে যে ঘরে কীর্ত্তন হইতেছিল সে ঘর হইতে কিছু দূরে একটা ঘরে বীরেনদাদা, শ্রীযুক্ত সুধীর সরকার প্রভৃতি কয়েকজন ভদ্র-লোককে মার পূর্ব্ব কথা শুনাইতেছেন। তাঁহারা মার লীলার কথা শুনিতে শুনিতে এত মুগ্ধ, যে কীর্ত্তনে যাই যাই করিয়াও যাইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা বলাবলি করিতেছিলেন, "আচ্ছা, এখন যদি হঠাৎ মা আসিয়া উপস্থিত হন, কেমন হয়"; এইভাবে তাঁহাদের ভিতরে একটা প্রার্থনা জাগিতেছিল, "দেখি মা কীর্ত্তন হইতে এখন এখানে আসেন কি না; আমরাও ত মারই কীর্ত্তন করিতেছি"। রাত্রি তখন প্রায় দুইটা বাজে, খুব বৃষ্টি। মা হঠাৎ কীর্ত্তন হইতে উঠিয়া রাস্তা দিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা ত অবাক্। মা হাসিয়া ফেলিলেন। মাকে আমরা কাপড় ছাড়াইয়া দিলাম। আবার কীর্ত্তনে চলিয়া গেলেন।

ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারিণী।

মার অনুমতি নিয়া রাত্রি প্রায় ৪॥টায় রাজা, রাণী, উজিরসাহেব সব চলিয়া গেলেন। কীর্ত্তনের গানে যে আছে "মিলে চাকরে নফরে, ভূপাল কৃষকে সবাই বলে হরিবোল।" মা'ও আজ তাই করাইয়াছেন। রাজা হইতে সাধারণ চাকরেরাও এই কীর্ত্তনে যোগ দিয়া নাচিয়াছেন। ৬॥টায় কীর্ত্তন শেষ হইল। কীর্ত্তনে ভোগ দেওয়ার জন্য

রাজা প্রজা নির্ব্বিশেষে কীর্ত্তন ও নৃত্য।

রাজবাড়ী হইতে নানা রকম খাবার তৈয়ার হইয়া আসিয়াছিল। তাহাও দেখিবার মত জিনিষ।

১৪ই আষাঢ়, রবিবার। কীর্ত্তনের পরে বিশেষ কাজের ঠেকায় জল খাইয়াই অনেকে মোটরে সিমলা ফিরিলেন। ভয়ানক বৃষ্টি। কেহ কেহ রহিয়া গেলেন, খাওয়া দাওয়া করিয়া বিকালে যাইবেন। মা প্রায় ১০টার সময় শুইয়া পড়িলেন। আবার ১॥টার সময় উঠিয়া বসিলেন। ভক্তদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। ২।১টি গানও ভক্তদের অনুরোধে করিলেন। মা বলিলেন, "এমন ভাবে ১২ ঘণ্টা কীর্ত্তন এই যায়গায় আর কেহ শোনে নাই; তোমাদের সুবিধা হইলে প্রতি বছর এই রকম কীর্ত্তনটা হইলে, মন্দ হয় না। শোগী বাবা নামে এখানে এক সাধু ছিলেন। তিনি দেহ রক্ষা করিয়াছেন। তিনিই এই মন্দিরাদি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছায়ই তোমরা এখানে নাম করিতে আসিয়াছ। মন্দিরে ৺রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আছে। মা বলিতেছেন, ৺রাধাকৃষ্ণের বোধ হয় তোমাদের মুখে নাম শুনিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তাই আসিয়া নাম শুনাইয়া দিলেন।" এইরূপ নানা কথা বলিয়া আনন্দ করিতেছেন।

সোলনে বার্ষিক কীর্ত্তনের উপদেশ।

বেলা প্রায় ৫টায় ভক্তেরা সিমলায় রওনা হইবেন। রাজা রাণীও মার দর্শনে আসিয়াছেন। তখন রাজা ভক্তদের অনুরোধ করিতেছেন, "প্রতি বছর আপনাদের সুবিধা মত একদিন আসিয়া, এইরূপ কীর্ত্তন করিলে বড়ই আনন্দ পাইব।" মা যখন ভক্তদের প্রতি বছর আসিয়া কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন তখন রাজা উপস্থিত ছিলেন না; রাজা তাহা শোনেনও নাই। মা, রাজার কথা শুনিয়া খুব আনন্দ করিয়া বলিতেছেন, "বেশত এই শরীরটা (নিজের শরীর দেখাইয়া বলিতেছেন) উপস্থিত না থাকিলেও তোমরা আসিয়া কীর্ত্তন করিতে পার"। সকলে

বলিতেছেন, "তা হয় না মা। তোমাকে আসিতেই হইবে। নতুবা কীর্ত্তন হয় না।" সকলে চলিয়া গেলেন। মা, রাণী ও রাজমাতার সহিত কথা বলিতেছেন। রাণী ও রাজমাতাকে সর্ব্বসাধারণে দেখিতে পারিবে না; কাজেই এক ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া মা তাঁহাদের নিয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা চলিয়া যাওয়ার পর রাত্রি প্রায় ১০টায় মা শুইয়া পড়িলেন। আমরাও যার যার কম্বল নিয়া মার চারিদিকে শুইয়া পড়িলাম।

১৫ই আষাঢ়, সোমবার। আজ মা প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত শুইয়া ছিলেন। আজ খাওয়ার দিন তাই মাকে ডাকিয়া উঠাইলাম। মার শরীর যেন অবশ। কীর্ত্তনের জের চলিতেছে। সিমলার কীর্ত্তনের পর হইতেই দেখিতেছি, মার ভাবের কেমন পরিবর্ত্তন। বহু পূর্ব্বে যেমন অন্যমনস্ক ভাব ছিল, চোখ দুইটি লাল এবং জল ভরা থাকিত, মুখখানি রক্তাভ, এখনও তাহাই দেখিতেছি। ৪।৫ বছর এ ভাবটা খুব কম ছিল। এ কয় বছর বেশ চট্‌পটে ভাব; কখনও খুব গম্ভীর ভাব; বেদান্ত উপদেশই করিতেছেন। জ্ঞানবাদীদের মত ভাবটাই যেন বেশী প্রকাশ পাইত। এখন আবার যেন ভাবে ঢল ঢল। অনেক সময় আপন ভাবেই নাচিয়া নাচিয়া বলিতেছেন, "জয় রাধে জয় রাধে।" হাত পায়ের তলা এত লাল যেন, সিন্দুর মাখান। হাতে হাত দিলেই বুঝা যায়। তাহা যেন মোটা ও খুব নরম হইয়াছে, খাইতে বসিয়াছেন, তখনও ঐ ভাব, কাজেই খাওয়া হয় না। চোখ দুটি জল ভরা। মুখখানিতে হাসি লাগিয়াই আছে। কি যে মিষ্টি হাসি, যে দেখে নাই, তাহাকে বুঝাইতে পারিব না। আমি বলিলাম, "মা খাওয়া ত কিছুই হইল না।" মা হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন, "জয় রাধে জয় রাধে।" আর দুই হাতে তালি

শ্রীশ্রীমায়ের ভাবের পরিবর্ত্তন ও প্রেমে ঢল ঢল ভাব।

দিতেছেন। মহা আনন্দ। মা বলেন—"তোমরা সৎভাবে কাজ করিলেই, আমার শরীর ভাল থাকিবে। এই খাওয়ায় কি হইবে।"

১৬ই আষাঢ়, মঙ্গলবার। আজও মা সকালে একটু বেড়াইয়া আসিয়াছেন। কিছুক্ষণ আপন মনে পায়চারী করিয়া শুইয়া পড়িলেন, দুপুর বেলা মা বসিয়াই ছিলেন। লোকজন মার দর্শনের জন্য আসিতেছে, যাইতেছে। রাণী ও রাজমাতার সহিত কথা বলিতে বলিতে রাত্রি প্রায় ৮টা হইল। রাত্রি প্রায় ১০টার পর মা শুইয়া পড়িলেন। আমরাও মার বিছানার ধারেই কম্বল বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

১৭ই আষাঢ়, বুধবার। আজ আর মা প্রাতে বেড়াইতে বাহিরে যান নাই। আপন মনেই কখনও বসিয়া, কখনও শুইয়া আছেন। কখনও উঠিয়া হাঁটিতেছেন। লোকজন যাঁহারা আসিতেছেন, সকলের সঙ্গেই ২।৪টি কথা বলিতেছেন। দুপুরে মেয়েরা সব আসিয়াছেন। আলমোড়ার, পাঞ্জাবের, কাশ্মীরের সব দেশের মেয়েরাই উপস্থিত হইয়াছেন। বাঙ্গালী এখানে নাই বলিলেই হয়। মা বলিতেছেন, "তোমরা কীর্ত্তন কর। শুধু শুধু বসিয়া থাকিতে নাই।" আমাকে বলিলেন, "তুমি প্রথম বলিয়া দাও, ওরা সঙ্গে সঙ্গে বলিবে।" এই বলিয়া মা-ই প্রথম নাম বলিয়া দিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও সকলে নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম। একটু পরেই মা চুপ করিলেন। মার আদেশে আমরা কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ নাম হইয়া বন্ধ হইল। একটা দেখিতেছি, সিমলার নাম যজ্ঞের পর হইতে মার কাছে রোজই একটু একটু কীর্ত্তন হইতেছে। কখনও "রাম" নাম, কখনও "হরি" নাম, কখনও "মা" নাম সবই হয়।

বৈকালে প্রতি দিনের মতই রাজা রাণী, রাজমাতৃদ্বয় পরিচারিকাদের নিয়া মার দর্শনে আসিলেন। কথায় কথায় রাত্রি প্রায় ৮॥টা হইল, তাঁহারা

মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। মা উঠিয়া হাঁটিতেছেন ও উপস্থিত সকলের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। রাত্রি প্রায় ১০টায় মা শুইয়া পড়িলেন।

কোন কোন দিন মা শুইয়াই একেবারে চুপ; আর নড়া চড়া নাই। আবার কোন কোন দিন শুইয়াছেন, একটু পরেই উঠিয়া বসিতেছেন। বলিতেছেন, "আজ আর শুইবার ভাবই নাই।" সারারাত্রি হয়ত কোন কোন দিন বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছেন। কোন কোন দিন সকলে ঘুমাইয়া আছি, মা আস্তে আস্তে উঠিয়া হাঁটিতে থাকেন। কোন কোন দিন জাগিয়া হয়ত এই দৃশ্য দেখি! আর কোন কোন দিন হয়ত জানিই না। পর দিন মার মুখে রাত্রির খবর শুনি।

১৮ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার। আজ মার খাওয়া নাই। প্রায় ৯টা অবধি শুইয়া আছেন; তারপর উঠিলেন। হাত মুখ ধোয়াইয়া দিলাম। কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে হঠাৎ জানালার ধারে গিয়া বাহিরে পাহাড়ের গায়ে কিছু দূরে কচু গাছ দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঐ দেখ কচুগাছ। কচুর শাক খাইবা?" এই বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আমরাও হাসিলাম।

তারপর ধীরে ধীরে মেয়েরা আসিতে আরম্ভ করিলেন। মা সকলকে নিয়া নাম করাইলেন। শুধু নাম বিলাইতেছেন। সকলকেই বলিতেছেন, "নাম কর। নামেই সব হয়।" একজন বলিলেন, "নাম জপেই চিত্ত শুদ্ধ হয়, সেই স্থানও পবিত্র হয়। কীর্ত্তনেও, যে কীর্ত্তন করে, তার চিত্ত শুদ্ধ হয়। যেখানে কীর্ত্তন হয়, সেই স্থান পবিত্র হয়। যে কীর্ত্তন শোনে সেও পবিত্র হয়।" কাহাকেও ৩ঘণ্টা, কাহাকেও ২ঘণ্টা, কাহাকেও এক ঘণ্টা, কাহাকেও আধ ঘণ্টা (২৪ ঘণ্টার মধ্যে) সময় তাঁর জন্য দিতে বলিতেছেন।

নাম জপ বা কীর্ত্তন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ।

এ ছাড়া মা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট ১০ মিনিট তাঁর জন্য দিতে বলিতেছেন। মা সকলকেই বলিতেছেন, "প্রতি দিনই একটা নির্দ্দিষ্ট সময় ১০ মিনিট তাঁকে ডাকবে। যদি সংসারে কাজের জন্য এক যায়গায় চুপ করিয়া বসিতে না পার, তবে অন্ততঃ সেই নির্দ্দিষ্ট সময় মৌন থাকিয়া (হাতে কাজ কর) যার যে ভাবে ইচ্ছা, তাঁকে স্মরণ করবে। ইহাতে শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচার নাই। কাপড় ছাড়িয়া শুচি হইবার দরকার নাই। এমন কি, সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে যদি পায়খানায় যাও, তাও কিছু বাধা নাই। সেখানে বসিয়াই ১০ মিনিট তাঁকে ডাকবে। মনে করবে এই দশ মিনিট তাঁকে দিয়াছি। পশু পাখী যেমন নির্দ্দিষ্ট সময় ডাকিয়া ওঠে, কোন বাধা বিঘ্ন মানে না, তোমারও সেরূপ একটা নির্দ্দিষ্ট সময় তাঁকে দিতে চেষ্টা কর। এই সময়টি তাঁকে সমর্পণ করিয়াছি, এই ভাবটি রাখিও।"

শ্রীশ্রীভগবানকে স্মরণ করিবার জন্য দৈনিক যথাসম্ভব সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা চাই।

মার এই মধুর উপদেশে এমন সুন্দর ফল দেখা গিয়াছে যে হয়ত কাহারও স্বামী কি পুত্র মারা গিয়াছে, তখনও মৃত দেহ ঘরেই আছে, কি কাহারও সংকার করা হইতেছে, তখন হয়ত ১০ মিনিটের সময় হইল, অমনি মার আদেশ স্মরণ করিয়া সে উঠিয়া বসিয়া ১০ মিনিট নাম করিতে আরম্ভ করিল। ১০ মিনিট পরে আবার কান্না। মা যে বলিয়াছেন, "মনে রাখিও ঐ সময়টুকু তাঁকে সমর্পণ করা হইয়াছে।" এই ভয়ানক শোকের মধ্যেও তাঁহারা সেই বাণী স্মরণ করিয়া আদেশ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এইসব উপদেশের মধুময় বাস্তব ফল।

মা বলিয়া দিয়াছেন, "তোমরা সাংসারিক সুখে দুঃখে সেই সময়টুকু

তাঁকে ডাকিতে ভুলিও না। মনে রাখিও সেই সময়টুকু তাঁকে দেওয়া হইয়া গিয়াছে; আরও বলেন, শুদ্ধ বন্ধন না নিলে অশুদ্ধ বন্ধন কাটিয়া যায় না।" ঘরে ঘরে তাঁর এই অমূল্য উপদেশ প্রতিপালন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। মা বলিতেছেন, "দেখো এক নিশ্বাসের ত বিশ্বাস নাই; ইহা মনে করিয়া তাঁকে ডাকা। আয়ু ত ফুরাইয়া আসিল নিশ্বাসে নিশ্বাসে আয়ু ক্ষয় হইতেছে।" এইসব উপদেশ সর্ব্বদাই দিতেছেন।

রাত্রি প্রায় ১০ টায় মা শুইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীযুক্ত বীরেনদাদার সহিত নানা কথা হইতেছে। ৺কৃষ্ণ লীলার কথা উঠিয়াছে। মা বলিতেছেন, "এই যে কৃষ্ণ লীলা ইহা অপ্রাকৃত লীলা। প্রকৃতির উপরে উঠিতে না পারিলে কেহ এই লীলা করিতেও পারে না, বুঝিতেও পারে না। ঐ লীলায় প্রকৃতির অধিকার নাই। যাহারা প্রকৃতির অধীন তাহারা এই লীলা কি প্রকারে বুঝিবে? তাহারা শুধু নিজেদের ভাব দিয়া এই লীলার রস আস্বাদন করিতে চেষ্টা করে। কাহার মুখে যেন শুনিয়াছি, ঋষিরা সব গোপিণী হইয়া জন্ম নিয়াছিলেন।"

শ্রীকৃষ্ণলীলা অপ্রাকৃত লীলা। প্রকৃতির পারে যাইতে না পারিলে বুঝা যায় না।

বীরেনদাদা বলিয়াছিলেন, "মা, ঋষিরা ত ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া থাকেন, তবে আবার তাঁহাদের এই লীলায় যোগ দিবার বাসনা কোথা হইতে আসিল? তবে এই বলা যায়, যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ স্বরূপ। কাজেই কৃষ্ণে ও ঋষিতে প্রভেদ নাই। তবে বলা যায়, তিনি নিজেই নানা মূর্ত্তিতে লীলা করিয়া গিয়াছেন। গোপিণীরা ও কৃষ্ণ একই ছিলেন।" মা বলিতেছেন, "এত অতি সত্য

শ্রীকৃষ্ণ ও গোপী তত্ত্বতঃ একই—পূর্ব্বের বাসনা জাত প্রারব্ধবশতঃ ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণের আবির্ভাব—পূর্ণ বৈষ্ণব কে?

কথা, তবে বাসনা কোথা হইতে আসিল এ কথার উত্তরে বলা যায়, পূর্ব্বের বাসনাতেই প্রারব্ধরূপে কাজ করে। জীবন্মুক্ত অবস্থায় ত কোন বাসনা থাকে না। কিন্তু প্রারব্ধের ক্রিয়া হইয়া যাইতেছে। ইহাতে তাহাদের সুখ দুঃখ কিছুই নাই। তবে এটাও স্থির জানিও। ইহাও অখণ্ড নিত্যলীলা। আবার বলিতেছেন, দেখ কাত্যায়নী পূজা করিয়া ৺কৃষ্ণকে পাইল। অথচ এখন দেখ বৈষ্ণবেরা কি আর দেবীকে তেমন ভাবে? তবে যিনি পূর্ণ বৈষ্ণব তাঁহার ভিতর কিন্তু সব ভাবগুলিই পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইবে।" রাত্রি প্রায় ১২টা বাজে। কথা বন্ধ হইল। সকলে শুইয়া পড়িলেন।

১৯শে আষাঢ়, শুক্রবার। আজ মার খাওয়ার দিন ছিল। মা প্রায় ৭টা অবধি শুইয়াই আছেন। অনেক সময় খাওয়ার দিন, চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিতেন। মা শুইয়া আছেন। কাল কচুর শাকের কথা হইয়াছিল। ভোরেই দেখি, রাজমাতা মার ভোগের জন্য নানা জিনিষ পাঠাইয়া দিয়াছেন। আর আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহার মধ্যে কয়েকটি কচুর শাকও দিয়াছেন, এখানে এত দিন আসিয়াছি, কিন্তু কখনও কচুর শাক কেহ দেন নাই। দেখিয়া আমরা কালকার কথা মনে করিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। অবশ্য মার এইরূপ ঘটনা আরও দেখিয়াছি। মাও খাইতে বসিয়া কচুর শাক দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কচুর শাকেরও পা আছে নাকি? বলিতে বলিতেই যে একেবারে উপস্থিত হইয়াছে।"

খাওয়া দাওয়ার পর মা একটু বিশ্রাম করিতেছেন, আজ মার শরীরটা বেশী ভাল নয়; সর্দ্দি সর্দ্দি ভাব। বৈকালে প্রতিদিনের মত রাজা রাণী আসিয়াছেন। রাজা প্রতি দিন ১১।১২ টার সময় হইলেও একবার মার চরণ দর্শন করিয়া যান; আবার বৈকালে আসেন।

রাত্রি প্রায় ৮টার সময় তাঁহারা চলিয়া গেলেন। মা একটু কথাবার্ত্তা বলিয়া প্রায় ১০ টায় শুইয়া পড়িলেন।

২০শে আষাঢ়, শনিবার। আজ মার উপবাসের দিন। ভোরে উঠিয়া মা একটু হাঁটিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। দুপুরে উঠিয়াছেন, মেয়েরাও সব আসিয়াছেন। মা কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। একটু কীর্ত্তনও হইল। বৈকালে রাজা রাণী আসিলেন। প্রায় রাত্রি ৮॥ টায় তাঁহারা চলিয়া গেলেন। মার সর্দ্দিতে শরীরটা ভাল নয়; বসিয়া আছেন। জ্বর জ্বর ভাব। হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন; "তোমরা যেমন সব আমার কাছে আসিয়া থাক, এই ব্যারামগুলির তেমনই মূর্ত্তি আছে। তাহারাও এই শরীরটার মধ্যে মাঝে মাঝে আসিয়া খেলা করে। কিছু দিন থাকিয়া চলিয়া যায়। তোমাদের যেমন তাড়াইয়া দেই না, তোমরা আসিলে যেমন কষ্ট হয় না, এই ব্যারামগুলি আসায়ও কোনই কষ্ট হয় না। তোমাদের তাড়াইয়া দেই না, উহাদেরই বা তাড়াইব কেন? আসিয়াছে, কিছুদিন খেলুক, আবার আপ্‌নিই চলিয়া যাইবে। সবই আনন্দ।" বড় বড় অসুখেও মা এই বলিয়াছেন। কখনও অসুখের সময় মার বিরক্তি দেখি নাই। সব সময়ই আনন্দ। বলেন, ব্যারামের মূর্ত্তিগুলিও যে পরিষ্কার দেখি। রাত্রি প্রায় ১০টায় মা শুইয়া পড়িলেন। শুইয়া শুইয়া একটু একটু গান করিতেছেন। অনেকক্ষণ পর চুপ করিয়া চোখ বুজিলেন।

২১শে আষাঢ়, রবিবার। আজ খাওয়ার দিন। মা সকালে একটু হাঁটিয়া আসিয়াছেন। বেড়াইয়া আসিলে মাকে হাত মুখ ধোয়াইয়া একটু দুধ ফল খাওয়াইয়া দিলাম। আজ একটি পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক মার জন্য খাবার নিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বড় শ্রদ্ধা; মার জন্য খুব ব্যাকুলতা। স্ত্রীলোকটি খাবার নিয়া আসিয়া বসিয়া

শ্রীশ্রীমা প্রাণের প্রার্থনা পূর্ণকারিণী।

আছেন। বেলা প্রায় ১০টা, আমাদের রান্না তখনও হয় নাই। কিন্তু মা অপেক্ষা না করিয়া, সেই স্ত্রীলোকটির হাতেই সে যাহা আনিয়াছিল, তাহা নিয়াই খাইতে বসিয়া গেলেন। বলিলেন, "ওরা বসিয়া আছে, না খাওয়াইয়া যাইবে না"।

সামান্যই খাইলেন। কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটি কৃতার্থ হইল। বলিতেছে, "সকাল হইতে ছেলেপেলে সহ কত প্রার্থনা জানাইতেছি, যে মা যেন এই ভোগ গ্রহণ করেন"। মাও অপার কৃপাময়ী। বিলম্ব না করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধার ভোগ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রহণ করিতেছেন, আর বলিতেছেন, "এ তরকারীটা খুব চমৎকার হইয়াছে, রুটি খুব ভাল হইয়াছে"। মা যে আমার অন্তর্য্যামিনী। তিনি দেখিতেছেন, ঐ পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকটির হৃদয় মাকে খাওয়াইবার জন্য কত ব্যাকুল হইয়া আছে, অথচ সাহস করিয়া বেশী কিছু বলিতেও পারিতেছে না। মা তাই বিলম্ব না করিয়া খাইতে বসিয়া গিয়াছেন। আমাদেরও বলিতেছেন, "তোমাদের রান্না সব রাখিয়া দাও, আমি বৈকালে খাইব"। বুঝিতেছেন, এখানকার রান্না না খাওয়ায় আমাদের দুঃখ হইতেছে, তাই এই কথা বলিতেছেন। খাওয়া-দাওয়া করিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। বেলা প্রায় ৫টার সময় আমাদের রান্না জিনিষ দিয়া ভোগ দেওয়া হইল। তাহাও কিছু গ্রহণ করিলেন।

২২শে আষাঢ়, সোমবার। যাওয়ার কথা উঠিয়াছে। আগামী কল্য এখান হইতে রওনা হইয়া যাইবেন, এখানকার রাজাটি মার পরম ভক্ত, অতি সচ্চরিত্র ও নিষ্ঠাবান, মার যাওয়ার কথা রাজা শুনিয়া মহা দুঃখিত; কিন্তু বাধা দিতে সাহস পান না। শুধু প্রার্থনা জানাইতেছেন, "আবার যেন দর্শন পাই"। ডাক্তার মদন মোহন যোশী আসিয়া শুনিলেন, তিনিও মহা দুঃখিত। মেয়েরা সব আসিয়াছেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই পাহাড়ী স্ত্রীলোকেরা মাত্র এই কয়দিন মার সঙ্গ পাইয়াছে, এর মধ্যেই মার যাওয়ার কথায় তাঁহারা কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মা হাসিয়া হাসিয়া নানা কথা বলিয়া তাঁহাদের সান্ত্বনা দিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে নানা উপদেশ দিতেছেন। অমূল্য উপদেশ পাইয়া অনেকেই কৃতার্থ হইতেছেন, নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন। সন্ধ্যা বেলা রাণী, রাজমাতা আসিলেন। মা এক ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া তাঁহাদের নিয়া বসিয়াছেন। একটি লোক মাকে কীর্ত্তন শুনাইতে আসিয়াছেন। অপর ঘরে বসিয়া তিনি কীর্ত্তন করিয়া মাকে শুনাইলেন। প্রায় রাত্রি ১০টায় সকলে চলিয়া গেলেন।

মা বিছানায় শুইয়া শুইয়া বীরেনদাদার সহিত নানা কথা বলিতেছেন। বীরেনদাদা বলিতেছেন, "আমি সিমলায় সকলকে বলিয়া দিয়াছি, যে মা যেন একটি যন্ত্রের মত। যে যেমন ভাবে বাজাইবেন, সেইরূপই শব্দ শুনিতে পাই-বেন। আপনারা যিনি যে ভাব নিয়া আসিয়া মার সহিত যে কথা বলিবেন, মা'ও দেখিবেন, তাঁহার সহিত সেই ভাবেরই কথা বলিতে আরম্ভ করিবেন। কেহ যদি আসিয়া গল্প গুজব করেন, মা'ও তাহার সহিত বেশ গল্প গুজবই করিতেছেন। কেহ যদি সন্তানভাব নিয়া আসেন, দেখিবেন তাঁহার সহিত মাতৃভাব নিয়া কথা বলিতেছেন। কেহ যদি শিষ্যভাব নিয়া আসেন, দেখিবেন মা তাহার সহিত গুরুভাব নিয়া কথা বলিতেছেন"।

মা স্বাতন্ত্র্য-বিহীন যন্ত্র-বিশেষ।

মা এইসব কথা শুনিয়া হাসিতেছেন। আবার মা শুইয়া শুইয়া গান ধরিলেন, "গৌরী শঙ্কর সীতারাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম"। বীরেন-দাদা হাসিয়া বলিতেছেন, "আমি সিমলায় সকলকে বলিলেই পারিতাম, যে মা দীক্ষা দেন। তাহা হইলে আর তোমার উপায়

মা, 'নাম' গ্রহণের উপদেষ্টী।

ছিল না, সকলেই তোমাকে দীক্ষার জন্য ধরিত। এই যে নাম গান করিতেছ, ইহাই ত নাম বিলাইতেছ। যাহার ইচ্ছা, ইহাই মন্ত্র বলিয়া নিতে পারে"। মা শুনিয়া হাসিতেছেন।

আবার একজনের ভাব নিয়া কথা হইল। বীরেনদাদা বলিতেছেন, "যে সন্তান সময়ের অপেক্ষা না করিয়া, খাওয়ার জিনিবের জন্য মাকে অস্থির করিয়া তুলিতে পারে, সেই শীঘ্র শীঘ্র খাওয়ার জিনিষ পায়"। মা বলিতেছেন, "আবার যে ছেলেটী মাকে বিরক্ত করে না চুপ করিয়া বসিয়া মার অপেক্ষা করে, মার লক্ষ্য বেশী তাহার দিকেই থাকে, তাহাকেও যত শীঘ্র পারেন খাইতে দেন; কাজেই সাধনা দুই প্রকার হইলেও ফল একই"। নানা কথার পর রাত্রি প্রায় ১২টায় মা চুপ করিয়া শুইলেন।

মা, নির্ভরশীল নীরব সন্তানের প্রতি সমধিক বৎসলা।

আজ ২৩শে আষাঢ়, মঙ্গলবার। আজ সোলন হইতে রওনা হইবার কথা। সন্ধ্যাবেলায় রওনা হইবেন। কোথায় যাওয়া হইবে, স্থির হইতেছে না। একবার কাশ্মীরের কথাও হইতেছে। দুপুরে দেরাদুন হইতে ফোন আসিয়াছে। একবার মাকে দেরাদুন যাওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া হরিরামবাবু ফোন করিতেছেন। মা আমাদের নিয়া দেরাদুন রওনা হইলেন। রাস্তা হইতে বীরেনদাদা, বাচ্চু ও তাহার মা চলিয়া যাইবেন। কলেজ খুলিয়া যাওয়ায় তাঁহারা ফিরিয়া যাইতেছেন। মা, আমি, ভোলানাথ ও স্বামী অখণ্ডানন্দজী রাজাসাহেবের মোটরে রাত্রি প্রায় ৯টায় রওনা হইয়া রাত্রি ১২টায় কালকার গাড়ী ধরিয়া পরদিন বেলা ১২টায় দেরাদুন আশ্রমে পৌছিলাম।

শ্রীশ্রীমার সোলন হইতে দেরাদুন গমন।

সমাপ্ত

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

তৃতীয় ভাগ—

স্থির থাকিয়াও মায়ের যে চির-চলা তাহার পথে কত স্থান আসে যায়। সোলন, সিমলা, গড়মুক্তেশ্বর, ভুবনেশ্বর, নৈমিষারণ্য, আসাম, নবদ্বীপ, পুরী, দেওঘর, নৈনীতাল ইত্যাদি স্থান ছাড়াইয়া এই যাত্রা কোথায় যে চলিয়াছে, তাহা এই ভাগে আর দেখা যায় না। এই যাত্রায় কত কে চলিয়াছে—মুসলমান ভক্ত প্রেমগোপাল, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী, সকলেই সহযাত্রী। বিরাজ-দিদির সহিত মার অজ্ঞাতবাসও এই ভাগেই। মা বলেন,—"আমি ত নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না, যা' হইয়া যায়"—কল্যাণী, সর্ব্ব-মঙ্গলার এই অশান্ত ঘূর্ণিতে কি মহামঙ্গল বর্ষণ হইতেছে তিনি নিজে না বুঝাইলে তাহা কে বুঝিতে পারে?

[আষাঢ়—মাঘ, ১৩৪৩]